কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা

কবির নির্বাসন
ও
অন্যান্য ভাবনা

শিবনারায়ণ রায়

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

কপিরাইট : গীতা রায়

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৫৩

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
'শ্রীহরি প্রেস'
১৩৫-এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ :
শ্রীকালীপদ সরকার

মূল্য : সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা

কবি ও মনীষী

সহৃদয় বিশ্বনাগরিক

অমিয় চক্রবর্তী

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

প্রেক্ষিত
সাহিত্যচিন্তা
প্রবাসের জার্নাল
মৌমাছিতন্ত্র
নায়কের মৃত্যু
কথারা তোমার মন

Radicalism
In Man's Own Image (এলেন রয়ের সঙ্গে)
Explorations
Gandhi India and the World (সম্পাদিত)

॥ সূচীপত্র ॥

লেখক ও পাঠক

অভিমানবশে ভবভূতি লিখেছিলেন পৃথিবী বিপুল এবং কাল নিরবধি। অর্থাৎ তাঁর দেশকালে যদি সহৃদয় পাঠক না মেলে তিনি বরং অপেক্ষা করবেন দূর দেশ এবং ভবিষ্যৎ কালের জন্য, তবু সমকালীন ইতরজনের বাহবা পাবার আকাঙ্খায় নিজের লেখাকে খেলো হতে দেবেন না। তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি ভঙ্গ করেননি; সংস্কৃতানুরাগী পাঠকদের চোখে তাঁর স্থান তাই কালিদাসের পাশে।

ভবভূতির এ উক্তির মধ্যে সব দেশকালের অধিকাংশ সৎ লেখকের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সৎ লেখক মাত্রই অবশ্য ভিতরকার তাগিদে লিখে থাকেন; যা তিনি লেখেন তা না লিখে তাঁর শান্তি নেই; লেখার মধ্যেই তাঁর মুক্তি। তবু এ কথাও সত্য যে শুধু লিখে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন না; সে লেখা অন্যের গোচরে আনার তাগিদও তাঁর মধ্যে সক্রিয়। শুধু গোচরে আনা নয়, তাঁর স্বকীয় অভিজ্ঞতাকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করতে পারলে তবেই তিনি সুখী। সুরকার কিংবা চিত্রশিল্পী হয়তো-বা একেবারে অপর নিরপেক্ষ হতেও পারেন, কিন্তু সাহিত্যিকের পক্ষে এ বিশুদ্ধতা অকল্পনীয়। তার প্রধান কারণ সাহিত্যের মাধ্যম হল ভাষা আর ভাষার প্রকৃতিই পরোক্ষ। ফলে পাঠক-বিষয়ে চেতনা সব লেখকের রচনাতেই কম বেশী প্রভাব ফেলে থাকে। এ প্রভাব হোমার, বাল্মীকি থেকে শুরু ক'রে শেক্সপীয়র কি রবীন্দ্রনাথ কেউই এড়াতে পারেন নি। র‍্যাবো এবং রিল্‌কে-কেও তাঁদের কবিতা অপরবোধ্য ভাষায় লিখতে হয়েছে। এমন কি শ্রীমতী সিমোন দ্য বোভোয়ার ম্যাণ্ডারিনরাও এ প্রভাবের অনতিক্রম্যতা অস্বীকারে অকৃতকাম।

তবে ভবভূতির অভিমানোক্তির যাথার্থ্য কোথায়?

যাথার্থ্য এইখানে যে যদিও কোন লেখকই পাঠক-লাভের প্রত্যাশা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন না, তবু সৎ লেখক রসিক পাঠকের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। অর্থাৎ তাঁর দেশে কিম্বা তাঁর কালে যদি মনের মত পাঠক নাও জোটে, তবু বেআকুফদের তারিফের লোভে তিনি তাঁর বক্তব্য বা

বাচনভঙ্গী বদলাতে প্রস্তুত নন। তিনি কল্পনা করে নেন এমন যুগকাল যখন তাঁর লেখার যথার্থ সমঝদারেরা তাঁর এই অপেক্ষা করার দাম সুদে আসলে পুষিয়ে দেবেন। অথবা যেটা আরো সচরাচর দেখা যায়, তিনি সংখ্যা-গরিষ্ঠ-ইতর সাধারণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা না করে তাঁর সমকালীন স্বল্পসংখ্যক বিদগ্ধ জনের কথা স্মরণে রেখে সাহিত্য রচনা করেন। তাতে গণপতির চরেরা তাঁকে যদি উঁচ্‌কপালে ব'লে বিদ্রূপ করে তা তাঁর সয়, কিন্তু অরসিকদের দাবীর কাছে নিজের কল্পনাকে খাটো করতে তিনি একেবারেই নারাজ। ফলত সৎ লেখক সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী হতে পারলেই চরিতার্থ; তার উপরে যদি তিনি সর্বহৃদয়সম্বাদী হতে পারেন, সেটা তাঁর হিসেবের উপরিপাওনা।

তবে এ অভিমানের বিপদ আছে। লেখকের দিক থেকেও বটে, পাঠকের দিক থেকে তো বটেই। কিন্তু লেখক এবং পাঠকের অনেক সময়ে সে কথা স্মরণে থাকে না। তাই সে কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া দরকার।

॥ দুই ॥

প্রথমত, সাহিত্যিক মাত্রেরই উপজীব্য হচ্ছে মানুষ—মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাবনা-কল্পনা, ক্রিয়া-কলাপ, অনুভূতি-অভিজ্ঞতার উপাদান ছাড়া সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। ইংরেজ কবি ডান লিখেছেন, 'কোন মানুষই দ্বীপ নয়, প্রতি মানুষই মহাদেশের একটি অংশ; সমুদ্র যদি একদলা মাটিও ধুয়ে নিয়ে যায় তবে ইয়োরোপ ততটুকু ক্ষুদ্রতর হয়ে আসে।...আমি মানবজাতির সঙ্গে জড়িত।' এ হল যথার্থ সাহিত্যিকের কথা। এখন অধিকাংশ পাঠক ইতর-সাধারণ বলে সৎ লেখক যদি তাদের দিক থেকে মুখ ফেরান, তবে মানব জাতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ যে সঙ্কীর্ণ এবং দুর্বলতর হয়ে আসবে এ আশঙ্কা অযৌক্তিক নয়। তিনি যতই আত্মবিশ্লেষণ বা আত্মোপলব্ধির দ্বারা এ অভাব পূরণ করার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর পক্ষে মানবীয় অস্তিত্বের বিচিত্রতার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠবে। তাঁর উপজীব্য অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং বহুমুখীনতা ক'মে আসবে; তাঁর উন্মুখ জীবনজিজ্ঞাসা অভিমানী আদর্শের আওতায় ক্রমে শীর্ণতর হবে; এবং এ আশঙ্কাও কষ্টকল্পিত নয় যে অবশেষে তিনি জীবনের চাইতে প্রতীককে বড় ঠাউরে ভাষাপ্রয়োগে

নিপুণতা অর্জনের মধ্যেই সাহিত্যিক চরিতার্থতা সন্ধান করবেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে শব্দপ্রয়োগের নিপুণতার দ্বারাই ভাষা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সহজ কথাটিও স্মরণে রাখা দরকার যে ভাষা মাধ্যম মাত্র, তার নিজস্ব কোন মূল্য নেই, তার দ্বারা মানুষ আপন আপন অনুভূতি-অভিজ্ঞতাকে সাধারণবোধ্য রূপ দিতে এবং ফলে পরস্পরের গোচর করতে পারে বলেই তা মূল্যবান। সাহিত্যিক এই সহজ কথাটি ভুলে যখন সমাজের উপরে অভিমান করে শুধু রীতিপ্রকরণের চর্চাকেই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য করে তুলতে চান, তখনই সাহিত্যের একেবারে গোড়াতে কোপ পড়ে।

গ্রীকসভ্যতার পতনের পর বৈজন্তীয় আলঙ্কারিকেরা এই সহজ কথাটি ভুলেছিলেন। সেদিন তাঁদের সাহিত্যাদর্শে অনুপ্রেরিত হয়ে যা কিছু রচিত হয়েছিল তার মধ্যে বিস্ময়কর শব্দচাতুর্য ছিল, কিন্তু মানবীয় বক্তব্য ছিল অতি সামান্য।

হেলেনিষ্টিক শিল্পতত্ত্বে পাঠ নিয়ে রোমান কবিরা ঠিক করলেন অর্থের ভার কমিয়ে কথার ধার যত বাড়ানো যাবে, ততই তাঁদের রচনা উৎকৃষ্ট হয়ে উঠবে। প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে একটি লাগসই শব্দ ধার নিয়ে বলা যায় এঁরা 'চুটকি' লেখায় আশ্চর্য নিপুণতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সে দক্ষতা যে তাঁদের কত দাম দিয়ে কিনতে হয়েছিল এঁদের রচনাবলীর সঙ্গে প্রাচীন গ্রীকসাহিত্যের তুলনা করলেই তা মালুম হয়। উনিশ শতকে মার্কিন কবি-সমালোচক এডগার অ্যাল্যান পো-র প্রভাবের ফলে ফরাসী সাহিত্যে এই ধরণের জীবনবিমুখ বিশুদ্ধ রীতি-বাদ প্রবল হয়ে ওঠে। এতে কাব্যের কলাকৌশলে লক্ষ্যণীয় উন্নতি সাধিত হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কবি-কল্পনায় অস্বচ্ছতা এবং কৃত্রিমতাও যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে তাতে সন্দেহ নেই। বোদলেয়ারের মত অসামান্য প্রতিভাধর কবিও এ বিপদ পুরোপুরি এড়াতে পরেননি। তবু তাঁর ক্ষেত্রে অম্বিষ্ট জীবনবোধ আত্মিক নির্বাসনের নিঃসঙ্গতাকে কখনো শূন্যগর্ভ বাকচাতুরীতে পর্যবসিত হতে দেয়নি। কিন্তু তাঁর চাইতে কম ক্ষমতাবান অনেক কবির ক্ষেত্রে সমাজবিমুখ আত্মাভিমান ক্রমে কল্পনাকে ক্ষীণ এবং শীর্ণ করে ফেলে। এই অবক্ষয় কাব্যে চাইতে উপন্যাসের ক্ষেত্রে বেশী স্পষ্ট। কারণ একান্তভাবে নিজস্ব আবেগ-অনুভূতিকে আশ্রয় করে কবিতা যদিবা লেখা যায়, উপন্যাসের জন্য অপর স্ত্রীপুরুষ বিষয়ে জ্ঞান অবশ্য

প্রয়োজনীয়। সেই জ্ঞানের অভাব উপন্যাসকে কিভাবে দুর্বল করে আনে, দিদেরো, স্তাঁদাল, বালজাকের লেখার সঙ্গে উনিশ শতকের শেষ পাদের ফরাসী ঔপন্যাসিকদের রচনার তুলনা করলে সেটি স্পষ্ট বোঝা যায়।

ফলত সৎ লেখকের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনের মানসিক ব্যবধান যত বৃদ্ধি পায় ততই লেখকের ভাবনা-কল্পনা মানবজাতির সঙ্গে সংযোগের কথা ভুলে এক দিকে আত্মকেন্দ্রিক, অন্য দিকে প্রকরণপ্রধান হয়ে ওঠে। তাঁর কল্পনার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, তাঁর রচনায় শূন্যগর্ভতা, পুনরাবৃত্তি এবং আত্মপ্রবঞ্চনা একে একে প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর বক্তব্য যত কমে, তাঁর বলার ঢঙ তত প্যাঁচালো, তাঁর বাক্যগঠন তত জটিল, তাঁর শব্দপ্রয়োগ তত অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তখন যে শুধু ইতরজনেরাই তাঁর লেখা দেখে ভয় পায় তা নয়, রসিকজনদের পক্ষেও সে লেখা সম্ভোগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। পটুত্ব, অধ্যবসায় এবং আদর্শনিষ্ঠা সত্ত্বেও তিনি লেখক হিসেবে সার্থক হয়ে উঠতে পারেন না। যেহেতু তিনি বস্তুত সৎ লেখক, তাঁর রচনায় অবশ্য বহু সম্পদ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে; পরবর্তী লেখকেরা হয়তো তা থেকে অনেক মূল্যবান শিক্ষা এবং উপাদান সংগ্রহ করেন; তবু সে রচনা প্রাণবান সমগ্রতায় সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী হয়ে ওঠে না।

মহৎ সাহিত্য-প্রতিভার এবম্বিধ ট্রাজিক অপচয়ের দুটি প্রামাণিক উদাহরণ জেমস্ জয়েসের শেষ রচনা 'ফিনেগান্স্ ওয়েক' এবং এজ্রা পাউণ্ডের 'ক্যান্টোস্'। উভয় সাহিত্যিকই তাঁদের জীবনের বেশীরভাগ সময় আপন আপন দেশ এবং সমাজ থেকে সরে এসে স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসনে কাটিয়েছেন। উভয়েরই সাধারণ মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা যেমন গভীর, শিল্পসাধনা বিষয়ে নিষ্ঠা তেমনি অকম্প্য। অশ্রদ্ধা সত্ত্বেও জয়েস যতদিন তাঁর পরিচিত মানুষদের নিয়ে বোধ্য ভাষায় গল্পকাহিনী লিখেছেন ততদিন তাঁর প্রতিভা সার্থকতা থেকে সার্থকতায় আরোহন করেছে: 'ডব্লিনার্স্', 'পোর্ট্রেট' এবং 'ইউলিসিস্' তারি প্রমাণ। কিন্তু 'ফিনেগানস্' রচনা করতে গিয়ে তিনি পাঠক সমাজকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলেন; ফলে জয়েস-ভক্ত সুপণ্ডিত টীকাকারদের বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিরাট গ্রন্থ থেকে কিছু বিক্ষিপ্ত শব্দ-চিত্র ছাড়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। 'ফিনেগান্স্'-এর সঙ্গীতধর্মী ধ্বনিসমাবেশের মধ্যে প্রাকচেতন বিশ্বপ্রকৃতির কিছু আভাস আছে, কিন্তু অভিধানকে অগ্রাহ্য করার ফলে মানবমনের জটিল এবং বিচিত্র রূপ এ গ্রন্থে কচিৎ প্রতিফলিত হয়েছে।[১]

পাউণ্ডের 'সর্গমালা' অবশ্য 'ফিনেগান্‌স্‌'-এর মত পুরোপুরি অবোধ্য নয়। কিন্তু 'পারসোনি' থেকে 'মোবর্লি' পর্যন্ত একটির পর একটি কাব্যগ্রন্থে যে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা আমাদের পদে পদে চমৎকৃত করে 'ক্যাণ্টোস্‌'-এর অনেক খণ্ডেই তা বেদনাদায়ক ভাবে অনুপস্থিত। ভাষার চিত্রধর্ম এবং সঙ্গীত-ধর্মের মারফৎ ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সামর্থ্যে পাউণ্ডের সমতুল্য কবি এযুগে দুর্লভ। কিন্তু 'ক্যাণ্টোস্‌-এর অনেক অংশে ব্যঞ্জনাহীন পাণ্ডিত্য এবং অকারণ উল্লেখ-উদ্ধৃতির আবর্জনা কাব্যরসকে ব্যাহত করেছে। কবিত্বের এই অবক্ষয় কেন এবং কিভাবে ঘটল তার ইঙ্গিত পাউণ্ডের 'মোবর্লি' কাব্যে নিহিত আছে। জয়েসের নায়ক স্টিফেনের মত পাউণ্ডের নায়ক মোবর্লি-ও নিজের দেশ কাল থেকে মানস অর্থে নির্বাসিত; সে চেয়েছিল শিল্পের ছাঁকুনী দিয়ে সুন্দরকে জীবনের বর্বরতা থেকে পৃথক করতে। জীবনের বর্বরতা তাতে কিছু কমল না; মাঝখান থেকে জীবনের সঙ্গে যোগ হারিয়ে সুন্দর হল বিশীর্ণপঙ্গু। কল্পনা ক্রমেই ভঙ্গীসর্বস্ব হয়ে উঠল; কিন্তু সে ভঙ্গী কোন্‌ অভিজ্ঞতার ইঙ্গিতবাহী তাও নির্ণয় করার উপায় রইল না।[২]

॥ তিন ॥

এবার দ্বিতীয় বিপদের কথা।

যে লেখক সচেতনভাবে স্বল্পসংখ্যক অধিকারী পাঠকের জন্য লেখেন, মানবজাতির প্রতি তাঁর মনোভাবের মধ্যে অনেকখানি অশ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক। এই অশ্রদ্ধার সঙ্গে যখন লেখক হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি না পাওয়ার তিক্ততা এসে মেশে, তখন যদি তাঁর বিচার-বিবেচনায় ঔদার্যের অভাব ঘটে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তখন মানুষের দোষত্রুটি নিয়ে ব্যঙ্গ করার প্রলোভন তাঁর মনে বিশেষ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ভাল মন্দ সব কিছু মিশিয়ে মানুষের সমগ্র অস্তিত্ব বিষয়ে সাহিত্যিকের যে সহজাত কৌতূহল, তাঁর চেতনায় সেটি ক্ষীণ হয়ে আসে। সাধারণ মানুষের আত্মীয়তা অর্জন করতে না পারার ফলে তিনি ক্রমেই মানুষকে ভালবাসার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। যা বিকৃত এবং অস্বাভাবিক তাই শুধু তাঁকে আকৃষ্ট করে: এক দিকে তিনি হয়ে ওঠেন উৎকেন্দ্রিক, অন্য দিকে শুভনাস্তিক। এ অবস্থায় শুধু যে সাহিত্যিকের

অভিজ্ঞতার জগৎ ব্যাপ্তিতে এবং বৈচিত্র্যে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসে তা নয়; সে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং উপস্থাপনেও সঙ্কীর্ণবুদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এ মনোভাব কোন সাহিত্যিকের পক্ষে কল্যাণকর নয়। কেন না, যে আনন্দ সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে ছন্দের সঞ্চার করে, এ মনোভাব স্বভাবত তার প্রতিকূল। তা ছাড়া এ মনোভাবের ফলে সাহিত্যিকের জীবনজিজ্ঞাসা পদে পদে ব্যাহত হতে বাধ্য। তাঁর কল্পনার কৌতুকসরসতাও এর ফলে ক্ষীণ হয়ে আসে। এ মনোভাব থেকে যে সাহিত্য জন্ম নেয়, বিদগ্ধ পাঠকের পক্ষেও তাকে স্বাগত করা কঠিন।

উপরোক্ত দ্বিতীয় বিপদের আশঙ্কা যে মোটেই অমূলক নয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে গত পঞ্চাশ বছরের পশ্চিমী সাহিত্যে তার বিস্তর প্রমাণ চোখে পড়ে। এ যুগের শক্তিশালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই সমাজজীবন থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েছেন। পড়শীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে শুধু বিরুদ্ধতার ভাব প্রবল হয়ে ওঠেনি, বিদ্বেষের প্রতিন্যাসও প্রকট হয়ে উঠেছে। এঁদের কল্পনা জীবনবিমুখ; এঁদের কাছে অস্তিত্ব অর্থহীন; এঁদের লেখা পড়লে মনে হয়না যে মানুষের জীবনে ভালবাসা, সৌন্দর্যবোধ কিম্বা সৃষ্টিশীলতার কোনো স্থান আছে। এঁদের অনেকেরই রচনায় মানুষের যে রূপটি ফুটে উঠেছে তার প্রধান উপাদান হল রিরংসা, ঈর্ষা, আত্মগ্লানি, অপ্রত্যয়, বৈনাশিক বুদ্ধি। আধুনিক সাহিত্যের নায়ক এক দিকে প্রচণ্ড উন্নাসিকতায় নিজেকে সমাজ-জীবন থেকে নির্বাসিত করেছে; অন্য দিকে সে নিজের ব্যক্তিসত্তায় অবিশ্বাসী। এযুগের বহু ক্ষমতাবান সাহিত্যিক শূন্যবাদী; এবং শূন্যবাদ যে কী সৃষ্টি কী সম্ভোগ কোনোটিরই বিশেষ অনুকূল নয়, এ সত্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা করেনা। মহাপ্রতিভাবান লেখক শূন্যতাবোধকেও হয়ত কল্পনার সামর্থ্যে ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পারেন; কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে এটি ব্যতিক্রম।[৩]

॥ চার ॥

এ পর্যন্ত আমরা লেখকের বিপদের কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু সৎ লেখকের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের বর্ধিষ্ণু ব্যবধানের ফলে শেষোক্তের ক্ষতির সম্ভাবনা আরও বেশী। লেখক সৃজনসামর্থ্যে ক্ষতিকেও ফলপ্রসূ ক'রে

ভুলতে পারেন ; মনোজগতের কোন সঙ্কটই তাঁর পক্ষে একেবারে অনতিক্রম্য নয়। ফলে যে সব বিপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে শক্তিমান লেখকের পক্ষে তার কোনটিই অবশ্যম্ভাবী বলা চলে না। সমকালীন অনাত্মীয়তার গ্লানি সত্ত্বেও তিনি মনের ভারসাম্য এবং উন্মুক্ততা নাও হারাতে পারেন ; সৃষ্টির দুর্লভ আনন্দ তাঁর কল্পনাকে নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও সরস রাখতে পারে। মঁতাই-য়ঁ-র মানসিক নিঃসঙ্গতার কথা কে না জানে? অথচ পশ্চিম ইয়োরোপের সাহিত্যে এই স্থিতধী মানুষটির কৌতুকপ্রোজ্জ্বল প্রবন্ধাবলীর তুলনা মেলা কঠিন।[৪] গোয়েটেকে আপনজন বলে জার্মানী কোন দিনই গ্রহণ করতে পারে নি। তাতে জার্মান জাতির অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে—সে ক্ষতি যে কত বড় সে-দেশের অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষ আজও তা বুঝতে শিখল না—কিন্তু তার ফলে গোয়েটের মানবতন্ত্রী প্রত্যয় এবং জীবনজিজ্ঞাসা এতটুকু শিথিল কি অবসাদগ্রস্ত হয় নি।[৫] সাহিত্যিক হচ্ছেন শিল্পী, স্রষ্টা ; তিনি সেই দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী যার বীজ নৈঃসঙ্গ্যের বন্ধ্যাভূমিতেও ফসল ফলাতে সক্ষম। তাই স্বদেশত্যাগী জয়েসের পক্ষে 'ইউলিসিস-এর' মত এপিক উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছিল। বুলভার হাউজ্‌মান-এর জানালাবন্ধ কর্কমোড়া ঘরে জীবন কাটিয়েও প্রুস্ত্‌ এ যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাসী উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন। চোর এবং লম্পট জ্যঁ-জেনে কারাগারে বসে মানুষের সর্বাত্মক ব্যর্থতা নিয়ে মহৎ নাটক লিখে গেছেন। জার্মানী ছাড়তে বাধ্য হয়েও টমাস মান কলম ছাড়েন নি : 'ডক্টর ফাউস্ট্‌স্‌'এর কাহিনীতে জার্মান সভ্যতার ট্রাজেডির মহত্তম বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন।

কিন্তু সাধারণ পাঠক সে ক্ষমতার অধিকারী নন। সৎ লেখকের মনোজগতে যদি তিনি প্রবেশ করতে অসমর্থ হন, তবে তাঁর যে-লোকসান তা পূরণ করা তাঁর সাধ্যের বাইরে। সাহিত্য আমাদের অনুভূতিকে সূক্ষ্মতর করে, আমাদের বোধে গভীরতা আনে, আমাদের বুদ্ধির পরিশীলন ঘটায়, আমাদের বিচিত্র এবং অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী চিত্তবৃত্তির মধ্যে সঙ্গতি আনে, অভ্যাসের আড়ষ্ট সঙ্কীর্ণতা দূর করে মনুষ্যত্বের অমিত সম্ভাবনা বিষয়ে আমাদের জাগ্রত করে তোলে। সাহিত্যপাঠে আমাদের মন সরস হয়, আমাদের বিচারে ঔদার্যের সঞ্চার ঘটে, আমরা সব দেশের সব কালের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের শক্তি অর্জন করি। সব চাইতে বড় কথা, সাহিত্যসম্ভোগের মধ্য দিয়ে

আমরা কিছুমাত্রায় সাহিত্যিকের সৃজন-অভিজ্ঞতার স্বাদ পাই; এবং যেহেতু সৃজনের মধ্যেই মানুষের মুক্তি, সে কারণে মানুষের জীবনে এ অভিজ্ঞতা অমূল্য। তাই সাহিত্যের এই দুর্লভ সম্পদে যে মানুষ অংশীদার হতে পারল না, তাকে নিতান্ত হতভাগ্য বলা ছাড়া উপায় দেখি না।

এখন সব লেখকই কিছু আর এ জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করতে পারেন না। যাঁরা পারেন, তাঁরাই সৎলেখক। কিন্তু তাঁরা ছাড়াও আরও বহু লোক লিখে থাকেন—সংখ্যায় এঁরাই চিরকাল গরিষ্ঠ—এবং মনের দিক থেকে এঁরা সাধারণ পাঠকদেরই স্তরের মানুষ। সাধারণ পাঠক এবং সমকালীন সৎ-লেখকদের মধ্যে যখন মানসিক ব্যবধান বৃহৎ হয়ে দেখা দেয়, তখন এই ইতর লেখকদের পোয়াবারো। সৎ লেখকেরা অভিমান বশে যতই সাধারণ পাঠক থেকে মুখ ফেরান, সাধারণ পাঠকরা ততই এই ইতর লেখকদের খপ্পরে পড়েন। কিন্তু এ লেখকদের কাছ থেকে তাঁরা না পান কোন গভীরতর জীবনবোধ, না কোন বিকাশশীল সংগতির ইঙ্গিত, না কোন সৃজনধর্মী মুক্তির আস্বাদ। এঁদের দৌড় ধরতাই বুলি পর্যন্ত। যে নিজে ভাবেনি সে অন্যকে ভাবাবে কি করে? যে নিজে ধনী নয়, অন্যকে সে কোন সম্পদের অংশ দেবে? এ জাতীয় লেখক শুধু সাময়িক বাহবা লুটে এবং সে বাহবা ভাঙিয়ে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য রোজগার করতে পারলেই খুশী। এঁদের আবেদন সাধারণ পাঠকদের অভ্যাসাশ্রয়ী গড্ডলবৃত্তির কাছে। তাদের অপরিণত বুদ্ধি, অন্ধ সংস্কার, সঙ্কীর্ণ বিচার, স্থূল অনুভূতি, মোহাচ্ছন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা, যৌথ জাড্যকে ভাঙিয়ে এঁদের কারবার। এঁরা পাঠকের বিকাশে সাহায্য তো করেনই না; বরং এঁদের ব্যাপক প্রভাবের ফলে সে-বিকাশের সম্ভাবনা পর্যন্ত দীর্ঘকালের মত রুদ্ধ এবং বিকৃত হবার আশঙ্কা আছে। শুধু তাই নয়, এঁদের প্রভাবের ফলে যে পাঠকরুচি গড়ে ওঠে তার টানে অনেক যথার্থ ক্ষমতাবান সাহিত্যিক পর্যন্ত স্বমার্গচ্যুত হতে পারেন। বিশেষ ক'রে আধুনিক কালে যখন অধিকাংশ লেখক জীবিকাসংস্থানের জন্য সাধারণ পাঠকদের পৃষ্ঠপোষণার উপরে নির্ভর করেন, তখন এ জাতীয় পদস্খলন সৎ সাহিত্যিকের পক্ষেও একেবারে অসম্ভব বলা চলে না। সে স্খলন শুধু যে ঐ বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিকের পক্ষেই মারাত্মক তা নয়, সে স্খলন সমস্ত মানবসমাজের পক্ষেই মারাত্মক। কারণ যতক্ষণ সৎ লেখক তাঁর স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ পাঠকের রুচিবিকৃতিকে সাময়িক

সঙ্কট মনে করে তা থেকে উদ্ধারের আশা আমরা পোষণ করতে পারি। কিন্তু সৎ লেখকও যদি মানুষের সম্ভাবনায় আস্থা হারান, তবে আর কোন্ খুঁটির জোরে আমরা সে প্রত্যয় টিঁকিয়ে রাখব?

॥ পাঁচ ॥

আধুনিক কালে কমবেশী প্রায় সব দেশেই সৎ লেখক এবং সাধারণ পাঠকের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবধানের সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। এ সমস্যার মূল সুদূর-প্রসারী: তা শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়। আধুনিক সমাজে জনসাধারণের অধিকার একদিকে যেমন স্বীকৃতিলাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি জনসমর্থনের সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বেড়ে চলেছে। বিত্তবান এবং দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান যেমন কমছে, তেমনি উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার উপরে রাষ্ট্রের একচেটিয়া দখল ক্রমেই সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে ঠিকই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে, শিক্ষাপদ্ধতিতে বৈচিত্র্য কমছে, শিক্ষকের স্বাধীনতা লোপ পাচ্ছে। এযুগে সাহিত্যের সঙ্কট এই সর্বব্যাপী সঙ্কটেরই একটা দিক।[৩] সাহিত্যের পাঠক বেড়ে চলেছে, কিন্তু তাদের সাহিত্যবোধ গড়ে উঠছে না। ফলে যাঁরা অভিমানী সাহিত্যিক তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাধারণ পাঠকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টিকে ক্রমেই আরো জটিল, আরো দুর্বোধ্য করে তুলছেন। অপরপক্ষে অধিকাংশ সাধারণ লেখক পাঠকসম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে সাহিত্যে স্থূলতার আমদানী করে চলেছেন। তাঁদের ভাষা অমার্জিত, প্রকাশরীতি ব্যঞ্জনাবিহীন, মানুষের আদিম পাশব প্রবৃত্তির কাছে তাঁদের আবেদন।

এ-সমস্যার সমাধান কোন পথে সে কথা বলা শক্ত। কেননা এ-সমস্যার স্বরূপ নিয়ে এখনো কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ-সমস্যা নিয়ে পশ্চিমী মনীষীরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা সুরু করেছেন; তার ফলে এর ব্যাপকতা এবং ভয়াবহতা সম্বন্ধে বোধ ক্রমেই গভীর হয়ে উঠছে। এসব আলোচনা থেকে সমাধানের একটা সম্ভাব্য সূত্র চোখে পড়ে। সাধারণ মানুষ আজ যে-সব অধিকার পেয়েছে, বা পেতে চলেছে, তা থেকে তাদের

বঞ্চিত করা সম্ভব নয়, এবং সে চেষ্টা কোন বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে সমর্থনযোগ্য নয়। আসল কাজ হল সাধারণ মানুষের অনুভূতি, সুকুমারবৃত্তি এবং মননশক্তির বিকাশসাধনের ব্যবস্থা করা। আজকের লেখক কখনই আর রাজা কিম্বা অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতার যুগে ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারেন না। কিন্তু তিনি যদি অক্ষরপরিচয়প্রাপ্ত পাঠকপাঠিকার অনুশীলনহীন ভোগসামর্থ্যের স্তরে নেমে এসে প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রয়াসী হন তাতে শিল্পী হিসেবে তাঁর নিজের সমূহ ক্ষতি ত হবেই, পাঠকসম্প্রদায়েরও তাতে কোনো লাভ হবে না। সৎসাহিত্যিকের কাছে সৎপাঠকের ন্যূনতম প্রত্যাশা, তিনি কখনো করুণা অথবা লোভের বশে তাঁর শিল্পবিবেককে দুর্বল হতে দেবেন না। অপর পক্ষে আজকের যুগে এই প্রত্যাশা পূরণের প্রধান সর্ত হল সৎপাঠকের সংখ্যা বাড়ানো। সাধারণ পাঠকের একটা বড় অংশকে সৎপাঠকে পরিণত করতে না পারা পর্যন্ত সাহিত্যের বর্তমান সঙ্কটের কোনো সমাধান অকল্পনীয়। এবং একাজে সাহিত্যিকের দায়িত্ব কতটুকু তা নির্ণয় করা কঠিন হলেও, শিক্ষক, সমালোচক এবং সমাজ-সংস্কারকের দায়িত্ব যে অনেকখানি সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

১। কিছুদিন পূর্বে আইরিশ অভিনেত্রী স্তোভান ম্যাক্‌কেনার মুখে "ফিনেগান্‌স্" থেকে একটি দীর্ঘ অংশ আবৃত্তি-অভিনয় শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্বল্পালোকিত রঙ্গমঞ্চে সুবেদী সঞ্চরণ এবং অনুনাদী ধ্বনিপ্রবাহ মিলে যে প্রতিরূপ মূর্ত হয়ে ওঠে তা রাগমালার সগোত্র। কিন্তু সাহিত্যের বহুবোধ ব্যঞ্জনা?

২। পাউণ্ড সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিত আলোচনা করি "ক্যালকাটা রিভিয়ু" পত্রিকায় (মে, ১৯৪৩), তারপরে "প্রেক্ষিত" (১৯৪৫) প্রবন্ধগ্রন্থে। তাছাড়া "র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট" পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২) **Ezra Pound and the Artist's Dilemma** প্রবন্ধেও কয়েকটি সূত্র নিয়ে কিছুটা বিচার বিশ্লেষণ করেছি।

৩। বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য আমার "নায়কের মৃত্যু" গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ এবং **Explorations** গ্রন্থে **"The crisis in Modern Literature"** প্রবন্ধ।

৪। কৌতূহলী পাঠকপাঠিকাকে আমার **Explorations** গ্রন্থে **Michel de Montaigne** প্রবন্ধটি পড়ার অনুরোধ জানিয়ে রাখি।

৫। গোয়েটে সম্পর্কে বাংলায় প্রাথমিক জীবনী লেখেন কাজী আবদুল ওদুদ। অন্নদাশঙ্কর রায়-ও গোয়েটে সম্পর্কে বাংলায় আলোচনা করেছেন।

কবির নির্বাসন

প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিকুলকে নির্বাসিত করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল যে কবিরা চরিত্রহীন, অসংযমী এবং সত্যভ্রষ্ট। চরিত্রহীন, তার প্রমাণ তাঁরা পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন চরিত্রের কল্পনা করে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন! অসংযমী, তার কারণ তাঁরা প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত এবং প্রেরণার উপরে যে কোন সংযম চলে না এ তো সকলেরই জানা। আর যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অনুকরণের মধ্যে কবি-কল্পনা স্ফূর্তিলাভ করে, সেই কারণে সত্য কখনও কাব্যের ধ্যেয় হতে পারে না। সত্য অজর, অমর, অতীন্দ্রিয়। শুধু দার্শনিকের একাগ্র সাধনার মধ্যেই সত্যের প্রতিফলন সম্ভব। সুতরাং জ্ঞান, ন্যায়নিষ্ঠা এবং চারিত্রের উপরে ভিত্তি করে কোন আদর্শ রাষ্ট্র যদি গড়ে তুলতে হয় তবে সে রাষ্ট্র থেকে, যত ব্যথিত মনেই হোক, কবিদের বিদায় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্লেটোর অন্যান্য চিন্তার মত কাব্য সম্বন্ধে এ-যুক্তি পরবর্তীকালের পশ্চিমী ভাবুকদের মন আলোড়িত করেছে। এঁদের মধ্যে যাঁরা কাব্যের সপক্ষে নানা কথা বলেছেন, তাঁদের অধিকাংশই প্লেটোর অভিযোগের মারাত্মক মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেন নি। সম্ভবত এক আরিস্টটলই বুঝতে পেরেছিলেন যে প্লেটোর দার্শনিক প্রত্যয়গুলিকে খণ্ডন করতে না পারলে কাব্য বিষয়ে তাঁর অভিযোগের কোন যথার্থ সদুত্তর সম্ভব নয়। এমন কি সিডনির মত সুরসিক কাব্যানুরাগী এবং শেলীর মত খাশ কবির পর্যন্ত মনে হয়েছিল প্লেটোর অন্যান্য প্রস্তাব মেনে নিয়েও কাব্য সম্বন্ধে তাঁর রায়কে বুঝি অগ্রাহ্য করা চলে। প্লেটোর মত কবিপ্রাণ দার্শনিক যদি শেষ পর্যন্ত কবিতার দাবি দর্শনের নামে খারিজ করে থাকেন, তবে তা যে অনেক ভেবেই করেছিলেন, এঁদের মত প্লেটোভক্তরাও সে-কথা বুঝতে পারেন নি ভাবতে তাজ্জব লাগে।

প্লেটোর সিদ্ধান্তে কোন খাঁটি সাহিত্যরসিক স্বভাবতই সায় দিতে পারবেন না। কিন্তু সায় না দেওয়া এক কথা, আর এ সিদ্ধান্ত বেঠিক বলে খারিজ করা আর এক কথা। মনে রাখা দরকার. প্লেটো মূলত সাহিত্যসমালোচক

ছিলেন না; তিনি দার্শনিক, পৃথিবীর সেরা দার্শনিকদের মধ্যে সর্বস্বীকৃতভাবে তিনি একজন। সুতরাং তাঁর বক্তব্যের সুবিচার করতে হলে যে দর্শনের কষ্টিপাথরে তিনি সাহিত্যকে যাচাই করেছেন, তার সঙ্গে নির্ভরযোগ্য পরিচয় থাকা দরকার। চারিত্র, সত্য, ও প্রেরণা বলতে প্লেটো যা বুঝেছেন তা যদি আমরা মেনে নিই, তবে সাহিত্য বিষয়ে প্লেটোর অভিযোগ খণ্ডন করা শুধু কঠিন নয়, বোধ হয় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

॥ এক ॥

প্লেটোর মতে আদর্শ সমাজে প্রতি ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং কর্মবিধি থাকা দরকার। তার জীবন এই দায়িত্ব এবং কর্মবিধির দ্বারা নিরূপিত হবে। যেমন, যে যোদ্ধা, তার জীবন ক্ষাত্র আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আবার যে দাস, তার সার্থকতা আদর্শ দাস হিসেবে গড়ে ওঠায়। সমাজে নিজের নির্দিষ্ট স্থানটি মেনে নিয়ে সেই স্থানের উপযোগী হয়ে ওঠার নাম চারিত্র। নিজের স্থানানুযায়ী কাজ করার নাম ন্যায়, আর সে স্থানের অনুপযোগী কাজ করার নাম অন্যায়। প্রজা প্রজার মত থাকবে, রাজা রাজার মত। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের খেয়াল-খুশিমত জীবনযাপন করতে চাইবে না। তার জীবন কর্তব্যের সরলরেখায় চালিত হবে এবং সে রেখা নির্দিষ্ট হবে সমাজসংগঠনের প্রয়োজন বিচার করে। ব্যক্তিচরিত্রে কোন অস্পষ্টতা, জটিলতা, বিরোধ, কি বহুমুখীনতা থাকবে না। আধুনিক জীবন থেকে উপমা নিলে যদি দোষ না হয় তবে বলা যায়, তার চরিত্র হবে কারখানায় তৈরী যন্ত্রের এক-একটি অংশের মত। যে বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যে সে তৈরী, সে উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে তার চরিত্র কতটা উপযোগী শুধু এটুকু বিচার করে ব্যক্তির মূল্য নির্ধারিত হবে। ব্যক্তির নিজস্ব কোন মূল্য নেই; সমাজযন্ত্রের অংশ হিসেবেই তার দাম। এ চিন্তার সঙ্গে হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ এবং কম্যুনিস্ট সমাজব্যবস্থার সাদৃশ্য হয়তো অস্পষ্ট নয়।

চারিত্রের উপরোক্ত ব্যাখ্যা যদি আমরা মেনে নিই, তবে সাহিত্যিক যে চরিত্রবান অথবা চারিত্রের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল—এ কথা বলা চলে না। কেন না সাহিত্যিকের কৌতূহল কোন বিশেষ কর্তব্য বা কর্মবিধির মধ্যে

আবদ্ধ নয়। সমাজে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে সেই স্থানের উপযোগী হয়ে ওঠাতেই ব্যক্তির পরমার্থ, কোন সৎ সাহিত্যিক এ তত্ত্ব মেনে নিতে গররাজী। সাহিত্যিকের কারবার সেই মানুষকে নিয়ে যে মানুষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিঃশেষিত নয়, যে মানুষের মন কোন পূর্বনির্দিষ্ট সরলরেখায় ধরা যায় না, যে মানুষ জটিল, বহুমুখী, আত্মবিভক্ত, যে মানুষ বহু সহস্র শতাব্দীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। সে মানুষের দেহমনের পরতে পরতে কত যুগের কত রূপান্তরের স্বাক্ষর প্রচ্ছন্ন; সে মানুষের অস্তিত্বে একই সঙ্গে আদিম অরণ্যের অন্ধকার স্মৃতি, আর ভবিষ্যৎ সভ্যতার উজ্জ্বল পূর্বকল্পনা মিশে আছে। এই জটিল, জঙ্গম, অসম্পূর্ণ অথচ সমগ্র ব্যক্তিমানুষকে সমাজপরিকল্পনার ছকে ফেলে তাকে চরিত্রবান করার এক ধরণের দার্শনিক মন হয়ত তৃপ্তিলাভ করতে পারে, কিন্তু খাঁটি সাহিত্যিকের চোখে সে চেষ্টা মূঢ়তা ছাড়া কিছু নয়। এ মূঢ়তা যতক্ষণ পর্যন্ত দর্শনের পাতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তা শুধু কৌতুকাবহ; কিন্তু যখন তা দর্শন ছেড়ে সামাজিক জীবনে প্রয়োগের আকার নেয়, তখন সে কৌতুক বড় মর্মান্তিক হয়ে ওঠে।

সাহিত্যিক মানুষের সমগ্র অথচ অসম্পূর্ণ রূপটিকে তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। আগে থেকেই যদি তাঁর মন কোন এক নির্দিষ্ট চারিত্রের ছকে বাঁধা পড়ে, তবে তিনি এ চেষ্টা করবেন কি করে? তাঁর সেই উন্মুক্ত উন্মুখ সহানুভূতিশীলতা থাকা দরকার, যার গুণে তিনি বিচিত্রপ্রকৃতির স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে প্রকৃত আত্মীয়তা অর্জন করতে পারেন। একই সঙ্গে ওথেলো এবং ইয়াগোর অন্তরঙ্গ হতে পারেন বলেই না শেক্সপীয়র বড় সাহিত্যিক; বুড়ো লীয়র এবং কিশোরী ওফেলিয়া উভয়েই তাঁর সহানুভূতিতে সমান অংশীদার। গোয়েটে যদি ফাউস্ট, মেফিস্টোফেলিস এবং মার্গারেটা তিনজনের সঙ্গেই একাত্ম না হতে পারতেন, তবে কে তাঁকে মহাকবি বলে স্বীকার করত? সাহিত্যিক শাস্ত্রপ্রণেতা নন, তিনি মানবতন্ত্রী।

অতঃপর সত্য সম্বন্ধে প্লেটোর ধারণার কথা ধরা যাক। প্লেটোর দর্শনে সত্য বিমূর্ত (abstract) কল্পনা। এ কল্পনা নিত্য, অজর, অব্রণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে আমরা যা কিছু দেখতে পাই, তাদের প্রত্যেকটিরই নাকি একটি আদি শাশ্বত রূপ আছে। এ রূপ অতীন্দ্রিয়, এর নিবাস পরিবর্তনশীল

ভৌতিক জগতের বাইরে। পৃথিবীতে নানা জাতের পশুপাখী, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি চোখে পড়ে। প্লেটোর মতে আসলে এরা সত্য নয়। প্রতি জাতের পশুর (যেমন ঘোড়া কি গরু) একটা আদর্শ রূপ আছে। জগতে আমরা যে সেই জাতের নানা পশু দেখি, তারা এই আদর্শের অনুকরণ বা ছায়ামাত্র। অনুকরণে শুধু যে নানা ত্রুটি থাকে তাই নয়, অনুকরণ মাত্রই অস্থায়ী। শুধু আদর্শ রূপটিই চিরস্থায়ী এবং ত্রুটিহীন। মানুষের ক্ষেত্রেও তেমনি কতকগুলি মূল আদর্শ রূপ আছে। পার্থিব ব্যক্তি-মানুষেরা এইসব রূপের ভঙ্গুর বিকৃত অনুকরণ মাত্র। শিল্পী-সাহিত্যিকেরা আবার এই অনুকরণের অনুকরণ করে তাঁদের শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি করেন। শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি তাই আদি সত্যের শুধু বিকার নয়, বিকারেরও বিকার। সত্যসন্ধিৎসু দার্শনিকের কাছে সাহিত্য নিতান্তই মূল্যহীন। অথবা শুধু মূল্যহীন নয়, মারাত্মক ভ্রমের আকর হিসেবে বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

সত্য সম্বন্ধে প্লেটোর এই ধারণা কতখানি সত্য? প্রায় দু হাজার বছর আগে পাইলেট 'সত্য কি?' প্রশ্ন করেছিলেন। আজ পর্যন্ত সে প্রশ্নের এমন কোন জবাব মেলে নি, যার যাথার্থ্য অন্তত দার্শনিকের কাছে সন্দেহাতীত। কিন্তু এই জবাব না মেলার মধ্যেই কি প্লেটোনিক ভ্রান্তির হদিস মেলে না? সত্য জ্ঞানের উপাদান, এবং শেষ পর্যন্ত সব জ্ঞানই ইন্দ্রিয়নির্ভর। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার উপরে বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটলে তবেই জ্ঞানের উদ্ভব সম্ভবপর হয়। নিজের এবং পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে তবেই না প্লেটো আদর্শ রূপের কল্পনা করেছিলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যদি একটিও ঘোড়া না থাকত, তা হলে কেউ কি আদর্শ ঘোড়া কল্পনা করতে পারত? যদি বলা হয়, এমন অনেক কল্পনা আছে, যার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিরূপ জগতে দেখা যায় না, তবে সে ক্ষেত্রেও বিশ্লেষণ করলে চোখে পড়বে এ সব কল্পনার উপাদান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে সংগৃহীত। পাখী এবং ঘোড়া দুই-ই আছে বলে তবেই না আমরা পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা ভাবতে পেরেছি।

আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়নির্ভর বলে সে জ্ঞানে কখনো সম্পূর্ণতা আসতে পারে না। আমরা বহু স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার তুলনা এবং বিশ্লেষণ করে তবে একটি ধারণায় পৌঁছই। এবং এ জগৎ বাস্তবিকই অনন্ত হোক বা না হোক, আমাদের মানসিক সামর্থ্যের হিসেবে তার অন্ত অকল্পনীয়। তা যে শুধু ব্যাপ্তিতে বিশাল, তাই নয়; সময়ের দিক থেকে বিচার করলে অতীত

ঘটনার আমরা কতটুকুই বা জানি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রায় কিছুই তো জানি না। তা ছাড়া প্রতি বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনার অগণিত দিক আছে। ফলে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আমরা যে সব ধারণা গড়ে তুলি, তাদের অসম্পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। অথচ অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোন পথে ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। কেননা যে সব ধারণা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করি, সেগুলিও আসলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে একদা গড়ে উঠেছিল। তবে জ্ঞান অভিজ্ঞতানির্ভর বলে এ সিদ্ধান্ত করা চলে না, যে ধারণা মাত্রই মায়া বা মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান মানুষের অনায়ত্ত, কেননা ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব কল্পনা। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য মানুষের আয়ত্তিসাধ্য। একদিকে ব্যাপ্তি এবং বিস্তৃতির দিক থেকে মানুষের অভিজ্ঞতা যত সমৃদ্ধি অর্জন করে এবং অন্যদিকে সে অভিজ্ঞতার তুলনাবিশ্লেষণের উপায়পদ্ধতি যত সূক্ষ্ম এবং নিপুণতর হয়, ততই জগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এবং সিদ্ধান্তে অধিকতর যাথার্থ্য এবং নির্ভরযোগ্যতা আসে। মানুষের জ্ঞান নিত্য নয়, তা বিকাশধর্মী।

এখন সাহিত্যিক প্লেটোনিক অর্থে সত্যসন্ধ নন। পূর্বকল্পিত কোন আদর্শ মানুষের কাহিনী রচনায় তাঁর কল্পনা স্ফূর্তি পায় না। স্থূল দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি-মানুষের মধ্যেই তিনি মানবীয় সত্যের অনুসন্ধান করেন। প্রতি মানুষই তাঁর কাছে অফুরন্ত রহস্যের আধার। তিনি ব্যক্তির চেতন, প্রাক্‌চেতন এবং অপরিস্ফুটচেতন সমগ্র রূপটি বোঝবার চেষ্টা করেন। তাঁর কাছে প্রতি ব্যক্তি একদিকে অনন্য, অন্যদিকে সব মানুষের প্রতিভূ। অন্য সব সত্যসন্ধানীদের মত তাঁর অন্বেষণও অসম্পূর্ণ। সব দেশের সব কালের সব মানুষের খবর রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর কোন একটি মানুষের সবখানি খবর কে-ই বা কবে জেনেছে। তবু এখানেও জানার কম-বেশি আছে। যে সাহিত্যিক মানুষ সম্বন্ধে যত বেশী অনুসন্ধান-তৎপর, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি তত বেশী মূল্যবান হবার সম্ভাবনা। চসার তাই ওয়র্ড্‌সওয়র্থের চাইতে অনেক বড় কবি; টলস্টয়ের পাশে উগোর উপন্যাস তাই জোলো ঠেকে। এই অর্থে সাহিত্যের সাধনাও সত্যের সাধনা। এ-সত্য প্লেটোনিক দর্শনের অবাস্তব ব্রহ্মসত্য নয়। এ-সত্য অভিজ্ঞতানির্ভর বিবর্তনশীল আপেক্ষিক মানব-সত্য।

॥ দুই ॥

পূর্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে আদর্শ-রাষ্ট্রে সাহিত্যের স্থান বিষয়ে প্লেটোর সিদ্ধান্ত শুধু সাহিত্য-বিশ্লেষণের দ্বারা নিরূপিত হয় নি; সে সিদ্ধান্ত মুখ্যত দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। তাঁর দর্শনে সত্য, ন্যায় বা চারিত্রের যে ব্যাখ্যা, তা মেনে নিলে সাহিত্যিককে সত্যসন্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ কি চরিত্রবান বলা চলে না। প্লেটোর সিদ্ধান্তে যদি আমরা সায় দিতে না পারি, তবে তার কারণ, প্লেটোর দার্শনিক প্রত্যয়গুলি আমাদের কাছে যথার্থ ঠেকে না। উল্টে আমাদের মনে হয়, প্লেটোর এই প্রত্যয়গুলি ভ্রান্ত এবং এবং এ-জাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা পরিচালিত চিন্তা এবং ব্যবহার মানুষের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর। কোন সৎ-সাহিত্যিকের মন যে এ-জাতীয় প্রত্যয়ে আরাম পায় না, সাহিত্য সম্বন্ধে এটা মস্ত বড় ভরসার কথা; এবং আমাদের ধারণা সাহিত্যিকেরা প্লেটোনিক অর্থে চরিত্রবান, ন্যায়নিষ্ঠ কি সত্যসন্ধ নন বলেই মানুষের কাছে সাহিত্যের দাম বেশী।

কথাটা প্রথম নজরে ধৃষ্টতার মত মনে হতে পারে; সুতরাং এ বিষয়ে হয়ত আর একটু বিশদ হবার প্রয়োজন আছে। জানবার ইচ্ছা যেমন মানুষের একটা মূল সহজাত বৃত্তি, মানবার প্রবণতা তেমনি মানুষের একটা সামান্য লক্ষণ। এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট; কিন্তু জীবদেহে স্থিতিস্থাপকতার সামর্থ্য অনেকখানি বলে মানবপ্রকৃতিতে অন্ত পাঁচটা বিরোধও সব সময়ে আত্মঘাতী সংঘাতরূপে দেখা দেয় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ-বিরোধ মানুষের চিন্তায় এবং জীবনে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল আমরা জানি না। যখন থেকে মানুষের ভাবনা উত্তরকালের মানুষদের বোধ্য রূপ নিতে শুরু করেছে, তখন থেকে আমরা সভ্যতার ইতিহাসে এই মৌল বিরোধের বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাই। সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাসমষ্টির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে কিছু বুদ্ধিমান কল্পনাশীল মানুষ কতকগুলি সামান্য ধারণা এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছয়; তারপর সেই সব ধারণা-সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করে জীবন-পরিচালনার প্রয়োজনে তারা সেই আংশিক জ্ঞানে পূর্ণতা আরোপ করে। তাদের তারা নিত্যসত্য বলে মানে এবং নানা প্রকরণপদ্ধতির সাহায্যে আপন আপন গোষ্ঠীর বাকী মানুষদের মানায়।[১] মানুষী বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাই যে

এসব প্রত্যয়ের একমাত্র উৎস, এ কথা জানতে পারলে পাছে অন্যমানুষেরা তাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে, তাই তারা সেসব প্রত্যয়কে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির নির্দেশ বলে চালাবার চেষ্টা করে। অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার উপরে মেকী ব্রহ্মজ্ঞানের তকমা চাপিয়ে আরোহী-বুদ্ধির মনে সন্ত্রাস জাগাবার চেষ্টা সভ্যতার ইতিহাসে অতি প্রাচীন ও পৌনঃপুনিক ঘটনা। এই তকমা যার প্রতীক, তার সম্বন্ধে বেশী প্রশ্ন করলে ধড় থেকে মুণ্ডটি খসে পড়তে পারে—প্রাচীন ভারতের এক তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি একদিন এ-জাতীয় ভয় দেখাতে কুণ্ঠিত হন নি। মুশা থেকে মহম্মদ, যাজ্ঞবল্ক্য থেকে যীশু, স্রেফ মানুষ হিসাবে মানুষের কাছে এঁরা কেউই নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করেন নি। এঁরা কেউ বা ব্রহ্মজ্ঞানী, কেউ বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ, আবার কেউ বা খোদ ঈশ্বরের সন্তান।

কিন্তু আংশিক জ্ঞানকে আপ্তবাক্য বলে মেনে নেওয়াই যদি মানুষের একমাত্র বৃত্তি হত তাহলে দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সমাজ-প্রতিষ্ঠান, এক কথায় মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের কোন বিকাশ সম্ভব হত না। মানুষ যেমন আংশিক ধারণাকে ব্রহ্মসত্য বলে মেনেছে এবং মানিয়েছে, তেমনি তারই সঙ্গে সে-ধারণার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয়ী হয়েছে, সে-ধারণাকে নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতা এবং চিন্তার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে চেয়েছে। তার জন্য তাকে দাম দিতে হয়েছে বিস্তর—বিশ্বাসের বাড়া শান্তি নেই, আর অবিশ্বাসের বাড়া অশান্তি নেই—তবু দাম দিতে সে গররাজী হয় নি বলেই মানুষের জ্ঞান পারমেনিদিস, কুংফুৎসে কি মনুতে এসে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। মানুষের জিজ্ঞাসু বুদ্ধি তাকে বার বার স্বনির্মিত সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে। শুধু যে প্রোটাগোরস, চুয়াঙ্‌ৎসু, চার্বাক কি এরাজমুসের মত মুক্তবুদ্ধি দার্শনিকেরাই মানসিক জাড্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তা নয়, সংস্কারবদ্ধ সাধারণ মানুষের মনেও তাদের সহজাত যুক্তিবৃত্তি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাড়নায় সক্রিয় হয়ে উঠে অভ্যস্ত ভাবনা-ধারণা সম্বন্ধে তাদের সংশয়ী করে তুলেছে।

বস্তুত সত্যসন্ধিৎসা মানবপ্রকৃতির অন্যতম মূলবৃত্তি, এবং এ-বৃত্তি যে-মানুষদের সাধনার মধ্যে সব চাইতে সার্থকতা লাভ করে, সাহিত্যিক তাঁদেরই একজন। প্রচলিত সংস্কারের ঐতিহ্যে আর পাঁচটা মানুষের মত সাহিত্যিকেরও বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক মন তাঁকে এ ঐতিহ্যের গণ্ডীর মধ্যে

আবদ্ধ থাকতে দেয় না। ধারণার চাইতে অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে বেশী মূল্যবান, বিমূর্ত আদর্শের চাইতে বাস্তব বিষয়ে তিনি অধিকতর কৌতূহলী। প্রচলিত ধারণা যে কত অসম্পূর্ণ, তার নিত্যতার দাবি যে কত ভিত্তিহীন, জীবন সম্বন্ধে তাঁর তীব্র অনুভূতিশীলতা সে বিষয়ে তাঁকে ক্রমেই সজাগ করে তোলে। দার্শনিকের মত সচেতন ভাবে তিনি হয়ত এসব ধারণার বিচার করতে বসেন না; কিন্তু তাঁর শাণিত জীবনবোধের স্পর্শে এদের মেকী ব্রহ্মত্ব সহজেই খসে পড়ে! বোকাচ্চিও, রাবলে, শেক্সপীয়র, সর্ভান্তিজ, গোয়েটে, স্তঁদাল, ইবসেনের মত সত্যসন্ধ পুরুষ ইয়োরোপের ইতিহাসে কজন চোখে পড়ে! এঁরা আমাদের কোন নিটোল, নিরন্ধ্র ব্রহ্মতত্ত্বের হদিস দিয়ে যান নি; কিন্তু আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করেছেন, বোধকে সূক্ষ্মতর করেছেন, চলতি ধারণার ঠুলি খসিয়ে মানুষের জটিল রহস্যময় অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। এ কাজ এঁরা পেরেছেন, তার কারণ, প্লেটোনিক আদর্শরূপের ধ্যান এঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি। পার্থিবকে অপার্থিব, পরিবর্তনশীলকে নিত্য, জটিলকে সরল, বহুকে এক, উন্মুক্তকে গণ্ডীবদ্ধ কল্পনা করে নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞ বলে জাহির করতে এঁদের বেধেছে। এঁদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, আপেক্ষিক, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সত্যবিমুখ নয়। মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার ইতিহাসে তাই শঙ্করাচার্য কি টমাস আক্যুইনাসের চাইতে শেক্সপীয়র ও টমাস মানের দাম অনেক বেশী।

॥ তিন ॥

যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি ন্যায় এবং চারিত্রের ক্ষেত্রেও সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী সমানভাবেই সত্যসন্ধ, সংস্কারমুক্ত এবং ফলপ্রসূ। সাহিত্যিকদের কাছে সমাজ বা শাস্ত্র-নির্দেশের চাইতে ব্যক্তি-মানুষ বেশী মূল্যবান। এখানে প্লেটোনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক মনোভাবের বিরোধ অতি সুস্পষ্ট। সব মানুষই একদিকে যেমন মানুষ, অন্যদিকে তেমনি প্রতি মানুষই অপর মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। তার প্রাতিস্বিক সমগ্রতায় সে অনন্য; সেখানে সে সকল সমীকরণের ঊর্ধ্বে। কিন্তু মানুষ সমাজে বাস করে, আর ব্যক্তির রফাহীন অনন্যতার উপরে ভিত্তি করে সমাজ গড়া শুধু কঠিন নয়, বোধ হয় একেবারেই অসম্ভব। পাঁচজন শুধু একত্র হলেই সমাজ হয় না; পাঁচজনের আচার-ব্যবহার, ভাবনা-চিন্তা একই বিধিব্যবস্থা, একই নীতিনির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

হলে তবেই সমাজ সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তি তার অনন্ততার দাবিকে কিছু পরিমাণে খর্ব না-করা পর্যন্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না। তবু একথা সব সময়েই স্মরণে রাখা দরকার যে সেই সমাজই আদর্শ সমাজ, যেখানে সামাজিকতার প্রয়োজনে ব্যক্তিত্বের সঙ্কোচন সব চাইতে কম, যেখানে সহযোগিতার ফলে প্রতিটি স্ত্রী-পুরুষের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিবর্ধমান।

মুস্কিল হল, সভ্যতার ইতিহাসে এতাবৎ অধিকাংশ সমাজেই ব্যক্তির অনন্ততাকে যতদূর সম্ভব খর্ব করে সামাজিক সামান্যতাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ে। এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা সংখ্যার গুরুত্বে সমাজ ব্যক্তির চাইতে প্রবল। ফলে ক্রমে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়, যেখানে সমাজ ব্যক্তির আত্মবিকাশের মাধ্যম না হয়ে তার আত্মবিলোপের যন্ত্র হয়ে ওঠে। ব্যক্তি তার নিজের স্বভাবকে অস্বীকার করে সমাজনির্দিষ্ট ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করার মধ্যে পরমার্থ খোঁজে। তার আচার-ব্যবহার, ভাবনা-চিন্তা, প্রত্যঙ্গ-প্রচেষ্টা, এমন কি আবেগ-অনুভূতি পর্যন্ত সামাজিক বিধি-নিষেধের দ্বারা নিরূপিত হতে থাকে। সে তখন আর ব্যক্তি নয়, সে তখন সমষ্টির অংশমাত্র। তার মধ্যে যেটুকু অনন্ততাবোধ এ অবস্থাতেও টিকে থাকে, তা নিয়ে তার মহালজ্জা। গড্ডলবৃত্তিই তখন তার বিবেকের মুখ্য অবলম্বন, সামাজিক বিধির অনুবর্তন তখন তার জীবনের মূল নীতি। এ অবস্থায় কি ব্যক্তি, কি সমাজ—দুই-এর মধ্যেই যে বিকাশের সম্ভাবনা দ্রুত ক্ষীণ হয়ে আসবে—এ আর বিচিত্র কি! মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় সমাজে মনুষ্যত্বের বিকাশ একদিন এই ভাবেই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল! দূরদেশের কথা দূরে থাক, এ দেশের হিন্দু এবং মুসলমান সমাজেও কি দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই মূঢ়তার আত্মঘাতী প্রভাব দেখে আসছি না?

এ মূঢ়তা থেকে সাহিত্য বার বার মানুষকে উদ্ধার করে এসেছে। কেননা যদিচ ভাষা ছাড়া সাহিত্য সম্ভব নয় এবং ভাষা সমাজেরই সৃষ্টি, তবু ব্যক্তিমানুষের অনন্ততাকে অবলম্বন করেই চিরদিন সাহিত্যকল্পনা স্ফূর্তি লাভ করে। সমাজের প্রভাবে আমরা বারবার প্রতি মানুষের অনন্ত সমগ্র রূপটিকে ভুলতে বসি, এবং সাহিত্যিক বার বার সেই রূপটি সম্বন্ধে আমাদের বোধকে জাগ্রত করেন। মানুষ যে শুধু সামাজিক জীব নয়, কোন পূর্বকল্পিত আদর্শের ছাঁচে যে তার সবখানি অস্তিত্বকে ধরানো যায় না, সে যে অনন্ত, তার মধ্যে যে অগণিত সম্ভাবনা বিকাশের জন্যে অপেক্ষমাণ—এ চেতনা সব সৎ-সাহিত্যের

কেন্দ্রে সক্রিয়। ব্যক্তির অনন্যতার স্বাদ না দিতে পারা পর্যন্ত ভাষা সাহিত্যের ব্যঞ্জনা অর্জন করে না।

লিরিক কবিতা, গাথাকাহিনী, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, এমন কি সাহিত্যপদবাচ্য প্রবন্ধের মধ্যেও অনন্য ব্যক্তি-মানসের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সামাজিক লঘুকরণের অন্তরালে ব্যক্তির যে জটিল, রহস্যময়, অমেয় অস্তিত্ব বর্তমান, সাহিত্যিকের মানবতাবোধ এবং সত্যসন্ধিৎসা তাকে বুঝতে এবং তাবার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চায়। ইলিয়ড-অডিসি কিংবা রামায়ণ-মহাভারতের মানুষ-মানুষী, দেব-দেবী, রাক্ষস-বানর, মায়াবিনী-কুহকিনীরা সমাজকল্পিত টাইপ নয়। তা যদি হত, ওসব বই পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয় হয়েই থাকত, সাধারণ মানুষদের মনে যুগ যুগ ধরে সাড়া তুলত না। মহাকাব্যের এইসব চরিত্র বিচিত্র ব্যক্তি-মানুষের স্বাদে সরস বলেই তারা আজও আমাদের মনে সংবেদনার সঞ্চার করে। তারা প্রত্যেকেই জটিল, অনন্য, রহস্যময়—কোনো ঔচিত্যের ছাঁদে তাদের গড়া হয় নি। দান্তের মহাকাব্য এক ভক্ত ক্যাথলিকেরা ছাড়া কেই-বা পড়ত, যদি না তাঁর নরকের স্তরে স্তরে অসংখ্য ব্যক্তি-মানুষের বিচিত্র মুখ উঁকি মারত। আর কি রহস্যময়, কি ইঙ্গিতপূর্ণ সে সব মুখ! এক লেওনার্দোর স্কেচ এবং কখনো-বা ডুয়েরার-এর ড্রইং-এর মধ্যে ছাড়া কোথায় তার তুলনা আছে? ওই একই গুণে সমৃদ্ধ না হলে 'ক্যান্টরবেরী টেলস্' কি অমর সাহিত্যের কোঠায় পড়ত? লিরিক-কবিদের রচনায় অবশ্য বহু চরিত্রের স্বাদ থাকে না; তাঁরা মুখ্যত নিজেদের কথাই লিখে থাকেন। কিন্তু সেখানেও তাঁরা যা ফুটিয়ে তোলেন, তা কোন শাস্ত্রনির্দেশের ছাঁচে-ঢালা ব্যক্তিচরিত্র নয়। তাঁদের নিজেদের মধ্যে যে জটিল বহুমুখীনতা আছে, নানাভাবে তারই নানা দিক নির্মোহ সততায় ফুটিয়ে তুলতে পারলে তবেই তাঁরা যথার্থ লিরিক-কবি। কাটুল্লুস কি লিপো, ডান কি হাইনে, বোদলেয়ার কি র‍্যাবোর কবিতায় ওই ওই কবির অনন্য ব্যক্তিত্বের বিচিত্র দিক প্রকাশিত, উদ্ঘাটিত হয়েছে বলেই না তাঁরা দেশকালের ব্যবধান পেরিয়ে সব দেশের রসিকদের আত্মীয়তা অর্জন করেছেন।

ব্যক্তি বিষয়ে এই অনন্তচিত্ত কৌতূহল নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট—এখানে তার প্রকাশ আরও বিচিত্র। ইউরিপিদিস্, শেক্সপীয়র, ইবসেন্ কি ও'নীল-এর চরিত্রেরা সামাজিক টাইপ নয়, তারা প্রত্যেকেই অনন্য ব্যক্তি। শুধু তাই নয়; ন্যায় বা ঔচিত্যের সংস্কারার্জিত গজকাঠি দিয়ে তাদের

মাপতে গেলে শুরু-শেষের হদিস মেলে না। সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত আমাদের মন বার বার এ কথা ভুলে যায় যে ব্যক্তি মাত্রই মূল্যবান এবং অদ্বিতীয়, প্রতি মানুষের মধ্যে এমন সব গূঢ় সম্ভাবনা বর্তমান যা অনির্দেশ্য, যাকে কোনো হিসেবের ছকে ফেলা যায় না। শুধু ভুলি না, ব্যবহারিক জীবনে এই অনন্ততার আভাস পেলে আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠি; হয় তাকে এড়াতে চাই, নয় তার শাস্তিবিধান করি। অথচ ওই গূঢ় নির্দেশ্যতা আছে বলেই মানুষের ইতিহাস অন্য সব জীবজন্তুর ইতিহাসের তুলনায় এত সমৃদ্ধ, এত বিচিত্র। সমাজ শুধু মানুষে মানুষে ব্যবহারিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। সাহিত্য তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবতাবোধের সামর্থ্যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করে তোলে। সাহিত্য পাঠের ফলে মানুষ সম্বন্ধে আমাদের বোধ সূক্ষ্মতর হয়; একদিকে আমাদের নিজেদের মন যেমন সরস, সজাগ এবং সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি অপরের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা সহজতর হয়। টলস্টয় কি ডস্টয়েভস্কির উপন্যাস, ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ড কি রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়ার পর মানুষকে আমরা নতুন করে বুঝতে শিখি। ব্যক্তি যে কোন উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মাত্র নয় (তা সে উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক না কেন), সে-যে স্বয়ংসিদ্ধ এবং সে কারণে মূল্যবান—সব মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির কেন্দ্রে এই মানবতন্ত্রী প্রত্যয় সক্রিয়। মানুষের যেটি পরিবেশনিরূপিত বাইরের রূপ, যার চরম উৎকর্ষের নাম চারিত্র—সমাজ আমাদের শুধু তারই হদিস দিতে পারে। কিন্তু যাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলি—ব্যক্তির চেতন, অচেতন, অবচেতন, জানা-অজানা, পরিবর্তনশীল অস্তিত্বের বিচিত্র সেই যে প্রাতিস্বিক সমগ্রতা—সে বিষয়ে জানতে হলে সাহিত্যিকের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আর এই জানাই হল যথার্থ নীতিবোধের মূল উৎস। যে ন্যায় মানুষকে শুধু খণ্ডিত খর্বিত করতেই জানে, যে বিবেক শুধু নিগ্রহেই পরিতৃপ্তি পায়, যে নীতিতত্ত্ব মানুষের বাহ্যিক ব্যবহারিক রূপের আড়ালে তার জটিল পরিবর্তনশীল সমগ্র অস্তিত্বের স্বীকারে পরাঙ্মুখ, তা শুধু অনুপযোগী নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশে তা মস্তবড় বাধা। এ বাধা অপসারণে সাহিত্যের দান অবিস্মরণীয়। সাহিত্যিকের কাছ থেকে আমরা আপনাকে এবং অপরকে ব্যক্তিহিসেবে মূল্য দিতে শিখি, শিখি যে ব্যক্তির বিকাশই সব নৈতিক মূল্যায়নের উৎস এবং মানদণ্ড, শিখি যে ব্যক্তি তার কর্মের চাইতে বড়, আর তাই শুধু বাইরের ব্যবহার দিয়ে কোন মানুষের বিচার করা মূঢ়তা মাত্র। সাহিত্যিক অবশ্য কোন নীতিকথার মাধ্যমে

এ শিক্ষা দেন না ; সাহিত্যপাঠজাত কৌতূহল এবং সংবেদনা পাঠককে নিগূঢ়-ভাবে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে। যেমন জ্ঞানের দিক থেকে, মনুষ্যত্ব বিকাশের দিক থেকেও তেমনি সাহিত্যিকদের দান তাই শাস্ত্রকারদের চাইতে বেশী মূল্যবান।

॥ চার ॥

এতাবৎ কাব্য তথা সাহিত্য বিষয়ে প্লেটোর তৃতীয় দফা অভিযোগের আমরা আলোচনা করি নি। কাব্যের উৎস প্রেরণা, এবং প্লেটোর মতে কোন ব্যক্তির মনে যতক্ষণ পর্যন্ত এতটুকু যুক্তিক্ষমতা সক্রিয় থাকে, ততক্ষণ তার পক্ষে অনুপ্রেরিত হওয়া অসম্ভব। সত্য এবং ন্যায়নিষ্ঠার মত প্রেরণা কথাটিরও প্লেটোনিক দর্শনে একটি বিশেষ অর্থ আছে। এ অর্থ তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়, তৎকাল-প্রচলিত হেলেনীয়-সংস্কার থেকে পাওয়া। গ্রীকভাষায় প্রেরণার যেটি প্রতিশব্দ enthousiasmos (মূল en+theos), যা থেকে ইংরেজী এনথুজিয়াজম্-এর উদ্ভব—তার সোজা মানে হল দেবতায় পাওয়া। আমরা যেমন বলি 'অমুকের ভর হয়েছে', গ্রীকরাও তেমনি বিশ্বাস করত বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ মানুষদের উপরে দেবতার ভর হয়। তখন তারা আর নিজেদের বশে থাকে না ; যুক্তিবহির্ভূত অলৌকিক শক্তিদের হাতের যন্ত্রে পর্যবসিত হয়। তাদের বুদ্ধিবিবেক তখন একেবারে মোহগ্রস্ত, সত্যমিথ্যা-ভালমন্দ বিভেদ করার শক্তি তখন সাময়িকভাবে লুপ্ত, তখন তারা কি যে বলছে, কি যে করছে, তা তারা নিজেরাই জানে না। আজকের দিনের অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত নরনারীর মত সেদিনের গ্রীক জনসাধারণও এ-জাতীয় প্রেরণাকে দৈবানুগ্রহ মনে করে এইসব দেবতায়-পাওয়া মানুষদের কাছে আপ্তবাণীর খোঁজ করত। সে বাণীর কোন মাথামুণ্ডু থাক বা না থাক, তবু তা স্বতঃসিদ্ধ, কেননা তার উৎস ভ্রান্তিশীল মানুষ নয়, তার উৎস স্বয়ং দেব-গোষ্ঠী।

প্লেটোর মতে পূর্বোক্ত অর্থে কবিরা অনুপ্রেরিত জীব। প্লেটোর পূর্বে কবি পিণ্ডারও কাব্যপ্রেরণা সম্বন্ধে এ ধরনের উক্তি করেছিলেন। প্লেটো আরও বিশদভাবে এ তত্ত্ব তাঁর নানা রচনায় গুরু সক্রেটিসের জবানীতে ব্যাখ্যা করেছেন। 'আয়ন' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, মহৎ কাব্যের রচয়িতারা কোন

যুক্তিসম্মত বিধি-নিয়মের বা আর্টের চর্চা ক'রে তাঁদের কল্পনায় মহত্ব অর্জন করেন না, তাঁদের সে মহত্ব দৈবসূত্রে পাওয়া; কাব্যরচনার সময় তাঁরা অলৌকিক শক্তিদের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেন। পরে তিনি আরও বলেছেন যে বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ লোপ না ঘটলে, দেবমন্দিরের নর্তকীদের মত বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ না হারাতে পারলে, এক কথায় একেবারে উন্মাদের দশায় না পৌঁছতে পারলে যথার্থ কবি হওয়া অসম্ভব। শুধু তাই নয়, কাব্যপ্রেরণার প্রভাব চুম্বকের মত; তিনিই সার্থক কবি যাঁর কাব্য স্থানকালনির্বিশেষে আবৃত্তিকারের পর আবৃত্তিকারকে, শ্রোতার পর শ্রোতাকে, মূল প্রেরণার চৌম্বক প্রভাবে আত্মবোধহীন উন্মাদে পর্যবসিত করতে পারে। সুতরাং কাব্য থেকে আমরা যা পেতে পারি তা জ্ঞান নয়, তা উন্মাদনা। কেননা, জ্ঞান যুক্তিনির্ভর, অপরপক্ষে যুক্তির লেশমাত্র বজায় থাকা পর্যন্ত না সম্ভব কাব্যসৃষ্টি, না কাব্যসম্ভোগ।

এই যদি কাব্যপ্রেরণার চরিত্র হয় তবে নিয়মনিয়ন্ত্রিত ন্যায়রাষ্ট্রে কবিদের কি করে স্থান হতে পারে? কবিরা কী দার্শনিক, কী ব্যবহারিক, কোন জ্ঞান দিতেই অক্ষম; তাঁরা ঔচিত্যের নির্দেশ মানতে অনিচ্ছুক; আর সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা, যে-ক্ষমতার জোরে তাঁরা কবি, সে ক্ষমতা অনতিক্রমণীয় ভাবে যুক্তিবিরোধী এবং সে কারণে তার নিয়ন্ত্রণ একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্বাসিত করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। প্লেটোর প্রথম যুগের রচনায় কাব্যপ্রেরণা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বিরোধ চোখে পড়ে। কবিরা জ্ঞানমার্গের সাধক নন; তাঁদের ভাবনা, ব্যবহার ন্যায়নিষ্ঠার দ্বারা সংস্কৃত নয়; তবু অনুপ্রেরিত অবস্থায় তাঁরা দৈবশক্তির অধিকারী। প্রেরণার বলে তাঁরা অলৌকিক জগতের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেন। এ কারণে প্রেরণাকে যুক্তিবিরোধী এবং অনিয়ন্ত্রণীয় বলা সত্ত্বেও প্লেটো গোড়ার দিকে ব্যতিক্রম হিসেবে তার যে একটা বিশেষ মূল্য আছে তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কাব্যপ্রেরণার এই বিশেষ মূল্যকে তিনি তাঁর দর্শনচিন্তায় তেমন আমল দেন নি। ব্রহ্মসত্যের অপরোক্ষানুভূতি তখনও তাঁর কাছে মূল্যবান ছিল; কিন্তু সে দুর্লভ অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ তখন আর প্রেরণা নয়, ক্ষুরধার ডায়ালেক্‌টিকের সুকঠিন সংযমেই তার প্রস্তুতি। বস্তুত আথেনীয় গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা ক্রমেই প্লেটোর মনে এ প্রত্যয় দৃঢ়মূল করেছিল যে প্রতিটি স্ত্রীপুরুষের চিন্তা, ব্যবহার, এক কথায় চরিত্র,

যতক্ষণ না কর্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ততক্ষণ মানব সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুতরাং যা কিছু এই নিয়ন্ত্রণের প্রতিবন্ধক, তার সমূল উৎপাটন অবশ্যকর্তব্য। প্লেটোর পরিণত কালের চিন্তাধারায় তাই এ যুগের সার্বিক (totalitarian) সমাজাদর্শ এবং শাসনপদ্ধতির পূর্বাভাস চোখে পড়ে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে প্রতি ব্যক্তির চরিত্র ও আচার-ব্যবহার পূর্ব পরিকল্পিত এবং নীতিনির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু যাঁরা প্রেরণার দাস, আদর্শ রাষ্ট্রের দার্শনিক শাসনকর্তারা তাঁদের চরিত্র এবং ব্যবহার কি করে নির্দিষ্ট করবেন? 'রিপব্‌লিক্'এর গোড়ার দিকে সক্রেটিসের মুখ দিয়ে প্লেটো অবশ্য বলেছেন যে কবিরা রাষ্ট্রপরিচালকদের নির্দেশ অনুযায়ী শুধু নীতিসঙ্গত কথা লিখবেন এ প্রতিশ্রুতি দিলে রাষ্ট্র তাঁদের পোষণ এবং সমর্থন করবে। কিন্তু কবিরা এ প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পালন করার সামর্থ্য তো তাঁদের নেই। কেননা প্রেরণার বশে তাঁরা যে কী লিখবেন কী বলবেন তা তো আগে থেকে তাঁরা নিজেরাও জানেন না। ফলে 'রিপব্‌লিকে'র শেষ অধ্যায়ে প্লেটো রায় দিলেন যে আদর্শরাষ্ট্রের চৌহদ্দী থেকে কবিদের খেদানো ছাড়া উপায় নেই। "কেননা, প্রিয় গ্লৌকন, যদিও জনসাধারণ সে কথা পুরো বোঝে না, তবু মানুষের সৎ হওয়া কি অসৎ হওয়ার উপরে অনেক কিছুই নির্ভর করছে এবং সে কারণে কি খ্যাতি, কি বিত্ত, কি পদমর্যাদা, কি কাব্য কোন কিছুর সম্মোহনেই ন্যায় এবং অন্যান্য নৈতিক আদর্শকে কিছুতে অবহেলা করা চলবে না।" অতএব দার্শনিকের রাষ্ট্র থেকে কাব্যলক্ষ্মীকে, যত বিষণ্ণচিত্তেই হোক, শেষ পর্যন্ত বিদায় দিতে হল।

॥ পাঁচ ॥

কিংবদন্তী অনুসারে প্লেটো প্রথম যৌবনে কবি ছিলেন। গুরু সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সে-সব কবিতা নাকি তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। গ্রীক কাব্যসঙ্কলনে তাঁর লেখা বলে প্রচলিত কিছু কিছু টুকরো কবিতাও পাওয়া যায়। এ কিংবদন্তী সত্য কি না, এসব কবিতা যথার্থই প্লেটোর রচনা কি না, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন, তাঁর নানা দার্শনিক রচনা থেকে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে এই ঘোর কাব্যবিরোধী দার্শনিক প্রকৃতির দিক থেকে অনেকখানিই কবিদের

সমধর্মী ছিলেন। ফলে কাব্যপ্রেরণা বিষয়ে তাঁর বিবরণে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শ পাওয়া যায়। দেবতায়-পাওয়া ইত্যাদি আদিম ধারণা-কল্পনা বাদ দিলে এ কথা বোধ হয় সব সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক স্বীকার করবেন যে সাহিত্যসৃষ্টির মূলে এমন এক শক্তি সক্রিয়, যার উপরে কোন হুকুম খাটে না। এই শক্তিরই নামকরণ করা হয়েছে প্রেরণা। আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্ররা এ শক্তিকে পর্যন্ত নিজেদের তাঁবেদার করার চেষ্টা করেছে। ফলে যদিও সে সব দেশে বছরে বছরে কেতাব ছাপা হয়েছে বিস্তর, কিন্তু সাহিত্য-প্রেরণা এসেছে শুকিয়ে। যাঁরা জাত-সাহিত্যিক, তাঁরা হয় দেশ ছেড়েছেন (যেমন টমাস্ মান কি ইভান্ বুনিন), নয় আত্মহত্যা করেছেন (যেমন মায়াকোভস্কী), নয় কারাগারে, দাসশিবিরে কি গ্যাসচেম্বারে প্রাণ দিয়েছেন। তবু অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্রশক্তি আজ পর্যন্ত শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রেরণাকে পুরোপুরি আপন মুঠোয় আনতে সমর্থ হয় নি। এসব অভিজ্ঞতা প্রেরণা বিষয়ে প্লেটোর বিশ্লেষণকে স্পষ্টই সমর্থন করে।

প্রেরণার উৎস যে কি তা আমরা আজও জানি না ; তবে এটুকু আমরা জানি যে তা শুধু সমাজ এবং রাষ্ট্রের আয়ত্তের বাইরে নয়, শিল্পী-সাহিত্যিকের নিজেরও তার উপরে বিশেষ কোন হাত নেই। এই হাত-না-থাকা দু অর্থে সত্য। অত্যন্ত সংযমী লেখকও যখন ভিতরকার তাগিদে লিখতে বসেন, তখন সে লেখা শেষ পর্যন্ত কি রূপ নিয়ে গড়ে উঠবে আগে থেকে সেটি তার পক্ষে নিশ্চিত করে জানা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, সৃষ্টিপ্রেরণা যতক্ষণ সক্রিয় ততক্ষণ তার দাবি অস্বীকার করার সামর্থ্য সে প্রেরণার অধিকারীর নেই। এ দিক থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক প্রেরণার অধিকারী হয়েও প্রেরণার দাস। লেখকের মনে যখন লেখার প্রেরণা আসে, তখন তাকে লিখতেই হবে, কাগজ-কলম না পেলে অন্তত মনে মনে, অন্তত মুখের ভাষায় তার সে প্রেরণাকে প্রকাশ করতে হবে। অন্য শ্রোতা কি পাঠক না থাক, সে রূপ নিজের কানে শুনতে হবে, নিজের চোখে দেখতে হবে। এ না হওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই, অন্য কাজে মন নেই, অন্য চিন্তার অবসর নেই।

কিন্তু প্রেরণাই তো সাহিত্যের একমাত্র সূত্র নয়। সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির জন্য সুকঠিন সংযমেরও একান্ত প্রয়োজন আছে। প্লেটো এ দিকটি একেবারে অবহেলা করেছেন। শিল্পকর্মের (Ars) অনুশীলন যে সাহিত্যিকের পক্ষে প্রেরণার (ingenium) চাইতে কম আবশ্যিক নয়, পরবর্তীকালে

বৈজন্তীয় এবং রোমান আলঙ্কারিকেরা এ সত্য বিশদ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত করেন।[২] প্রেরণার উপরে সাহিত্যিকের হাত নেই, কিন্তু আত্ম-প্রস্তুতির উপরে অন্য মানুষদের মত তাঁরও পুরোপুরি হাত আছে। আত্ম-প্রস্তুতি সচেতনপ্রয়াসসাপেক্ষ। তার নানা দিক আছে—সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার দুটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সব শিল্পই মাধ্যমনির্ভর, এবং মাধ্যমকে বশে না আনতে পারা পর্যন্ত সে মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব। বশে আনার অর্থ সে মাধ্যমের বিচিত্র সম্ভাবনা বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং সে সব সম্ভাবনাকে প্রকাশের উপায়রূপে ব্যবহার করার সামর্থ্য অর্জন করা। সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা। ভাষা তো সকলেই ব্যবহার করে, কিন্তু ভাষার মধ্যে কতখানি প্রকাশের শক্তি নিহিত আছে তার খোঁজ শুধু সাহিত্যশিল্পী রাখেন। সে খোঁজ পাবার জন্য তাঁকে গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়।[৩] ধ্বনিতে ধ্বনিতে ছন্দোব্যঞ্জনার কত যে পার্থক্য, শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠনের বিচিত্র কৌশলে অল্পকথার মধ্যে কত বেশী অর্থ যে ধরানো যায়, ঠিক কোন্ শব্দটি কি ভাবে প্রয়োগ করলে একটি উদ্দিষ্ট ভাব বা অভিজ্ঞতা তার যথার্থ প্রকাশ লাভ করে, এ সব বিষয়ে সূক্ষ্মজ্ঞান এবং সে জ্ঞান প্রয়োগে নিপুণতা বড় সহজে অর্জন করা যায় না। সাহিত্যিকের আত্মপ্রস্তুতির জন্য তাই মাধ্যমচর্চা একান্ত প্রয়োজন; সুতরাং মননশীলতা সাহিত্যসাধনার অপরিহার্য অঙ্গ।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যসৃষ্টির জন্য লেখকের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধি থাকা দরকার। অভিজ্ঞতা ছাড়া কল্পনার বিস্তার এবং বৈচিত্র্য সম্ভবপর নয়। অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় সূত্রেই অর্জিত হতে পারে। কিন্তু যে সূত্রেই লব্ধ হোক, সে অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করতে হ'লে তাকে মননের দ্বারা জারিত করে নিতে হয়। শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না; সাহিত্যের উপাদান হল তাৎপর্যের দ্বারা অন্বিত অভিজ্ঞতা। এ কাজও সাধনাসাপেক্ষ। একদিকে মাধ্যমের সাধনা এবং অন্যদিকে অভিজ্ঞতার সাধনা, এ দুয়ের সমাবেশ ঘটলে তবে সাহিত্যপ্রেরণা সাহিত্যরূপে ফলপ্রসূ হতে পারে। এতখানি মননশীলতার সংযম যাঁরা স্বেচ্ছায় স্বীকার ক'রে থাকেন, তাঁদের অসংযমী কি অস্থিরবুদ্ধি বলে অভিযুক্ত করা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নয়।

২।। ৩।। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

প্লেটোর যুক্তিতে এ ছাড়া আরও একটি মারাত্মক ভুল বর্তমান। যৌক্তিকতা এবং মুক্তিস্পৃহার মধ্যে প্রবণতার দিক থেকে বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে অনতিক্রমণীয় মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এ দুয়ের মধ্যে গূঢ় সহযোগিতার ফলেই মানুষের বিকাশ সম্ভবপর হয়।[৪] একথা ঠিক যে মুক্তিস্পৃহার প্রবণতা সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে ফেলার দিকে; অপরপক্ষে যুক্তি শুধু যে নিয়মানুগ তাই নয়, যা আপাতদৃষ্টিতে শৃঙ্খলাহীন তার মধ্যে নিয়মের সন্ধান করাই তার কাজ। তবু মুক্তি যদি শুধু নঞর্থক না হয়, তবে জ্ঞানের সহযোগ ছাড়া তার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। এবং সংসারে নিয়মের রাজত্ব আবিষ্কার করা নিরর্থক যদি না সে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ঘটিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে পারে। বিকাশের এ ডায়ালেকৃটিক যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, তাঁদের দর্শনে হয় যুক্তিবুদ্ধি নয় মুক্তিস্পৃহা অবহেলিত হয়। প্রথমটির উদাহরণ রুশো, দ্বিতীয়টির উদাহরণ প্লেটো। এবং এদের মধ্যে একটিকে অবহেলা করলে অন্যটির রূপও যে বিকৃত হয়, এই দুই অসামান্য প্রভাবশালী দার্শনিকের রচনা তারই প্রমাণ। মুক্তিস্পৃহাকে অবহেলা করার ফলে প্লেটোর চিন্তায় যুক্তিবুদ্ধি স্বমার্গ ত্যাগ ক'রে অতিপ্রাকৃত সাধনায় নিয়োজিত হয়েছে। অন্যদিকে যুক্তিকে পরিহার করার ফলে রুশোর দর্শনে মুক্তিস্পৃহা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছে যূথবদ্ধ গড্ডলবৃত্তিতে।

এখন প্রেরণা এই মুক্তিস্পৃহারই একটি বিশেষ প্রকাশ। সাহিত্য প্রেরণাসঞ্জাত বলে সাহিত্যের মধ্যে মুক্তির এক অতি গূঢ় দুর্লভ স্বাদ পাওয়া যায়। প্লেটো সম্ভবত তা জানতেন, এবং হয়তো সে কারণেই তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে প্রেরণার জন্য কোন স্থান রাখেন নি। তাঁর আশঙ্কা ছিল সাহিত্যের মারফৎ মানুষ যদি মুক্তির স্বাদ পায়, তবে তারা আর তাঁর নিয়মনিয়ন্ত্রিত দার্শনিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা মানতে চাইবে না। তাঁর আশঙ্কা যে ভিত্তিহীন, এ কথা বলতে পারি না; কিন্তু সে আশঙ্কাই কি প্রমাণ করে না যে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের বনিয়াদ অত্যন্ত দুর্বল, যে তাঁর আদর্শরাষ্ট্রের আদর্শ টাই অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ভ্রান্ত? ব্যক্তির মুক্তিস্পৃহাকে অবদমিত করতে চায় যে রাষ্ট্র, তাকে কোন্ অর্থে আদর্শ বলতে পারি? সাধারণভাবে মুক্তিস্পৃহাকে, বিশেষভাবে প্রেরণাকে আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা মার্জিত, শীলিত করার অবশ্যই

৬ ॥ প্রবন্ধের শেষে চতুর্থ টীকা।

প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে স্পৃহা ও প্রেরণাকে সমূলে উৎপাটিত করা যে প্রস্তুতির উদ্দেশ্য, তাকে আত্মঘাতী ছাড়া আর কি বলা যায়? বাস্তবিক পক্ষে মানুষের জীবনে সাহিত্য যে এত মূল্যবান, এই প্রেরণাগুণ কি তার অন্যতম প্রধান হেতু নয়? কেননা, প্রেরণা শুধু সাহিত্যস্রষ্টাকেই মুক্তির স্বাদ দেয় না, সাহিত্যভোক্তাকেও সে স্বাদে সমৃদ্ধ করে থাকে। মানুষের জীবনে এ স্বাদের কোন তুলনা নেই। প্লেটো নিজে এ স্বাদে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শরাষ্ট্রের নাগরিকদের এ স্বাদে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন।

সৌভাগ্যবশত প্লেটোর সে চাওয়া বাস্তবজীবনে কার্যকরী হয় নি। কাহিনী আছে যে তাঁর শিষ্য ডিওনিসিয়স যখন সিরাকুসের শাসনকর্তা, তখন তিনি শিষ্যের মারফৎ সে দেশকে নিজের আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে সে দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দেয় এবং প্লেটোকে আত্মরক্ষার জন্যে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনা 'Laws' গ্রন্থে তিনি যে দর্শনের চাইতে ধর্মের উপরে বেশী জোর দিয়েছিলেন, অনেক পণ্ডিতের মতে এটি আসলে ঐ রূঢ় অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া। সে যা-ই হোক, প্রত্যক্ষভাবে তাঁর জীবনদর্শনকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে রূপ দিতে না পারলেও, পরোক্ষভাবে সে দর্শন যে পরবর্তী প্রায় আড়াই হাজার বছরের পশ্চিমী চিন্তা এবং জীবনযাত্রার উপরে প্রবল প্রভাব ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই। হোয়াইটহেড তো বলেছেন যে পশ্চিমী চিন্তার ইতিহাস প্লেটোর পাদটীকা মাত্র। এটি অতিশয়োক্তি; কিন্তু আজও যে ইয়োরোপীয়-মানস প্লেটোনিক জীবনদর্শনের মারাত্মক প্রভাব অতিক্রম করতে পারে নি, তার হাজারো প্রমাণ চোখে পড়ে।[৫] অধুনা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সব সার্বিক জীবনদর্শন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তাদের সঙ্গে প্লেটোনিক চিন্তার আত্মীয়তা স্পষ্ট। এবং অন্য কোন যুক্তি-প্রমাণ যদি নাও দেখানো হয়, শুধু এই সব রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে প্লেটোনিক জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কি শিল্পসাহিত্য, কি মানুষের মুক্তিসাধনা উভয়ের ভবিষ্যৎই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন।[৬]

৫॥ প্রবন্ধের শেষে পঞ্চম টীকা।

৬॥ প্রবন্ধের শেষে ষষ্ঠ টীকা।

১। কেন এবং কি উপায়ে নিজস্ব নৈতিক সিদ্ধান্তকে সর্বজনগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্যে সৎ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিও তাকে ঐশ্বরিক নির্দেশরূপে উপস্থিত করে থাকেন, টমাস মান তাঁর The Tables of the Law কাহিনীতে তারই একটি বড় সুন্দর এবং বিদগ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন। এই কাহিনীর নায়ক ইহুদী ইতিহাসের মুখ্যচরিত্র মুশা। ভারতবর্ষে মান-এর মতো প্রাজ্ঞ এবং সুরসিক লেখক থাকলে মহাভারতের কৃষ্ণকে নিয়েও এমনিতর উপন্যাস হয়ত রচিত হত।

২। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে J. F. D'Alton এর *Roman Literary Theory and Criticism* গ্রন্থে।

৩। পশ্চিমী সাহিত্যে মালার্মে, পেটার, এলিয়ট প্রমুখ অনেকেই এই দিকটির উপরে বিশেষ ঝোঁক দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে এদিকে যাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিম, প্রমথ চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিশেষভাবে স্মরণীয়।

৪। মানবেন্দ্র নাথ রায় তাঁর *Reason, Romanticism and Revolution* গ্রন্থে যুক্তি ও মুক্তির পরস্পর নির্ভরতার উপরে প্রচুর আলোকপাত করেছেন।

৫। প্লেটোর প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা এবং প্রভাবের সবচাইতে বিশ্লেষণাত্মক বিচার পাওয়া যাবে কার্ল পপারের *The Open Society and Its Enemies* মহাগ্রন্থের প্রথম গ্রন্থে। তাছাড়া লাঙে-র *The History of Materialism* এবং রাসেলের *A History of Western Philosophy*-তেও এদিক নিয়ে আলোচনা আছে।

৬। "সাহিত্যচিন্তা" গ্রন্থের অন্তর্গত হয়ে এই প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয় তখন এটির নাম ছিল "প্লেটোর সাহিত্যবিচার"। ঐ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করেন পি. কার্লো ("সাহিত্যপত্র", অষ্টমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৬৩)। তিনি বিশেষ করে প্লেটো সম্পর্কে আমার বক্তব্যে আপত্তি তোলেন। কৌতূহলী পাঠক অধ্যাপক কার্লো-র যুক্তি এবং আমার প্রত্যুত্তর (সাহিত্যপত্র, অষ্টমবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৬৩) পড়ে দেখতে পারেন।

ক্লাসিক ও রোমান্টিক

ক্লাসিক এবং রোমান্টিক এই শব্দ দুটির কোন যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ আছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। কোন কোন লেখক ক্লাসিকের তর্জমায় ধ্রুপদী এবং রোমান্টিকের তর্জমায় খেয়ালী শব্দ দুটি ব্যবহার করে থাকেন। আমি নিজেও আমার পূর্বকার কোন কোন রচনায় ঐ প্রতিশব্দ দুটি ব্যবহার করেছি। কিন্তু ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে পাঠ, চিন্তা এবং আলোচনার ফলে ক্রমশঃই আমার মনে এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়মূল হয়েছে যে ভাষান্তরের ফলে ঐ শব্দদুটির অর্থসমৃদ্ধি খণ্ডিত হবার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশী। সুতরাং আমার প্রস্তাব, ক্লাসিক এবং রোমান্টিক শব্দদুটিকে অবিকৃত অবস্থায় আমাদের ভাষায় আত্মস্থ করে নেওয়া হোক।

।। এক ।।

ক্লাসিকের ধ্যেয় রূপ, রোমান্টিকের সাধনা প্রকাশ। ক্লাসিক মানস ঐতিহ্যের অনুকর্ষে মার্জিত, রোমান্টিক মানস স্বকীয়তার স্বাক্ষরে সিদ্ধিকামী। ক্লাসিক শিল্পী হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের ভাষায় আকাশ থেকে দৈবীরূপ ধ্যানযোগে আকর্ষণ করে নিজের চিত্তলোকে প্রত্যক্ষ করেন ; তাতে তাঁর চিত্ত সংস্কৃত হয়, অহং-এর সামান্যতা থেকে সত্তার মুক্তি ঘটে।[১] এই রূপ অজর, অব্রণ এবং আত্মসম্পূর্ণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাধ্যমে ধ্যানধৃত রূপকে আকার দেওয়া ক্লাসিক শিল্পের একাগ্র সাধনা। এই রূপের অপরোক্ষানুভূতিই প্রকৃত সমাধি। অর্থাৎ ক্লাসিক শিল্পীর বিচারে তাঁর প্রাতিস্বিকতা নির্মূল্য, এমন কি তাঁর শিল্পসাধনায় বাধা মাত্র। রূপের ধ্যানে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের দ্বারা তাঁর ব্যক্তিসত্তা সংস্কৃত এবং সার্থক হয়ে ওঠে।

রোমান্টিক মানস ঠিক এর বিপরীত। রোমান্টিকের দৃষ্টিতে সব অর্থসমৃদ্ধ প্রচেষ্টার মূল উৎস ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধে। সেই কাজেরই শুধু অর্থ আছে যার ভিতরে কর্তার ব্যক্তিত্ব স্ব-প্রকাশ। শিল্পে শিল্পী আপনার বিশিষ্ট সত্তাকে নানা পরোক্ষ মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। শিল্পের মধ্যে ব্যক্তি আপনার বিশেষ এবং অদ্বিতীয় অস্তিত্বের স্বাক্ষর রাখেন বলেই না শিল্পরচনা মূল্যবান। রোমান্টিকের শ্রেয় চিত্তের সংস্কার নয়, চিত্তের মুক্তি। ক্লাসিক মন যে রূপকে

স্থানকালপাত্রোত্তীর্ণ বলে কল্পনা করে, রোমান্টিক মন তাকেই বিশেষকালে বিশেষস্থানে বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি বলে নিশ্চিত জানে। রোমান্টিক তাঁর অহংকে নিয়ে এতটুকু অপ্রতিভ নন। বরং এই অহং যে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার উৎস এ বিশ্বাসে তিনি রীতিমত গর্বিত এবং উৎফুল্ল বোধ করেন।

অর্থাৎ ক্লাসিক সাধনার সিদ্ধি হল নিত্যরূপের মধ্যে প্রাতিস্বিকের নির্বাণে আর রোমান্টিক উদ্বেগের পরিতৃপ্তি হল ব্যক্তির প্রকাশপ্রচেষ্টার উপর থেকে সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণের বিলোপে। উভয়েরই উদ্ভব দ্বৈতে, সার্থকতা অদ্বৈতে। সার্থকতা, এবং একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বিলয়ও বটে।

সুতরাং ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের প্রভেদ যে মৌলিক তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং মৌলিক বলেই তা বিস্তৃত ও দূরপ্রসারী। সচেতন কার্যকলাপের যে কোন ক্ষেত্র বিচার করলে এই প্রভেদ নজরে পড়বে। ক্লাসিক-রুচি দর্শনের আদর্শ গাণিতিক প্রত্যয়; রোমান্টিক বিশ্ববীক্ষার কেন্দ্রে আছে জৈব অভীপ্সা। ক্লাসিক নীতিশাস্ত্রের মূল কথা নিয়মনিষ্ঠা; রোমান্টিক শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিবেকবোধ ছাড়া অন্য কোন মানদণ্ড স্বীকার করেন না। ক্লাসিক সমাজতত্ত্ব ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দেয়। রোমান্টিক সমাজতত্ত্বে ব্যক্তিই উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠান বিধেয়-মাত্র। ক্লাসিক দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রতি নিরভিমান আনুগত্যে নাগরিকের কল্যাণ। অপরপক্ষে রোমান্টিক দাবী করেন যে, রাষ্ট্রের কোন মূল্যই নেই যদি না তা নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। দেকার্তে এবং নীট্শে, কান্ট্ এবং কীর্কেগার্ড্, কুংফুৎসে এবং ক্রোপট্কিন্, হেগেল এবং হর্বর্ট রীড, এলিয়ট এবং সার্ত্র—এঁদের মাঝখানে যে ব্যবধান তা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য। ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের মধ্যে পারস্পরিক মন-জানাজানির অবকাশ কচিৎ। কারণ ক্লাসিকপন্থী রোমান্টিককে অবজ্ঞা করেন অপরিণতবুদ্ধি বলে, আর রোমান্টিক ক্লাসিকপন্থীকে বর্জন করেন জীবন্মৃত এই ধারণায়।

। দুই ।

এ পর্যন্ত আমরা ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের বিভেদতত্ত্বই শুধু আলোচনা করেছি। পার্থক্য পরিস্ফুট করার জন্য স্বভাবতঃই আমাদের বিশুদ্ধ ক্লাসিক এবং বিশুদ্ধ রোমান্টিক চরিত্র কল্পনা করতে হয়েছে। মোটমাট সে পার্থক্য

পরিস্ফুট হয়েছে ধরে নিলে অতঃপর এ সত্য স্মরণ করার প্রয়োজন আছে যে সব বিশুদ্ধ চরিত্রের মত এ দুটিও বিমূর্ত কল্পনামাত্র। কারণ যা-কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই মিশ্রিত এবং নিষ্কলুষ বিশুদ্ধতা একমাত্র গণিতেই সম্ভব।

সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার স্তরে বিচার করলে দেখা যাবে যে আমূল বিরোধ সত্ত্বেও মানুষের জীবনে, চিন্তায়, ক্রিয়াকর্মে ক্লাসিক এবং রোমান্টিক নানা রূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে। কোন বিশেষ মিশ্রণে-বা ক্লাসিক মেজাজের প্রভাব বেশী প্রবল, কোনটিতে-বা রোমান্টিকের। বস্তুতঃ আমরা যখন কোন ব্যক্তি, রচনা কিংবা আন্দোলনকে ক্লাসিক কি রোমান্টিক আখ্যা দিই, তখন আমরা ঐ বিশেষ মিশ্রণের ক্ষেত্রে মেজাজটির আপেক্ষিক প্রভাবের কথাই উল্লেখ করে থাকি। সেই মিশ্রণই ক্লাসিক যাতে প্রকাশ অপেক্ষা রূপের, অভীপ্সা অপেক্ষা যুক্তির, অভিনবত্ব অপেক্ষা ঐতিহ্যবোধের প্রভাব প্রবলতর। অপরপক্ষে সেই মিশ্রণই রোমান্টিক যাতে যুক্তি অপেক্ষা আবেগের, রেখা অপেক্ষা রঙের, আকার অপেক্ষা গতির, ঐতিহ্য অপেক্ষা প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর প্রধান।

মানুষের জীবনে ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের এই মিশ্রণ মোটেই আকস্মিক নয়। বরং একটু লক্ষ্য করলে চোখে পড়বে এই মিশ্রণ মানবসত্তায় অন্তর্নিহিত বলেই মানুষের বহুমুখী বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের কি ব্যক্তিগত কি সমাজগত বিকাশের মূলসূত্র দুটি: মুক্তি এবং জ্ঞান। প্রতি মানুষের মধ্যেই বহুমুখী সম্ভাবনা নিহিত আছে। এই সব সম্ভাবনার বাস্তবীকরণের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি বারবার নিজেকে সৃষ্টি করে। এর পথে ভিতর-বার মিলিয়ে বাধা অনেক। ব্যক্তির চারধারে পরিবেশ লক্ষণের গণ্ডী টেনে দিয়েছে—গণ্ডী লঙ্ঘন করলেই সতীত্ব লোপের ঘোর আশঙ্কা। ভিতর থেকেও নিষেধ কি কম—আলস্য, ভয়, মোহ, নিয়ম-নিষ্ঠা, সংস্কারের উত্তরাধিকার মনকে পিছুটানে টেনে রেখেছে। এই গণ্ডী ভেঙে, সেই পিছুটান কাটিয়ে তবু যে মানুষ নবনব পরীক্ষা নিরীক্ষায় আপনাকে বিচিত্ররূপে বিকশিত করতে পারল তার কারণ মুক্তির কামনা এবং সত্যানুসন্ধিৎসা মানুষের সত্তায় একান্তই ওতঃপ্রোত। ব্যক্তি তার জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্তকেই নিত্য এবং চরম বলে মেনে নিতে পারে না। যারা মেনে নেয় বা মেনে নেবার চেষ্টা করে তারা ধীরে ধীরে আপনাদের মনুষ্যত্ব খুইয়ে ফেলে। যা-আছে তাকেই শেষ কথা বলে মেনে না নিয়ে তা থেকে ঐশ্বর্যবান যা-হতে-পারে তারই রূপায়ণের

মধ্যে ব্যক্তির মুক্তি। বাস্তব থেকে সম্ভবে পৌঁছানর যে আকুতি তা থেকে রোমান্টিক মেজাজের উদ্ভব। অর্থাৎ রোমান্টিকতা মানুষের স্বধর্ম।

কিন্তু এই যে যা-হতে পারে, যা সম্ভব, যার রূপায়ণের মধ্যে সত্তার মুক্তি, তাকে জানবার, তাতে পৌঁছবার উপায় কি? উপায় বুদ্ধি, সত্যসন্ধিৎসা, জ্ঞান। মুক্তির অভীপ্সা আশ্রয় পায় সত্যের অনুসন্ধানে এবং এই সত্যানুসন্ধিৎসাই ক্লাসিকতন্ত্রের আত্মা।

মুক্তি এবং যুক্তি, বিকাশ এবং জ্ঞান যে নিতান্ত অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরনির্ভর, সামান্য বিচার করলে তা চোখে পড়ে। যে অন্তর্নিহিত নিত্যসত্তার সম্পদে ব্যক্তি একাধারে স্বকীয়তা এবং বিশ্বমানবত্বে বিত্তবান সাময়িক প্রকাশের সামান্যতায় সে সম্পদ অনেক সময়েই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সাময়িক রূপের প্রতি মোহ ব্যক্তির বিকাশের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। যুক্তি বা সত্যানুসন্ধিৎসা মনকে এই মোহ থেকে মুক্ত করে তার নিত্যসত্তা বিষয়ে সচেতন করে তোলে। এই চেতনা দুর্বল বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে ব্যক্তির ভিতরে মুক্তির তাগিদ স্তিমিত হয়ে আসে। ব্যক্তি তখন যা-আছে তাতেই তৃপ্তি বোধ করে। তার রুচি শুধু পুনরাবৃত্তিতে আরাম পায়। যে নাচিকেত অভিপ্সা মানুষের স্বধর্ম, তাঁকে অতি সযত্নে পরিহার করে মানুষ তখন তামসিক জাড্যে আশ্রয় খোঁজে। বন্ধ্যা আত্মতৃপ্তির মেদভারে সত্তার বিকাশ তখন স্তব্ধ, প্রাণ তখন আর প্রকাশের আক্ষেপে নবনবরূপে স্ফুরিত হয় না, মুক্তির নির্দিগন্ত স্বপ্ন অবসিত হয় আয়েসী অভ্যাসের বিজৃম্ভণে।

মানুষের এই আত্মহত্যা থেকে তাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র সত্যনিষ্ঠা। সত্য নির্মোহ আর সত্যানুসন্ধানের কোন সমাপ্তি নেই। কোন প্রাপ্তিতে পৌঁছে সে বলে না: এই যথেষ্ট, অতঃপর জিজ্ঞাসা অর্থহীন। তার কঠিন নির্দেশ: নেতি, নেতি। যত দিন না জরা নামে, যতদিন না মৃত্যু ঘটে, ততদিন খোঁজার অবসান নেই আর ফুটে ওঠারও শেষ নেই। পদ্ম ত' শতদল, কিন্তু আত্মার পাপড়ি সংখ্যাহীন। একটি পাপড়ি, একটি প্রাপ্তি, একটি রূপের মধ্যেই সত্তার উন্মোচন যাতে স্তব্ধ না হয়ে যায়, একটি ভঙ্গির রেখাতেই যাতে প্রাণের স্ফূর্তি অবসিত না হয়, একটি প্রত্যয়ের যাদুতেই যাতে সব জিজ্ঞাসার সংবেশন না ঘটে, তারি জন্যে কোজাগরী পাহারায় বসেছে মানুষের সত্যাগ্রহ।

জিজ্ঞাসার শিখা নিভলে প্রকাশের আলোও মুছে যাবে। সত্যের অনুসন্ধানে সত্তার মুক্তি।[২]

নিত্যসত্তা কথাটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করি। নিত্য কথাটি এখানে অজর, অমর, স্থানকালপাত্রোত্তীর্ণ কোন ব্রহ্মত্বের সংজ্ঞা হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। আমি যে নিত্যের কথা বলছি তা নিতান্তই দেহাশ্রয়ী, স্থানকাল-পাত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট, প্রাকৃতিক পরিবর্তনধর্মের অধীন। অর্থাৎ তার নিত্যতা আপেক্ষিক। ব্যক্তির দেহই তার সত্তা। দেহ তাকে জগৎ থেকে পৃথক করে এবং দেহই তাকে জগতের সঙ্গে যুক্ত করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ত ক্ষয়সৃষ্টিশীল দেহই ব্যক্তির অস্তিত্বগত ঐক্যের একমাত্র অবলম্বন। ব্যক্তির জীবনে অসংখ্য সময়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ঐক্য তাকে ব্যক্তিসংজ্ঞার অধিকারী করে, যে ঐক্যের নিয়মে তার বিচিত্র বহুবাচনিক আকাঙ্ক্ষা অভীপ্সারাশি সৌষম্যের সন্ধানী হয়, যার উপস্থিতির ফলে ব্যক্তি একাধারে অন্যান্য ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র এবং অন্যসব ব্যক্তির সঙ্গে একই মনুষ্যত্বের অংশভাক্ —ব্যক্তি-অস্তিত্বের সেই নিগূঢ় ঐক্যকেই আমি তার নিত্যসত্তা বলে অভিহিত করেছি। এই সত্তা বিশ্বপ্রকৃতির অংশ এবং প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করা তারও অসাধ্য। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মকে মেনে নিয়ে, তারই উপাদান-সম্পদকে আশ্রয় করে, সেই উপাদানের উপরে নিজের অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট ঐক্যের স্বাক্ষর রাখা এ সত্তার সামর্থ্যাধীন। সেই স্বাক্ষরের প্রকাশ মানুষের সমাজ-সভ্যতা, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-প্রতিষ্ঠান।

সত্যজিজ্ঞাসা একদিকে যেমন ব্যক্তির জীবনে তার স্বকীয় নিত্যসত্তার চেতনা আনে অন্যদিকে তেমনি বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে তার জ্ঞানকে ক্রমশঃই অধিকতর ব্যাপক, গভীর এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে। ব্যক্তিসত্তা এবং বিশ্বপ্রকৃতির এই জ্ঞানগত সংযোগ থেকে রূপের উদ্ভব। প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল, তাই তা নিরূপ, নিঃসীম। অপর পক্ষে প্রকৃতির উপাদান অভাবে চেতনাও নিরাকার, নিরলম্ব। চেতনাধর্মী সত্তা এবং প্রকৃতির সঙ্গমে রূপ এবং অর্থের জন্ম। রূপ এবং অর্থকে আশ্রয় করে সত্তা প্রকাশ লাভ করে এই প্রকাশের ভিতরেই ব্যক্তির মুক্তি এবং যে-রূপ অবলম্বন করে প্রকাশ সম্ভব হয় তা সত্য-সন্ধিৎসার ফসল।

২। প্রবন্ধের শেষে দ্বিতীয় টীকা।

। তিন ।

ইতিপূর্বে বলেছি ব্যক্তির নিত্যসত্তায় একাধারে তার প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্য এবং তার বিশ্বমানবতা আবৃত হয়েছে। একদিকে প্রতি মানুষই যেমন অন্যসব মানুষ থেকে স্বতন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি মানুষই শেষ পর্যন্ত মানুষ। স্থানকাল-পাত্রগত পার্থক্য সত্ত্বেও সব যুগের সব দেশের মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যধর্মের ঐক্য আছে সেটিই ব্যক্তির বিশ্বমানবতা। এই বিশ্বমানবত্ববোধ জাগ্রত না হলে ব্যক্তির স্বকীয়তা যথার্থ বিকাশ পায় না। ব্যক্তি যখনই স্বাতন্ত্র্য চর্চার নামে নিজের চারপাশে অভ্যাসের সঙ্কীর্ণ প্রাচীর খাড়া করে তখনই তার মুক্তির সম্ভাবনা সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। কারণ মানবীয় ঐক্যবোধের দ্বারা আমরা সব দেশকালের অন্তর্গত নরনারীর অমেয় সম্ভাবনা-সম্পদকে আমাদের আপন আপন ব্যক্তিসত্তার অঙ্গীভূত করতে পারি। কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে আমার সত্তার রূপময় উন্মোচন যে স্তরে বর্তমান তা থেকে সম্পন্নতর উন্মোচনে উত্তীর্ণ হওয়াতেই আমার সত্তার মুক্তি। এ সমৃদ্ধি তখনই ঘটে যখন আমি আমার থেকে স্বতন্ত্র অথচ মনুষ্যধর্মে আমার সরিক অন্য মানুষদের সম্ভাবনা বৈচিত্র্যকে আমার প্রাতিস্বিক ঐক্যে আত্মস্থ করতে সক্ষম হই। যে মানুষের মনে আপনার নিত্যসত্তা বিষয়ে বোধ যথেষ্ট জাগ্রত হয় নি, বিশ্বমানবতার প্রস্তাবে সে মানুষ স্বভাবতই সন্ত্রস্ত বোধ করে। কিন্তু যে গুণী স্বকীয় সাত্ত্বিক ঐক্যে প্রত্যয় অর্জন করেছেন, বসুধার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন তাঁর সহজ ধর্ম। ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠি, সম্প্রদায়, জাতি বা নির্দিষ্ট স্থানকালের সঙ্কীর্ণ পরিধির ভিতরে সে মানুষ নিজের বিকাশকে সঙ্কুচিত করতে নারাজ। স্বকীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠ বলেই সর্বজনীনে তাঁর আনন্দ।

সত্যসন্ধিৎসা যেমন স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা থেকে বিশ্বমানবত্বে ব্যক্তির উত্তরণ ঘটায়, তেমনি তার আভ্যন্তরীন বহুমুখীনতায় ঐক্যের সঞ্চার করে। বিকাশের পথে এ ঐক্য নিতান্ত আবশ্যিক। আমাদের দেহ-মন নিয়তই নানা আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনার আঘাতে উৎক্ষিপ্ত। তার একটিকে প্রাধান্য দিলে অন্যগুলি পীড়া দিতে থাকে। তাদের প্রত্যেকের নির্দেশ ভিন্নভিন্নমুখী। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য না আনতে পারলে সত্তার বিকাশ অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ বিকাশের একটি অন্তর্নিহিত নির্দিষ্ট ঐক্য থাকে—লক্ষ্যহীন ঘটনাস্রোত নিরর্থ পরিবর্তন মাত্র। এই আত্মবিরোধী বহুমুখীনতার মধ্যে ব্যক্তির নিত্যসত্তাবোধ সুসামঞ্জস্য এবং বিকাশধর্মের প্রতিষ্ঠা

ঘটায়। নিত্যসত্তার কষ্টিপাথরে যাচাই করে ব্যক্তি বুঝতে পারে বিভিন্ন অনুভূতি এবং বাসনার ভিতরে কোনটি প্রধান এবং কোনটি অপ্রধান, কোনটি সামগ্রিক বিকাশে অপরিহার্য এবং কোনটি বিকাশের পথে বাধা। এই বিচারের সূত্রে ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্টের নীতিনিয়মগুলির উদ্ভব। যা ব্যক্তির নিত্যসত্তার বিকাশে সাহায্য করে তাই শ্রেয়, যা সে বিকাশ প্রতিহত করে তাই অপকৃষ্ট। যে কামনা বা আবেগ সত্তার অন্তঃস্তল থেকে উৎসরিত তার নিরোধে বা অস্বীকারে ব্যক্তির কল্যাণ নেই। সে নিরোধের ফলে যদিবা সাময়িক ঐক্য আসে, সে ঐক্যে ব্যক্তির স্ফূর্তি ঘটে না। ঐক্যহীন বিকাশ অসম্ভব, কিন্তু মূল কোন মানবীয় বৃত্তিকে দমন করে যে ঐক্য তা বিকাশবিরোধী এবং সে হেতু নিষ্ফলা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সত্যসন্ধিৎসা ব্যক্তির জীবনে নিত্যসত্তার চেতনা আনে, বিশ্বমানবতা-বোধ জাগিয়ে তোলে, প্রকৃতির সঙ্গে মনের সাযুজ্য ঘটিয়ে নবনব রূপের সন্ধান দেয় এবং ব্যক্তি-অস্তিত্বের বহুবাচনিকতার ভিতরে সার্থক সঙ্গতির প্রতিষ্ঠা করে। সত্যসন্ধানের আশ্রয় বুদ্ধি, তার ফসল জ্ঞান, তার নাচিকেত ধর্মে ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের সার্থক মিলন। অন্বেষণ অমিত, আত্মোদ্ঘাটনেরও শেষ নেই—তাই এ সাধনা রোমান্টিক। অপরপক্ষে যুক্তির নির্দেশ অমোঘ এবং তার অনুশীলনে সত্তা সংস্কৃত হয়—তাই তার মার্গ খাশ ক্লাসিক। অর্থাৎ ব্যক্তির বিকাশধর্মে যুক্তি এবং মুক্তি, রূপ এবং প্রকাশ ক্লাসিক ও রোমান্টিক এক গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়েছে। বিরোধের পরিণতি ঘটেছে মিলনে। বিভেদ আশ্রয় পেয়েছে ব্যঞ্জিত সমন্বয়ে।

॥ চার ॥

কিন্তু মিলন ঘটে বলে এদের বিরোধ কাল্পনিক নয়। বরং বাস্তব ইতিহাসে মিলনের তুলনায় বিরোধের প্রাবল্যই বেশী চোখে পড়ে। কারণ সমঞ্জসার প্রয়োজন আমাদের জীবনে যত বেশী, সমঞ্জসায় পৌঁছনো আমাদের পক্ষে ততই কঠিন। ব্যক্তির জীবনে এবং সমাজের ইতিহাসে কখনো-বা রোমান্টিক উদ্বেগ কখনো-বা ক্লাসিক সংযম প্রবলতর হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য কোন সময়েই একটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে অন্যটি টিকতে পারে না। কিন্তু রোমান্টিক আতিশয্যের প্রতিক্রিয়ায় উগ্র ক্লাসিক এবং উগ্র ক্লাসিকের প্রতিক্রিয়ায় উগ্রতর

রোমান্টিক—সভ্যতার ইতিহাসে এ ত হামেশাই দেখা যায়। সফিষ্টদের প্রাতিস্বিক বহুবাচনিকতার বিরুদ্ধে প্লেটোর রূপনির্যাসতত্ত্ব, স্কলাষ্টিক ব্রহ্মব্যাখ্যানের বিরুদ্ধে রনেসাঁসের ব্যক্তিবিকাশ সাধনা, সতের শতকের নৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় অনবস্থার প্রতিক্রিয়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানাশ্রয়ী যুক্তিবাদ এবং সেই যুক্তিবাদী একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে সমানভাবে একদেশদর্শী রোমান্টিক বিদ্রোহ—পশ্চিমী সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁর কিছু পরিচয় আছে তিনি এজাতীয় বহু ঘটনার উল্লেখ করতে পারবেন।

অবশ্য এ ঘটনাপ্রবাহের পশ্চাতে আরেকটি সত্য নিহিত আছে। এটি অনেক সময়েই পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকদের চোখ এড়িয়ে যায়। সত্যটি হল এই যে, এ-সমস্ত বিরোধ এবং প্রতিক্রিয়ার অন্তরালে একটি সুগভীর ধারাবাহিকতা বর্তমান। তার কারণ উগ্র ক্লাসিকের মধ্যেও রোমান্টিক ধারা কখনো সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয় নি এবং চরম রোমান্টিককেও নিজের অজ্ঞাতে ক্লাসিক ঐতিহ্য আত্মস্থ করতে হয়েছে। প্লেটোর দর্শনে, বৈজান্তিয় এবং রোমক গীতিকবিতায়, উচ্চেলো কি পিএরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্কার ছবিতে, রাসিনের নাটকে সুস্পষ্ট সচেতন ক্লাসিক সাধনার অন্তরালে রোমান্টিকতার প্রচ্ছন্ন গভীর ধারা অস্বীকৃত হয়েও অনস্বীকার্য ভাবে বিদ্যমান। অপরপক্ষে কি সফিষ্টদের চিন্তায়, কি রনেসাঁসী সাধনায়, কি রোমান্টিক আন্দোলনে ক্লাসিকতন্ত্রের ঐতিহ্য সিংহাসনচ্যুত হয়েও সংগোপনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রমাণ প্রোটাগোরসের দর্শন, আলবর্তির জীবনচরিত, শেক্‌সপীয়রের পরিণতকালের নাটক, ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ, বায়রণ, শেলীর কবিতা।

অবশ্য এ ধারাবাহিকতা সব সময়ে পুরোপুরি বজায় থাকে নি। ধারাবাহিকতায় ছেদ আনার জন্য উভয় মেজাজের চরমপন্থীরাই বারবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ চেষ্টার পরিসমাপ্তি সহজেই অনুমেয়। রোমান্টিককে সম্পূর্ণ বর্জন করে যে-ক্লাসিক তা নিতান্ত নিষ্প্রাণ; ক্লাসিককে বরবাদ করে যে-রোমান্টিকতা তা অপেরণ-চিহ্নিত, স্বকামী, নির্জ্ঞাননির্ভর। ইয়োরোপে মধ্যযুগে এজাতীয় বিশুদ্ধ ক্লাসিকতন্ত্রের চর্চা কিছুকাল ব্যাপকভাবে চলেছিল। তার ফলে শিল্পসাহিত্যে, সমাজজীবনে, দর্শনচিন্তায় দেখা দিয়েছিল জাড্য এবং পুনরাবৃত্তির বন্ধ্যা যুগ। বর্তমান শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সুর্‌রেয়লিস্ট্‌রা কিছুকাল মরীয়া হয়ে বিশুদ্ধ রোমান্টিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় কোমর বেঁধেছিলেন। ব্যক্তির পূর্ণমুক্তির নামে তাঁরা যে সব অসংলগ্ন অদ্ভুত-কিম্ভূতের প্রদর্শনী

খুলেছিলেন, তাতে অবশ্যই অভিনবত্ব ছিল, কিন্তু সার্থকতা বা বিকাশব্যঞ্জনার আভাস ছিল খুব কম। অভ্যস্ত রীতিনীতি রূপপ্রকরণের বেড়াভাঙায় এ আন্দোলন কিছু সাহায্য করেছে। কিন্তু একদা-সুরেয়্যলিস্ট্‌দের মধ্যে যে কজন শিল্পী সৃষ্টিক্ষমতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের ভিতরে সম্ভবত সাল্‌ভাদর দালি ছাড়া আর একজনও এই উগ্ররোমান্টিকতায় স্বকীয় সৃজনধর্মের নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজে পান নি। আপন আপন বিকাশের প্রয়োজনে নানাপথে তাঁদের সঙ্গতির সন্ধান করতে হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

সুতরাং ক্লাসিক এবং রোমান্টিক পরস্পর থেকে বিভিন্ন, এমন কি পরস্পর বিপরীত হয়েও একে অন্যের সহযোগ ছাড়া সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। রূপের সীমাছাড়া প্রকাশ অসম্ভব, আর প্রকাশের আকুতিহীন রূপ নিষ্প্রাণ। তবে দুই-এ মিলে এক হয় বলেই দুটি এক নয়। কারো জীবনশিল্পে-বা রূপ মুখ্য, প্রকাশ গৌণ; কারো-বা প্রকাশের আকুতিই মূল প্রেরণা, রূপের আশ্রয় বিধেয় মাত্র। দু-এর তুল্যমূল্য সঙ্গতি মানবতন্ত্রের সাধনা। সারা বিশ্বজগৎকে ব্যক্তির সত্তায় অনুভব করে সেই মহৎ ঐক্যে প্রাতিস্বিকের সার্থক প্রকাশ ঘটলে তবেই এ সাধনার পূর্ণতা। যেহেতু এ পূর্ণতা চিরদিন আমাদের অনায়ত্ত, সে কারণে এ সাধনাও চিরকাল ক্লান্তিহীন। স্থানকালপাত্রের বিভেদে এ দ্বৈত বারবার নবনব সঙ্গতি লাভ করবে—তার কোনোটি-বা অন্যটির তুলনায় সমৃদ্ধতর—কিন্তু কোন সঙ্গতিই চরম নয়। এই জগৎ এক দিকে যেমন বিরাট অন্যদিকে তেমনি নিয়তপরিবর্তনশীল। মানুষের জিজ্ঞাসা নিঃসীম এবং তার বিকাশ অনন্ত। সুতরাং যতদিন না মানুষজাতি অথবা মনুষ্যধর্ম এ জগৎ থেকে লোপ পাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের মধ্যে সাযুজ্য-সাধনা অসমাপ্য প্রয়াসরূপে নিয়ত বিদ্যমান থাকবে।

মানব সংস্কৃতির প্রথম অধ্যায় থেকেই এ সাধনার শুরু। ভিন্নভিন্ন দেশকালে যখনি কোনো ব্যক্তি এই সংগতির কোনো একটি সম্ভাব্য মার্গের সন্ধান এনেছেন, তখনি মানব সমাজ মনুষ্যত্ব-বিকাশের ইতিহাসে এক ধাপ এগিয়ে গেছে। ব্যক্তির একক অথবা ব্যক্তিদের মিলিত প্রয়াসে অর্জিত সে

সঙ্গতি কালক্রমে সমাজ-ঐতিহ্যে ওতঃপ্রোত হয়ে সামাজিক রীতিনীতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, সংস্কার-ব্যবহারে ব্যাপক এবং বহুমুখী রূপ পরিগ্রহ করে। এইসব বিচিত্র রূপের কোনটিই পরিপূর্ণ নয়, প্রত্যেকটিই মহত্তর সঙ্গতির নির্দেশবাহী। নানা দেশে নানা কালে নানা মানুষের অর্জিত এই সব সার্থক সমন্বয় ব্যক্তিমাত্রেরই বিশ্বমানবীয় উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকারেই আমাদের অক্ষয় ঐতিহ্যের যথার্থ সন্ধান মিলবে, আর মিলবে ব্যক্তির সর্বকালীন সাধনার অমোঘ ইঙ্গিত।

১। রূপতত্ত্ব এবং প্রতিমা সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষ করে উল্লেখ্য: মৎস্য এবং অগ্নি পুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর বৃহৎসংহিতা, শুক্রনীতিসার, মানসার এবং সমরাঙ্গন-সূত্রধার। ইংরেজিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আনন্দ কুমারস্বামী (যেমন *The Transformation of Nature in Art*), মূলক্ রাজ আনন্দ (*The Hindu view of Art*) প্রভৃতি।

২। সত্যের অনুসন্ধান এবং ব্যক্তির মুক্তি কিভাবে পরস্পরে জড়িত এ সম্পর্কে বিশদ-বিচার করেছি শ্রীযুক্তা এলেন রায়ের সঙ্গে সহযোগিতায় লেখা *In Man's own Image* গ্রন্থে।

রনেসাঁস সম্পর্কে প্রস্তাবনা

উনিশ শতক জুড়ে এদেশের মানস জগতে যে বিচিত্র আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তার নামকরণ হয়েছে ভারতীয় রনেসাঁস। সম্প্রতিকালে এই যুগের একটি মোটামুটি রকমের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত মহাকায় ভারতীয় ইতিহাসের দশমখণ্ডে (*The History and Culture of the Indian People, Vol, 10, British Paramountcy and Indian Renaissance, Part 2*)। তাছাড়া এই যুগের বিভিন্ন দিক নিয়ে ডেভিড কফ্, চার্লস হাইম্‌সাথ, বি. বি. মিশ্র, অনিল শীল, রবীন্দ্রকুমার প্রমুখ দেশী বিদেশী ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষাতেও এ সম্পর্কে কম লেখা হয়নি, বা হচ্ছেনা। এই শতকের গোড়ায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে যে আখ্যায়িকা রচনা করেন তারপরে সে সম্পর্কে প্রচুর নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে—এ ব্যাপারে মন্মথনাথ ঘোষ, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, যোগেশচন্দ্র বাগল, বিনয় ঘোষ, প্রমুখ পণ্ডিতদের কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই ক্ষীণ হোক অন্তত বাংলাদেশের উনিশ শতকী উজ্জীবনের কাহিনী আজ আর শিক্ষিত সাধারণের কাছে অপরিচিত নয়।

কিন্তু রনেসাঁস শব্দটি পশ্চিমের ইতিহাস থেকে পাওয়া, অথচ সে ইতিহাস নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ এদেশে এখনো পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে স্বচ্ছ হয়নি। আমাদের ঐতিহাসিকরা শব্দটি ধার নিয়ে এদেশের একটি বিশেষ যুগের বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন। পশ্চিমে রনেসাঁস কিভাবে ঘটেছিল, কি তার তাৎপর্য, আমাদের দেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে তার যোগসূত্র কোথায় এবং কতখানি, এসব নিয়ে বিস্তারিত বিচার বিতর্কের প্রয়োজন আছে। এই প্রবন্ধটি তারি প্রস্তাবনা মাত্র।* কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার জন্য প্রবন্ধশেষে কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থেরও উল্লেখ করা গেল।

---

* এই প্রবন্ধটির প্রথম খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রদ্ধাভাজন অন্নদাশঙ্কর রায় রনেসাঁস সম্পর্কে আমাকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। সেই চিঠিটির প্রধান অংশ "উত্তরা" পত্রিকায় (১৩৮৩, আষাঢ়) প্রকাশিত হয়।

॥ এক ॥

প্রাচীন আথেন্সে মননশীলতার যে নৈসর্গিক প্রস্ফুরণ দেখা গিয়েছিল গ্রীকসভ্যতার পতনের পর তার উত্তরাধিকার রোমানদের উপরে বর্তায়। রোমানরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু যোগ না করলেও গ্রীকসভ্যতার ঐতিহ্যকে অনেকটা বাঁচিয়ে রেখেছিল। রোমান সাম্রাজ্য অতিস্ফীতির চাপে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে তা পুবের এবং পশ্চিমের সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়; এবং পঞ্চম শতাব্দীর সূচনায় (৪১০ খৃঃ) বর্বর ভিসিগথদের দ্বারা রোম লুন্ঠিত হওয়ার পর পশ্চিমের সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙে পড়ে। ৪৭৬ খৃস্টাব্দে শেষ রোমান সম্রাটের সিংহাসন চ্যুতির পর পশ্চিম ইয়োরোপে উক্ত সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে হুন, জার্মান, হাঙ্গেরিয়ান এবং ভাইকিং দস্যুদের পর্যায়ক্রমে আক্রমণের ফলে ইয়োরোপ থেকে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন প্রায় মুছে যায়। (J. B. Bury, *The Invasion of Europe by the Barbarians*)।

বাইরের দিক থেকে বর্বর জাতিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অসামর্থ্য যেমন রোমান সভ্যতার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ, মনের দিক থেকে এই পতনের মূল সূত্র হল ক্রিশ্চিয়ানিটির আক্রমণের বিরুদ্ধে হেলেনিক জীবনবোধকে টিকিয়ে রাখার অক্ষমতা। চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ায় (৩১৩ খৃঃ) কনস্টানটাইন খৃস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং তারপর রাষ্ট্রশক্তির সমর্থনে এই ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। হেলেনিক জীবনাদর্শ যুক্তিকে জ্ঞানের উৎস এবং নিয়ামক বলে গ্রহণ করেছিল। মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ছিল তার আদর্শ। খৃস্টধর্ম যুক্তিকে বর্জন করে বাইবেলের নির্দেশকে বিচারোর্ধ্ব সত্য রূপে খাড়া করে; মানুষের অস্তিত্বের মূলে পাপ কল্পনা করে বিকাশের পরিবর্তে আত্মনিগ্রহকে নৈতিকতার মাপকাঠি করে তোলে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনকালে এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান প্রবক্তা রূপে দেখা দেন সেন্ট অগস্টিন (৩৫৪-৪৩০ খৃঃ)। উক্ত সন্ত পুরুষের মত অনুসারে যুক্তি ধর্মশাস্ত্রের আজ্ঞাবহ মাত্র; মানুষ মাত্রেই আদমের পতনসূত্রে পাপগ্রস্ত জীব এবং সে কারণে তাদের অনন্ত নরকযন্ত্রণার শাস্তি ন্যায়সঙ্গত; কোনবিধ প্রচেষ্টার দ্বারাই এই অবস্থা থেকে উদ্ধারলাভ

অসম্ভব, একমাত্র ঈশ্বরের করুণার ফলে কোনো কোনো ভাগ্যবান পুরুষ স্বর্গে স্থান পায়। কেন ঈশ্বর কিছু ব্যক্তিকে করুণা করেন আর বাকী মানুষকে নরকে নির্বাসন দেন, তার ব্যাখ্যা অসম্ভব। মানুষের কর্তব্য হোল ধৈর্য সহকারে ঈশ্বরের বিধান মেনে নেওয়া। (St. Augustine, *The City of God*)।

অগষ্টিনের অক্লান্ত প্রচারের ফলে চার্চের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। ঐতিহাসিক গিবন রোমান যুগে খৃস্টধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণের পাঁচটি প্রধান কারণ উল্লেখ করেছেন। ইহুদীদের সূত্রে খৃস্টানরা এমন এক অদম্য এবং অসহিষ্ণু মতবাদগত নিশ্চয়তা অর্জন করেছিল যার আঘাতের সামনে বিদগ্ধজনের জিজ্ঞাসু সহনশীলতা নিতান্ত অসহায় বোধ করে। তাছাড়া অমরত্ব এবং স্বর্গের কল্পনা নানাভাবে জনসাধারণকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে। আবার চার্চের অলৌকিক ক্ষমতার দাবী এবং প্রথম যুগের খৃস্টানদের নৈতিক নিষ্ঠাও অনেককে অভিভূত করেছিল। তবে খৃস্টধর্মীদের দ্রুত-প্রতিপত্তি বাড়ার সব চাইতে বড় কারণ হল চার্চের আভ্যন্তরীণ সংগঠন এবং শৃঙ্খলা। (Gibbon, *The Decline and Fall of the Roman Empire*, Ch. XV)।

চতুর্থ শতাব্দীতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণার সুযোগে খৃষ্টীয় প্রচারক সম্প্রদায় দ্রুতভাবে শক্তি এবং বিত্ত অর্জন করেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথমে সেন্ট বেনেডিক্ট (৪৮০—৫৪৩) এবং তারপরে পোপ প্রথম গ্রেগরির চেষ্টায় চার্চ সংগঠনে সুদৃঢ় শৃঙ্খলা এবং কঠোর নিয়মানুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে ইয়োরোপের অধিকাংশ বর্বর জাতির শাসক সম্প্রদায় মিশনারীদের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। এইভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইয়োরোপে ক্রিশ্চান চার্চ ক্রমে সংগঠিত ক্ষমতার প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। সম্রাট কনস্টানটাইনের নামে এক জাল দানপত্র বানিয়ে চার্চ দাবী করে যে উক্ত সম্রাট নাকি পশ্চিম ইয়োরোপে পোপের একচ্ছত্র ক্ষমতা চিরকালের মত স্বীকার করে গেছেন। পরবর্তী পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে চার্চের অর্থবিত্ত এবং প্রভাব প্রাক্তন রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইয়োরোপীয় ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ এই মারাত্মক প্রভাবের ফল। একদিকে ধর্মান্ধতার ফলে ইয়োরোপ থেকে জ্ঞানের চর্চা প্রায় একরকম লোপ পায়; জিজ্ঞাসার পরিবর্তে চার্চের নির্দেশ অনুযায়ী টীকা ভাষ্য রচনাই

পণ্ডিত সম্প্রদায়ের একমাত্র পেশা হয়ে ওঠে। অপরদিকে আত্মনিগ্রহকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ফলে জীবনযাত্রার মান ক্রমেই নীচের দিকে নামতে থাকে। ব্যক্তির বিকাশে এবং প্রকাশে অনীহার ফলে কি আর্থিক-সামাজিক আর কি সাংস্কৃতিক জীবন কোথাও কোন বিবর্ধনের প্রয়াস চোখে পড়ে না। ব্যাধি, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভয় এবং জড়তা সমস্ত ইয়োরোপকে আচ্ছন্ন করে।

এই অধঃপতন থেকে উদ্ধারের সহজ উপায় ছিল হেলেনিক ঐতিহ্যের সম্পদে মনকে নবোদ্যমে পুষ্ট করা। কিন্তু রোমান সভ্যতার পতনের পর ইয়োরোপ থেকে গ্রীক ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চা প্রায় উঠে যায়। অপরদিকে পূর্ব সাম্রাজ্যের সবচাইতে উদ্যোগী এবং শক্তিশালী সম্রাট যষ্টিনিয়ানের আদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে আথেন্সের বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং ফলে সেখানকার গ্রীক মনীষীরা দেশত্যাগী হয়ে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া পারস্য প্রভৃতি দেশে গিয়ে বসবাস করেন। পশ্চিম থেকে গ্রীক ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে ক্রমে আরবদের মধ্যে আশ্রয় নেয়। ইয়োরোপে যখন ঘোর তমিস্রার যুগ তখন আরবরা জ্ঞানের আলোককে রক্ষা করেছিল। (Baynes, *The Byzantine Empire*)।

এগারো শতকের মধ্যভাগ থেকে এই অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্যবসায়ী এবং কারিগরদের ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করে এই সময় থেকে আবার ধীরে ধীরে কৃষিনির্ভর ইয়োরোপে একটি একটি করে শহর গড়ে উঠতে থাকে এবং তাদের সূত্রে পশ্চিমের অনড় সমাজে কিছু গতি সঞ্চারিত হয়। অন্যদিকে আরব সভ্যতার সঙ্গে সংঘাতের ফলে খৃস্টধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্যে চিড় ধরে এবং পশ্চিমী ভাবুকদের মনে জ্ঞানের পিপাসা আবার জেগে উঠতে সুরু করে। আমরা আগেই বলেছি যে ইয়োরোপের পতনের যুগে আরবরা জ্ঞানের চর্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তারা শুধু জ্ঞানের ভাণ্ডারে নূতন সম্পদ যোগ করে নি; প্রাচীন হিন্দু এবং বিশেষ করে প্রাচীন হেলেনিক সংস্কৃতির বহু অবদান তারা সযত্নে রক্ষা করেছিল। মধ্যযুগের শেষভাগে ইয়োরোপ যে বিস্মৃত গ্রীক ঐতিহ্যের দ্বারা আবার নূতন করে প্রভাবিত হতে সুরু করে, তার প্রধান কৃতিত্ব আরবদের। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব এবং ইয়োরোপের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। হিটি সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে প্রচুর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন

যে ইয়োরোপের মানসিক উজ্জীবনে আরব সভ্যতার দান অপরিসীম। দর্শন, ইতিহাস, গণিত জ্যোতির্বিজ্ঞান, শরীরবৃত্ত ও চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন-কানুন এবং নগরসংগঠন, তুলনামূলক ধর্মবিচার এবং ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য—প্রতি ক্ষেত্রেই আরবদের উৎকর্ষ সমকালীন ইয়োরোপের তামসিকতাকে আঘাত করে। আল্-রাজি (যাঁর রসায়ন এবং চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক দুটি গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে এই দুই বিষয়ে জ্ঞানের প্রধান উৎস বলে পরিগণিত হত), আলি ইব্‌ন্-হাজ্‌ম্ (হিট্টি যাঁকে বলেছেন "the first scholar in the field of comparative religion"), ইব্‌ন্-সিনা বা আভিসেনা (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকের মধ্যে যাঁর বিশ্বকোষের পনেরটি লাতিন সংস্করণ প্রকাশিত হয়), আল্-কিন্দি, আল্-খোয়ারিজ্‌মি, ইব্‌ন্-রুশ্‌দ্ বা আভেরোয়েস (যাঁর রচনার মারফৎ আরিস্টটলের দর্শন ইয়োরোপে প্রভাব বিস্তার করে), ইব্‌ন্-আল্-আওয়াম্, ইব্‌ন্-আল্-খাতিব এবং ইব্‌ন্-খালদুন প্রভৃতি মনীষীর নাম বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বস্তুত আরবরা ইয়োরোপে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (কোর্ডভা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা খালিফ তৃতীয় আব্‌দ্-আল্-রহ্‌মান এবং তাঁর পরবর্তী খালিফ আল্-হাকাম-কে ঐতিহাসিকরা এই কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন); তারি প্রভাবে অন্যান্য মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। হিট্টি তাই সঙ্গত কারণেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে আরবদের মাধ্যমে ইয়োরোপে দর্শন-বিজ্ঞানে ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। (Between the middle of the eighth and the beginning of the thirteenth centuries...the Arabic-speaking peoples were the main bearers of the torch of culture and civilization throughout the world, the medium through which ancient science and philosophy were recovered, supplemented and transmitted to make possible the renaissance of Western Europe...Kindled by contact with Arab thought and quickened by fresh acquaintance with ancient Greek lore, the interest of Europeans in scholarship and philosophy led them rapidly on to an independent intellectual life of their own, whose fruits we still enjoy," Philip K. Hitti, *The Arabs*)।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চার্চের আভ্যন্তরীণ জীবনেও নানা রকম সংস্কার সূচিত হয়। খৃস্টধর্ম দারিদ্র্য এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের মধ্যে পুণ্যের সন্ধান করেছিল। কিন্তু চার্চ কর্মচারীরা জনসাধারণকে উপরোক্ত আদর্শে দীক্ষিত করলেও নিজেদের প্রতিষ্ঠানিক ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরা একদিকে বিত্ত উপার্জনে এবং অন্যদিকে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। চার্চের বড় বড় পদ প্রকাশ্যভাবে কেনা-বেচা সুরু হয়; মোহান্তরা ব্রহ্মচর্যের শপথ নিয়ে গোপনে রক্ষিতাদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে। ফলে চার্চের প্রতি ভক্তদের আস্থায় ভাঙন ধরতে সুরু করে। তখন কিছু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধর্মীয় নেতা চার্চের সংস্কারের জন্য আন্দোলন সুরু করেন। একাদশ শতকে এই আন্দোলন প্রবল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাগিদে, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে চার্চের মধ্যে একদিকে যেমন নৈতিক সংস্কার সাধিত হয়, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন মনাস্টারিতে কিছু কিছু জ্ঞানের চর্চা সুরু হয়। এই চর্চার ফলে চার্চের পণ্ডিতরা বাইবেলের স্বয়ংসিদ্ধতা মেনে নিয়েও যুক্তির সাহায্যে তাঁদের ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠিত করায় উদ্যোগী হন। কিন্তু যুক্তির সঙ্গে বিচারোধ্বʼ বিশ্বাসকে মেলানো সহজ কাজ নয়। এ চেষ্টার ফলে প্রথম দিকে বিশ্বাসের ভিত্তিতেই চিড় ধরার আশঙ্কা দেখা দেয়। রসেলিন এবং তাঁর শিষ্য আবেলারের চিন্তাধারায় ধর্মবিশ্বাসের চাইতে যুক্তিশীলতা বেশী প্রবল। ফলে প্রথম ব্যক্তিকে ধর্মদ্রোহিতার নামে অভিযুক্ত করা হয়; তিনি ভয়ে ভয়ে নিজের "ভুল" স্বীকার করে প্রাণ বাঁচান। আবেলারের কাহিনী সকলেই জানেন। এলোয়াজ-এর সঙ্গে প্রণয়ের অভিযোগে তাঁর পুরুষাঙ্গ ছেদ করা হয়েছিল। কিন্তু এই চরম শাস্তিও তাঁকে নীরব করতে পারে নি। বাইবেলকে বিচারোধ্বʼ বলে মেনে নিয়েও তিনি ঘোষণা করেন যে ধর্মবিশ্বাসের বাইরে অন্য প্রস্তাব তর্কসাপেক্ষ। তাঁর *Sic et Non* নামে বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি দেখান যে প্রায় প্রত্যেক সাধারণ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সমান শক্তিশালী যুক্তি খাড়া করা যায়; ফলে কোনো সিদ্ধান্তকেই চরম মনে করা অসঙ্গত। এই ধরণের মতামত প্রচারের জন্য চার্চ কর্তৃপক্ষ দুবার তাঁর শাস্তি বিধান করেন। (Roger Lloyd, *Peter Abelard*)।

যা-ই হোক দ্বাদশ শতকে ইয়োরোপে খৃস্টধর্মের একচ্ছত্র প্রতিপত্তি নানা দিক থেকে ধাক্কা খায়। মনাস্টারিগুলিতে জ্ঞানের অল্পস্বল্প চর্চার ফলে অনেকের মনে শাস্ত্রীয় বচনের স্বতঃসিদ্ধতা বিষয়ে প্রশ্ন জেগে উঠতে থাকে। অপরদিকে চার্চ

প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক দুর্নীতি অনেক বিবেকবান ব্যক্তির মনে বিশুদ্ধতর ধর্মের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করে। ক্যাথারি, ওয়াল্ডো-পন্থী প্রমুখ খৃষ্টির ধর্মসম্প্রদায় ক্যাথলিকপ্রভাবমুক্ত আদিম খৃস্টধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। আবার এই সময়ে পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে বিরোধের ফলে চার্চ-বিরোধী শক্তিরা কিছু কিছু রাজসমর্থন পেতে থাকে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে এই বিরোধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক একজনের পর একজন পোপকে অগ্রাহ্য করে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল নিজের খুসী মত রাজত্ব করেন। শোনা যায় ফ্রেডরিক ছটি ভাষায় সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। তিনি আরব সভ্যতার অনুরাগী ছিলেন; এবং পোপের নির্দেশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করেন। ফলে বিনা ক্রুসেডে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তিনি জেরুসালেম-এর উপরে তাঁর রাজ্যাধিকার আরবদের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নেন। তিনি নেপল্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা; তাছাড়া রোমান আইনের অনুসরণে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের জন্য সুচিন্তিত আইনকানুনের প্রবর্তন করেন। কিংবদন্তী অনুসারে তাঁকে *De Tribus Impostoribus* নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলা হয়; এই গ্রন্থে নাকি মুশা, খৃষ্ট এবং মহম্মদকে তিন ভণ্ড বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক বিভিন্ন পোপ তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করে বারবার চার্চের আশ্রয় থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। (Kantorowicz, *Frederick the Second*)।

এই সব আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ত্রয়োদশ শতকে রোমান চার্চ বিশেষ উদ্যোগী হয়ে ওঠে। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট একদিকে বিবিধ ধর্মীয় নিয়ম প্রচলন করে চার্চ কর্তৃপক্ষের হাতে প্রভূত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন; অন্যদিকে তিনি হিংস্র উদ্যমের সঙ্গে ফ্রান্স থেকে ধর্মসংস্কারকামী খৃষ্টির সম্প্রদায় Albigenses-এর আমূল উচ্ছেদ ঘটান। ১২৩৩ খৃস্টাব্দে পোপ নবম গ্রেগরী ইনকুইজিশন-এর প্রতিষ্ঠা করেন। যে কোন ব্যক্তি, মত, অথবা আন্দোলনকে চার্চের একচ্ছত্র ক্ষমতার পরিপন্থী বলে কিছুমাত্র সন্দেহ করা যায় তাকেই নির্মমভাবে দমন করা এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। (H. C. Lea, *A History of the Inquisition, 3 vols.*)।

কিন্তু পোপদের এই চণ্ডনীতি সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক জীবনে চার্চের একচ্ছত্র প্রাধান্য হয়ত আরো দেড়শ দুশো বছর টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হত যদিনা গোঁড়া খৃস্টধর্মাবলম্বীদের ভিতর থেকে নূতন দুটি শক্তিশালী আন্দোলন দেখা দিত।

ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় আসিসির সন্ত ফ্রান্সিস নিজের জীবনে চার্চের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে করুণাবোধ, সেবাধর্ম এবং সৌন্দর্যচেতনার সমন্বয় ঘটালেন। তাঁর পরবর্তীকালের শিষ্যপ্রশিষ্যবৃন্দ তাঁর আদর্শ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে গেলেও ফ্রান্সিসের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব এবং জনপ্রিয়তা চার্চের প্রতিপত্তি বাড়াতে সাহায্য করে। তাঁর সমসাময়িক অপর ধর্মনেতা ডোমিনিক চার্চের নৈতিক উজ্জীবনের জন্য দারিদ্র্যবরণের উপরে জোর দেন। ফ্রান্সিস এবং ডোমিনিক নিজেরা লেখাপড়াকে বিশেষ মূল্য না দিলেও তাঁদের অনুবর্তীরা দর্শনের চর্চা এবং শিক্ষার প্রসারে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ডোমিনিকান এবং ফ্রান্সিস্কান মনাস্টারিগুলি ইয়োরোপে জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই কেন্দ্রগুলিতে মুখ্যত দুই ধরণের মনের ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়। প্রথম প্রকৃতির মনীষীরা বাইবেল এবং চার্চের নির্দেশাবলীকে চরম সত্য বলে মেনে নেওয়ার পর যুক্তির দ্বারা এই সব নির্দেশকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উদ্যোগী। এঁদের মধ্যে টমাস আক্যীনাস সঙ্গত কারণে সবচাইতে বিখ্যাত। তাঁর *Summa contra Gentiles* গ্রন্থের প্রথম তিন খণ্ডে তিনি মুখ্যত অরিস্টটলের দর্শনের ভিত্তিতে খৃস্টধর্মের যৌক্তিকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন; শেষ খণ্ডে যুক্তির চাইতে বিশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকৃতির পণ্ডিতসমাজ ধর্মপ্রত্যয়ের কাছে নতি স্বীকার করবার পর তাকে আর যুক্তি দিয়ে সমর্থনের বিশেষ চেষ্টা পান নি। কিন্তু তাঁরা বাইবেলকে বাদ দিয়ে অন্য নানা বিষয় স্বাধীনভাবে যুক্তির দ্বারা বিচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রজার বেকন এবং উইলিয়ম অব্ ওকাম্-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চার্চ কর্তৃপক্ষ এঁদের বিশেষ সুনজরে দেখেননি। ১২৭৮ খৃস্টাব্দে বেকনের সমস্ত বই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়; এবং ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে চোদ্দ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ওকাম্ আত্মরক্ষার জন্য সম্রাট লুই-এর আশ্রয় করেন। বেকন গণিত শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং ভূগোলের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; তাছাড়া আরব সংস্কৃতি এবং সেই সূত্রে গ্রীকদর্শনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি অবরোহী যুক্তির চাইতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্টকে অনেক বেশী মূল্য দিতেন। তাঁর বিচার অনুসারে ভ্রান্তির প্রধান হেতু চারটি: শাস্ত্রকারদের সিদ্ধান্তকে

বিচার না করেই গ্রহণ করা; প্রথাসিদ্ধ ধারণাকে প্রমাণিত জ্ঞান করা; অশিক্ষিত জনসাধারণের কথায় সায় দেওয়া; এবং নিজের অজ্ঞতাকে নানাভাবে ঢাকবার চেষ্টা। বেকন অবশ্য ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বাণীকে বিচারোর্ধ্ব বলে মানতেন। তবে বাইবেলের বাইরে যদি নিশ্চিত জ্ঞান কোথাও মেলে, তাঁর মতে সেই বিদ্যা হল গণিত। (E. Charles, *Roger Bacon : Sa vie, ses ouvrages ses doctrines*)।

উইলিয়ম অব ওকাম্‌কে অনেকে আধুনিক দর্শনের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ বলে থাকেন। এটা হয়ত একটু বেশী বলা, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে উক্ত দার্শনিকের অভিনবত্ব লক্ষণীয়। ওকামের মতে যুক্তিবিদ্যা বা লজিক-কে ভূয়োদর্শন বা মেটাফিজিক্‌স্ থেকে স্বতন্ত্র ভাবে চর্চা করা সঙ্গত। বস্তুজগতকে বোঝার জন্য মানুষ যেসব সামান্য ধারণা কল্পনা করে তাদের বিচার বিশ্লেষণ যুক্তিবিদ্যার উদ্দেশ্য। প্রকৃতিতে প্রতিটি বস্তু অথবা ঘটনার পৃথক অস্তিত্ব বিদ্যমান; সাধারণ ধারণার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তার অস্তিত্ব শুধু মানুষের কল্পনায় এবং ভাষায়। ওকামের এই যুক্তি পরোক্ষভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে। দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে সার্বজনীন নির্বাচনের ভিত্তিতে সবরকম সংগঠনের পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এটি যেমন রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে তেমনি চার্চের ক্ষেত্রেও খাটে। চার্চের বিধিবিধান যে সাধারণ সভা ঠিক করবেন, তার সদস্যদের নির্বাচন করবেন প্রাপ্তবয়স্ক খৃস্টধর্মীদের আঞ্চলিক সভা। অর্থাৎ উইলিয়মের সামাজিক চিন্তায় পরবর্তীকালের গণতান্ত্রিক আদর্শের পূর্বাভাস দেখা যায়।

মধ্যযুগের শেষভাগে ধর্মবিশ্বাস এবং যুক্তিকে মেলাবার এই যে নানাবিধ প্রচেষ্টা এরি প্রকাশ হল স্কলাস্টিক দর্শন। স্কলাস্টিক চিন্তা একদিকে যেমন যুক্তির দাবী কিছুটা মেনে নিয়ে চার্চের ভাঙনকে কিছুকালের মত ঠেকিয়ে রেখেছিল, অন্য দিকে তেমনি এই স্বীকৃতির ফলে পূর্ববর্তী তমিস্রার যুগ থেকে পরবর্তী রনেসাঁসী সভ্যতায় পৌঁছনোর পথ অনেকটা স্কলাস্টিকদের অজ্ঞাতসারেই নির্মিত হয়। কারণ জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান এবং যুক্তিপ্রয়োগের মূল্য একবার স্বীকৃত হলে তার আকর্ষণ নষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা নিজেরা একবার স্বাধীন ভাবে ভাবতে শুরু করেছেন তাঁদের পক্ষে চার্চের নিষেধ অথবা শাস্ত্রবচনের অধিরিটির গণ্ডীর মধ্যে সেই ভাবনাকে বেশীদিন ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব। ধর্মবিশ্বাসের গোঁড়ামি যে জ্ঞান এবং উদ্ভাবনার পথে

একটা বড় বাধা, স্কলাস্টিক মতবাদীদের অনেকের লেখার মধ্যে তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। এই বাধার চেতনা যতই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে ততই মনীষীদের উপরে ধর্মশাস্ত্র এবং চার্চের প্রভাব কমতে শুরু করে। তাঁরা যুক্তির স্বতঃসিদ্ধ অথরিটির উপরে জোর দিতে থাকেন; চিন্তার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন ধারণার ঘাতপ্রতিঘাতের সুযোগ তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয়; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে তাঁরা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের এবং আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা ক্রমে প্রবলতর হয়। ইয়োরোপীয় মানসের এই পুনরুন্মেষ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নৈসর্গিক প্রাবল্যে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই পুনরুন্মেষকেই পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকেরা নাম দিয়েছেন রনেসাঁস।

॥ দুই ॥

রনেসাঁস শব্দটির স্রষ্টা কে ঠিক জানিনা, তবে আমার নিজের পড়ার মধ্যে কথাটির প্রথম উল্লেখ ভাসারির ইতিহাসে লক্ষ্য করেছি। ভাসারি নিজে রনেসাঁসের শেষ যুগের একজন চিত্রকর। তিনি তাঁর অগ্রজ শিল্পীদের কাহিনী লিখতে গিয়ে তৎকালীন চারুকলার অভিনব পুনর্জন্ম অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। (G. Vassari, *Lives of Italian Painters, Sculptors and Architects*)। এটি কিন্তু রনেসাঁসের সঙ্কীর্ণ অর্থ। ব্যাপক অর্থে রনেসাঁস বলতে চোদ্দ শতকের মধ্যভাগ থেকে সতের শতকের সূচনাকালের মধ্যে ইয়োরোপীয় মানসে যে বহুমুখী পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, তার সবটাকেই বোঝায়। আঠারো শতকের শেষাশেষী এবং উনিশ শতকের গোড়া থেকে ঐতিহাসিকরা ক্রমে রনেসাঁসের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বিষয়ে অবহিত হতে সুরু করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে ইংরেজ ঐতিহাসিক হালাম এবং তাঁর চাইতেও ফরাসী ঐতিহাসিক মিশেলে-র নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে যেকব বুর্কহার্ট-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Civilization of the Renaissance in Italy* প্রকাশিত হয়। তারপর গত একশ বছরের মধ্যে বহু পণ্ডিত রনেসাঁস সম্পর্কে অসংখ্য বই এবং গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তেন, সাইমণ্ডস্, ৎজেলার, বেরেনসন, সিস্‌মন্দি, জেন্তিল, স্পিন্‌গার্ন্, শেভিল, কাসিরার, ক্রিস্টেলার, ব্যারন, হুইজিন্‌গা, পানোফ্‌স্কি, মার্টিন প্রমুখ

মনীষীদের অনুসন্ধান ও বিচারবিশ্লেষণের ফলে রনেসাঁস সম্বন্ধে আধুনিক পাঠকের ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একথা অবশ্য স্বীকার করা দরকার যে রনেসাঁসের কারণ, কাল এবং জীবনবোধ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে এখনো বিস্তর মতভেদ বর্তমান। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মোটামুটি স্বীকার করে থাকেন যে মধ্যযুগের শেষভাগে চার্চের একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং আত্মবিলোপী ধার্মিকতার বিরুদ্ধে স্বাধীন বিচার এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার যে অল্পস্বল্প চেষ্টা দেখা যাচ্ছিল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তা ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করে পরবর্তী দুই শতাব্দীতে পশ্চিম ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগের শেষভাগে শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি এবং যুক্তির মধ্যে বিরোধের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। চতুর্দশ শতাব্দীতে পোপের ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাওয়ার ফলে স্বাধীন চিন্তার সুযোগ অনেকটা বৃদ্ধি পায়। ফরাসী এবং ইতালিয়ানরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পোপ খাড়া করে ; পঞ্চদশ শতকের সূচনায় আরেকদল চার্চকর্মচারী সাধারণ সভা ডেকে তৃতীয় আরেকজন পোপ নির্বাচন করে। ফলে পোপ পদের সম্মান এবং প্রতিপত্তি কিছুকালের মত অত্যন্ত কমে যায়। ইতিমধ্যে বারুদের ব্যবহার সুরু হওয়াতে দুর্গনির্ভর সামন্ত-সমাজ ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে ; এবং সামন্তদের দমন করতে গিয়ে রাজশক্তি জনসাধারণের এবং বিশেষ করে ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের আনুগত্য অর্জনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইয়োরোপ থেকে ব্যবসাবাণিজ্য একরকম প্রায় লোপ পেয়েছিল। মধ্য যুগের শেষভাগ থেকে আবার বণিক সম্প্রদায় সক্রিয় হয়ে উঠতে সুরু করে। ধাতুবিদ্যা এবং খনিবিদ্যার লক্ষণীয় উন্নতি ঘটে। বাজারে বাজারে বিবিধ পণ্যদ্রব্যের আমদানী সুরু হয়। একদিকে ব্যাঙ্কিং-এর দ্রুত প্রসার ঘটে এবং অন্যদিকে নৌবহর গড়ে ওঠায় সমুদ্রপথে চলাচল বাড়তে থাকে। বাজারের চার ধারে শহর এবং বাণিজ্যের প্রয়োজনে বন্দরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ, চলাচলের স্বাধীনতা এবং জগৎসম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজনীয়। ফলে এই নূতন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় জ্ঞানচর্চা, উদ্ভাবনা এবং গতিশীল মনোভাবের সমর্থক হয়ে ওঠে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলম্বস ১৪৯২ খৃস্টাব্দে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। কয়েকবছর পরে ১৪৯৭ খৃস্টাব্দে

ভাস্কোডাগামা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে পৌঁছন। ষোড়শ শতাব্দীতে মার্কিনের সোনারূপো আর ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের প্রচুর আমদানীর ফলে ইয়োরোপের আর্থিক ব্যবস্থায় বিপ্লব আরম্ভ হয়। (Abbot, *Expansion of Europe*)।

আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে আরবদের কল্যাণে মধ্যযুগের শেষভাগে প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতি বিষয়ে ইয়োরোপের মনীষীরা সচেতন হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু গ্রীক শিল্প-সাহিত্য-দর্শন বিষয়ে ইয়োরোপে ব্যাপক চর্চা সুরু হয় পনের শতকের মধ্যভাগ থেকে। ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে অটোমান তুর্ক-রা কন্সট্যান্টিনোপল্ দখল করে। সেখানকার গ্রীকভাষাবিদ্ অধ্যাপকেরা দলে দলে পালিয়ে এসে ইয়োরোপের বিভিন্ন শহরে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এঁরা বিস্তর প্রাচীন গ্রীক পুঁথিপত্র সঙ্গে এনেছিলেন। ফলে গ্রীক ঐতিহ্য নিয়ে ইয়োরোপে বিস্তারিত আলোচনা হতে থাকে এবং হেলেনিক ও রোমান সংস্কৃতির নানা বিস্মৃত উপাদান পুনরাবিষ্কৃত হয়। একা কার্ডিন্যাল-বেসারিয়ন নাকি কন্সট্যান্টিনোপল্ থেকে আটশ-র বেশী গ্রীক পুঁথি এনেছিলেন। (H. A. L. Fisher, *A History of Europe*, পৃঃ ৪৫০)। গ্রীকরা ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং বহুমুখী বিকাশকে অত্যন্ত মূল্য দিত; মানুষের মন এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলের অবধি ছিলনা; তাছাড়া নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের উপায় হিসেবে যুক্তি, তথ্য-সংগ্রহ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার উপরে তাদের গভীর আস্থা ছিল। হেলেনিক ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারের ফলে খৃস্টধর্মের জীবনবিমুখ, নিগ্রহশীল এবং আত্মাবহ জীবনদর্শনের বিরুদ্ধে পশ্চিমী ভাবুকদের বিদ্রোহ প্রবলতর হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহ সাহিত্য-দর্শন-শিল্পকলার ভিতর দিয়ে নানাভাবে প্রকাশ পায়।

মধ্যযুগে জ্ঞান আবদ্ধ ছিল পুঁথির পাতায় এবং কাগজ ও ছাপাখানার অভাবে খুব সামান্য সংখ্যক লোকই সে সব পুঁথি পড়ার সুযোগ পেত। কাগজ তৈরী করার প্রক্রিয়া প্রথম সম্ভবত চীনের অধিবাসীরাই উদ্ভাবন করে। তাদের কাছ থেকে এ বিদ্যা শেখে আরব-রা। তারা আবার ইয়োরোপে এ শিল্পের প্রবর্তন করে। তেরো শতকে ইয়োরোপে কাগজ তৈরী সুরু হয়; পরের দুই শতকে তার ব্যাপক ব্যবহার সম্ভবপর হয়ে ওঠে। W. H. McNeil, *History Handbook of Western Civilization*, পৃঃ ৩৭৫)। চীন এবং আরবের কাছে ইয়োরোপ মুদ্রণশিল্পেও শিক্ষা গ্রহণ করে। (T. F.

Carter, *The Invention of Printing in China and its spread Westward*)। পনের শতকের মধ্যভাগে মাইন্‌ৎজ্‌ শহরে জন গুটেনবার্গ অক্ষর নির্মাণ করে বই ছাপানো সুরু করেন। তাঁর ছাপাখানা থেকে ১৪৫৬ খৃস্টাব্দে যে বাইবেল প্রকাশিত হয় সেটিই ইয়োরোপের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ধাতুর তৈরী হরফ বানিয়ে বই ছাপার প্রচলন হয় ইতালিতে ১৪৬৫ খৃস্টাব্দে, পারীতে ১৪৭০ খৃস্টাব্দে, লণ্ডনে ১৪৭৭ খৃস্টাব্দে, স্টক্‌হল্‌ম্‌-এ ১৪৮৩ খৃস্টাব্দে এবং মাদ্রিদে ১৪৯৯ খৃস্টাব্দে ভেনিসের বিখ্যাত আল্‌ডাইন্‌ প্রেস থেকে সুন্দরভাবে ছাপানো এবং বাঁধানো বহু ক্লাসিক গ্রন্থের যেসব সংস্করণ পনের শতকের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল আজো তাদের দেখলে বিস্ময় লাগে। ফিশার সাহেবের হিসেব অনুসারে পনের শতকের সূচনায় যেখানে ইয়োরোপে মোট পুঁথির সংখ্যা ছিল কয়েক সহস্র মাত্র, ঐ শতকের শেষভাগে সেখানে প্রায় নব্বই লক্ষ মুদ্রিত কপির আবির্ভাব ঘটে।

পনের শতকে ছাপাখানার এবং কাগজের প্রচলন হওয়ার ফলে জ্ঞানের চর্চা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। পূর্বে চার্চের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ না করলে বিদ্যার্জনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এখন চার্চের কর্মচারী ছাড়াও বহু ব্যক্তি স্বাধীনভাবে লেখাপড়ায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে। নূতন যে সব ভাবনা-চিন্তা গড়ে উঠছিল, ছাপানো বইয়ের মারফৎ সমাজের উপরে তাদের প্রভাব দ্রুত বেড়ে চলে। ইয়োরোপের যে সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রথমে অল্প কয়েকজন প্রতিভাবান ব্যক্তির মনে সূচিত হয়েছিল অতঃপর তার সামাজিক স্বীকৃতি সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ("The importance of printing and paper-making was very great. Books became relatively cheap, learning became accessible to a much wider circle of the population than could be the case when a single hand-copied volume cost as much as a peasant's farm. The gap between intellectual leaders and the population at large could be narrowed and the rate of diffiusion of new ideas and teachings could be correspondingly increased." McNeill, ঐ)।

এইসব ঘটনার সমাবেশের ফল ইয়োরোপের সাংস্কৃতিক পুনর্জন্ম বা রনেসাঁস। মিশেলের ভাষায় রনেসাঁসের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপ একদিকে

বিশ্বজগৎকে এবং অন্যদিকে মানবপ্রকৃতিকে আবিষ্কার করে। (Michelet, *History of France*)। এই আবিষ্কার কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা হয়নি। কয়েক শতাব্দী ধরে অনেক বিখ্যাত এবং স্বল্পখ্যাত মানুষের আত্মবিকাশের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপীয় মানসের এই বিস্ময়কর পুনরুজ্জীবন ঘটে। আমরা আগে লক্ষ্য করেছি যে মধ্যযুগের শেষভাগ থেকেই অন্ধবিশ্বাসের তামসিক প্রভাব কাটিয়ে জিজ্ঞাসু যুক্তিশীলতাকে প্রতিষ্ঠিত করার কিছু কিছু প্রয়াস চোখে পড়ে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইয়োরোপের নবজাগরণের চিহ্ন সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রথমে ইতালিতে এবং তারপর জার্মানী ও উত্তর ইয়োরোপে, ফ্রান্সে ও স্পেনে, এবং পরিশেষে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলণ্ডে নৈসর্গিক বৈচিত্র্য এবং প্রবলতার সঙ্গে রনেসাঁসী জীবনবোধ আপনাকে প্রকটিত করে। পেত্রার্ককে (১৩০৪-১৩৭৪) সাধারণত রনেসাঁসের প্রথম প্রবক্তা বলা হয়ে থাকে। তাঁর আবির্ভাবের সময় থেকে পরবর্তী যে তিনশ বছরের মধ্যে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, তাকেই অধিকাংশ ঐতিহাসিক রনেসাঁসের যুগ বলে থাকেন। (Cassirer, Kristeller, and Randall, *The Renaissance Philosophy of Man*) সাহিত্যের ক্ষেত্রে পেত্রার্ক, বোকাচ্চিও (১৩১৩-১৩৭৫), আরিওস্তো (১৪৭৪-১৫৩৩), রাবলে (১৪৯৪-১৫৫৩), রঁসার (১৫২৪-১৫৮৫), মঁতাইয় (১৫৩৩-১৫৯২), সর্ভান্তিজ (১৫৪৭-১৬১৬), মার্লো (১৫৬৪-১৫৯৩), শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬), স্পেন্সার (১৫৫২-৯৯) এবং ডান (১৫৭৩-১৬৩১) ; শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভান আইক (১৩৮৫-১৪৪০), উচ্চেলো (১৩৯৭-১৪৭৫), বত্তিচেলী (১৪৪৪-১৫১০), লেওনার্দো (১৪৫২-১৫১৯), ডুয়েরার (১৪৭১-১৫২৮), মিকেলাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪), টিশিয়ান (১৪৭৭-১৫৭৬), রাফাএল (১৪৮৩-১৫২০), হলবেন (১৪৯৭-১৫৪৩), টিনটোরেট্টো (১৫১৮-১৫৯৪), এল গ্রেকো (১৫৪৫-১৬১৪), এবং রুবেন্স্ (১৫৭৭-১৬৪০) ; দর্শন এবং বিবিধ বিচার আলোচনার ক্ষেত্রে লোরেঞ্জো ভালা (১৪০৬-৫৭), মার্সিলিও ফিচিনো, পিকো দেলা মিরান্দোলা, পিএত্রো পম্পনাজি (১৪৬২-১৫২৪), মেকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭), এরাজমুস (১৪৬৯-১৫৩৬), কাস্তিলিওনে (১৪৭৮-১৫২৯), জবারেলা (১৫৩২-৮৯), এবং ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-

১৬২৬); বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপারনিকস (১৪৭৩-১৫৪৩), টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১), কেপলার (১৫৭১-১৬৩০), এবং গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২)—রনেসাঁসের এইসব অসামান্য প্রতিভাবান পুরুষ এবং তাঁদের সমসাময়িক আরো অনেকের সাধনার ফলে ইয়োরোপে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক সভ্যতার গোড়া পত্তন হয়।

[রনেসাঁস সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা উল্লিখিত বইগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত বই কখানি পড়ে দেখতে পারেন: H. Blanchard, *Prose and Poetry of the Continental Renaissance in translation*; John A. Symonds *Renaissance in Italy*, 7 vols; Trenchard Cox, *The Renaissance in Europe*; E. Cassirer, *Individual and Cosmos in the Philosophy of the Renaissance*]।

। তিন ।

চোদ্দ শতক থেকে সতের শতকের সূচনার মধ্যে ইয়োরোপের জীবনে যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছিল তার মূল কথাটি কি? পরিবর্তন ত শুধু একদিকে ঘটে নি। সাহিত্যে বলুন, চিত্রে বলুন, নীতি-ন্যায়, আইনকানুন, সমাজসংগঠনে বলুন, মানুষের সঙ্গে মানুষ এবং মানুষের সঙ্গে জগতের যে বিচিত্র সম্পর্ক তার যে-কোনো দিকেই বলুন, সব ক্ষেত্রেই এই আড়াইশ, পৌনে তিনশ' বছরের মধ্যে আশ্চর্য রকমের রূপান্তর চোখে পড়ে। এই বহুমুখী রদবদলের মধ্যে এমনকি কোন ঐক্য আছে যা অসংখ্য ঘটনাকে একটি সমগ্র ধারার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছে? আমার ধারণা, ইয়োরোপের এই তিনশ' বছরের ইতিহাসের কেন্দ্রে এমনি একটি সূত্র অতি সুস্পষ্টভাবে বর্তমান এবং আমরা যাকে আধুনিক সভ্যতা বলি এই সূত্র তারই মুখ্য ধারক। সেই সূত্রের ইংরেজী নাম হিউম্যানিজ্‌ম্। বাংলায় একে মানবতন্ত্র বলা যেতে পারে।

নামেই প্রকাশ মানবতন্ত্রের মুখ্য উপজীব্য স্বয়ং মানুষ। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, দেবদেবী, ভূতপ্রেত কি ঐ-জাতীয় অতিমানবিক কল্পনা নয়; আপনি, আমি এবং আরো কোটি কোটি প্রত্যক্ষ, প্রাতিস্বিক, বাস্তব নরনারীকে নিয়েই মানবতন্ত্রের যা কিছু ভাবনাচিন্তা। মানবতন্ত্রী দৃষ্টির যে-বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল, এ দৃষ্টি স্পষ্ট করেই আধ্যাত্মিকতামুক্ত। এ সংসারে সত্য, মিথ্যা,

ভালোমন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, সব কিছুরই বিচারক এবং মানদণ্ড মানুষ নিজে। তার জন্য কোনো মানবোত্তর-কল্পনার একেবারেই প্রয়োজন নেই। আসলে ঈশ্বর, দেবদেবী, স্বর্গনরক বা ঐ-জাতীয় বিচিত্র কল্পনা মানুষেরই মস্তিষ্কজাত। গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরসের সেই যে বিখ্যাত উক্তি—মানুষ সবকিছুর মাপকাঠি—মানবতন্ত্রের এটি অন্যতম মূল প্রত্যয়।

একথা থেকে অবশ্য সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হবে না যে রনেসাঁসের মানবতন্ত্রীরা সকলে নাস্তিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর এবং ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করেন নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা অনস্বীকার্য যে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা মুখ্যত ঐহিক বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত ছিল, এবং যতই তাঁদের আন্দোলন স্পষ্টতা অর্জন করতে থাকে ততই তাতে ধর্ম এবং চার্চের প্রভাব কমে আসে। ঐতিহাসিক বুর্কহার্ট নিজে ধার্মিক ব্যক্তি হয়েও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে রনেসাঁসের চিন্তানায়করা পাপ, প্রায়শ্চিত্ত, পরিত্রাণ, স্বর্গ, ইত্যাদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি, মর্ত্যলোকে মানুষের জীবন নিয়েই তাঁরা কৌতূহলী ছিলেন। বুর্কহার্টের কথায়: These intellectual giants, these representatives of the Renaissance, show, in respect to religion, a quality which is common in youthful nature. Distinguishing keenly between good and evil, they yet are conscious of no sin. Every disturbance of their inward harmony *they feel themselves able to make good out of the plastic resources of their own nature*, and therefore they feel no repentance. The need for salvation the ꞏ becomes felt more and more deemly···The worldliness, through which the Renaissance seems to offer so striking a contrast to the Middle Ages, owed its first origin to the flood of new thoughts, purposes and views, which transformed the medieval conception of nature and man." (J. Burckhardt, *The Civilisation of the Renaissance in Italy*, পৃঃ ৩০৩-৪)। ঐ গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলেছেন যে, রনেসাঁসী মানবতন্ত্র "was in fact pagan, and became more and more so as its sphere widened in the fifteenth century." (ঐ, পৃঃ ৩০৯)। অধ্যাপক ফার্ডিনান্ড শেভিলের

মতে "unconsciously at first, and with gradually awakening consciousness men, turned from the medieval absorption in the problem of salvation, which tended to withdraw them from life and make them otherworldly, to the task of making themselves more fully at home on a friendly earth". (F. Schevill, *The First Century of Italian Humanism*, ভূমিকা, পৃঃ ৫)। বর্তমান শতকে যিনি রনেসাঁসের ওপরে সম্ভবত সবচাইতে বেশী আলোকপাত করেছেন সেই কসিরার সাহেবের সিদ্ধান্ত হল: "The man of the Renaissance possesses definite characteristic properties which clearly distinguish him from 'the man of the middle ages'. He is characterised by his joy in the senses, his turning to nature, his roots in the world, his self-containedness for the world of form, his individualism, his paganism, his amoralism." (*The Philosophy of Ernst Cassirer, edited by P. A. Schilpp*, পৃঃ ৭২০)।

মানবতন্ত্রীর বিচারে মানুষ শুধু সবকিছুর মাপকাঠি নয়, মানুষই মনুষ্যত্বের একমাত্র উৎস। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে পুনরুক্তি মনে হতে পারে, কিন্তু আজো পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী যে সব মূঢ় বিশ্বাসের দ্বারা আচ্ছন্ন সেগুলিকে স্মরণ করলে এ প্রস্তাবের অভিনবত্ব এবং যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে না। এদেশে আমাদের পিতামহ, প্রপিতামহেরা নিজেরা শিখে এসেছিলেন এবং তাদের পুত্র প্রপৌত্রগণ আমাদের এতাবৎ শিখিয়ে এসেছেন যে মনুষ্যত্বের উৎস আসলে মানুষ নয়, তার মধ্যে পরমাত্মার যে ভগ্নাংশ জীবাত্মা রূপে বর্তমান তিনিই নাকি মনুষ্যত্বের মূলাধার। গোঁড়া ক্রিশ্চানরা অনেকে এটুকুও স্বীকার করেন না। কেননা, তাঁদের মতে মনুষ্যত্বের মধ্যে ভাল বলে কিছুই নেই। মানুষের অস্তিত্ব আদিম পাপের দ্বারা চিহ্নিত, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া সে পাপ থেকে আমাদের পরিত্রাণ অসম্ভব। মানুষের যা কিছু গুণ তা যে মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকেই পাওয়া এবং সে অস্তিত্ব যে একান্তভাবে পার্থিব, প্রাক্‌মানবতন্ত্রী মন মনুষ্যত্বের এই স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম করতে একেবারেই অসমর্থ। রনেসাঁসের মনীষীরা প্রথম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে মানুষের বিচিত্র সম্ভাবনাসমষ্টির নাম মনুষ্যত্ব,

আর সে সম্ভাবনার হেতুনির্ণয়ের জন্য মানব অতিরিক্ত কোনো কল্পনার প্রয়োজন নেই।

মনুষ্যত্ব যদি মানুষেরই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাসমষ্টির অপর নাম, তবে মানুষের বিকাশের জন্য কোনো অতিমানবিক শক্তির কল্পনা স্পষ্টতই অবান্তর। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা; তার ভাগ্য রচনা করার ক্ষমতা তার নিজের মধ্যেই নিহিত আছে। রনেসাঁসের মানবতন্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা পুরোপুরি অধ্যাত্মপ্রত্যয়ের প্রভাব এড়াতে পারেন নি, এমনকি তাঁরাও মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের উপরে জোর দিয়েছেন। পিকো দেলা মিরান্দোলা তাই তাঁর "মানুষের মহত্ব বিষয়ক নিবন্ধে" লিখেছেন—"ঈশ্বর আদমকে বললেন, দেখ তোমাকে আমি মুক্ত জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছি। আমার অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে বিকাশ নেই। কিন্তু তুমি নিজের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে নিজেকে যেভাবে খুশি বিকশিত করতে পার। শুধু তোমার মধ্যেই বৈশ্বিক জীবনের বীজ উপ্ত আছে।" (Pico della Mirandola, *Discourse on the Dignity of Man* । রনেসাঁসের আরেকজন মহৎ মানবতন্ত্রী আলবর্তি লিখেছেন: "মানুষ যদি ইচ্ছে করে তবে সবকিছুই সে করতে পারে।" জ্যোভানি ভিলানির মতে "কোনো গ্রহনক্ষত্র বা দৈবশক্তি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে দমিত করতে পারে না।"

অর্থাৎ মানুষ কারো হাতের যন্ত্র নয়, সে নিজেই যন্ত্রী। সে কোনো অতিমানবিক উদ্দেশ্যসাধনের উপাদান নয়, তার নিজের অস্তিত্ব এবং বিকাশের প্রয়োজনেই সে নানা উদ্দেশ্য কল্পনা করে এবং সেই দিকে আপনাকে চালিত করে। প্রতি মানুষের মধ্যে অফুরন্ত সম্ভাবনা বর্তমান; মানুষ নিজের চেষ্টায় সেই সব সম্ভাবনাকে সার্থক করে তোলে। এইভাবে মানুষ নিজেকে নিজে বারবার সৃষ্টি করে, তার অপর কোনো সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই। মানুষের ইতিহাস আসলে তার এই নিরন্তর সৃষ্টি-প্রচেষ্টার ইতিহাস। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি এই প্রচেষ্টারই প্রকাশ মাত্র।

মানুষ যে নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ণয় করতে পারে তার প্রধান কারণ দুটি। একটি হল তার বুদ্ধি, আর অন্যটি হল তার মুক্তি স্পৃহা। এ দুটিই তার অস্তিত্বগত বৃত্তি। অন্য জীবজন্তুরও এ দুটি সামর্থ্য আছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে দেহ এবং বিশেষ করে মস্তিষ্কের আশ্চর্য বিবর্তনের ফলে এবৃত্তি দুটি অসামান্য সম্ভাবনার আকর রূপে দেখা দিয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রকাশ

বহুমুখী। বুদ্ধির দ্বারা মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত কার্যকারণ সূত্রের অনুধাবন করতে পারে, এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজের নানা উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগায়। বুদ্ধি মানুষকে সত্যান্বেষী করে, তার বিক্ষিপ্ত, খণ্ড খণ্ড, জঙ্গম অভিজ্ঞতাকে চিন্তা বা ভাবের মধ্যে স্থায়ী রূপ দেয়, তার ধারণায় ব্যাপকতা, স্পষ্টতা এবং যাথার্থ্য আনে। মানুষ অত্যন্ত অনুভূতিশীল বলে তার জীবনে বহুমুখীনতা, জটিলতা, পরিবর্তনশীলতা এবং দ্বন্দ্ব অন্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশী প্রবল। বুদ্ধি বহুত্বের মধ্যে ঐক্য আনে, দ্বন্দ্বের মধ্যে সৌষম্য ঘটায়, পরিবর্তনকে স্থিতিস্থাপক করে তোলে। এক কথায়, বুদ্ধি ব্যক্তি-অস্তিত্বে সমগ্রতা সম্পাদন করে। শুধু তাই নয়, বুদ্ধির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভাবনার লেনদেন সম্ভব হয়, বিচিত্ররূপে সামাজিক সহযোগিতা গড়ে ওঠে। এবং বুদ্ধির বিকাশের ফলে মানুষ ভাষা, যন্ত্র রীতিনীতি প্রয়োগপদ্ধতি ইত্যাদির উদ্ভাবন করে নিজের অন্তর্নিহিত অফুরন্ত সম্ভাবনাকে নানাভাবে সার্থক করতে পারে।

আর এই বিচিত্র সম্ভাবনাকে সার্থক করারই অপর নাম মুক্তি। আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় মুক্তি কথাটা এমন এক অদ্ভুত অর্থ নিয়েছে যে মানবতন্ত্রী চিন্তার ব্যাখ্যায় শব্দটি প্রয়োগ করতে সংকোচ বোধ হয়। আমরা এদেশে মুক্তি বলতে বুঝি দেহের বন্ধন এবং বিশ্বপ্রকৃতির সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মার 'মহাপ্রয়াণ'। অর্থাৎ জীবদেহ আমাদের কাম্য নয়, কোনো রকমে এ দেহ ত্যাগ করে ব্রহ্মে বিলীন হতে পারলেই আমাদের মোক্ষ। যে দেশে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো সুখ নেই, সম্ভোগ নেই, বিকাশও নেই, যে দেশে বাঁচাটা প্রায় কোনোক্রমে টিঁকে থাকার সামিল, সেখানে এধরণের বিকৃতবুদ্ধি তত্ত্বকথায় কারো তেমন অবাক ঠেকে না। মধ্যযুগে ইয়োরোপের মানুষও তাই বিকাশের চাইতে "উদ্ধার লাভের" জন্য বেশী ব্যাকুল ছিল। কিন্তু মানবতন্ত্রের সাধনা মরে বাঁচার সাধনা নয়। মানবতন্ত্রী মুক্তি বলতে বোঝেন ব্যক্তির স্বচেষ্টাপ্রসূত বিচিত্র বিকাশ। প্রতি মানুষের মধ্যে অফুরন্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে রূপায়িত করতে হলে একদিকে ব্যক্তির দেহমনের ক্ষমতা বাড়াতে হবে, অন্যদিকে পরিবেশের বাধাগুলিকে অপসারিত করতে হবে। এই ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বুদ্ধিকে মার্জিত করা দরকার, অনুভূতিকে সূক্ষ্মতর করা দরকার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সক্রিয় করা দরকার, সম্ভোগের দ্বারা দেহ এবং মনকে সরস ও ও সতেজ রাখা দরকার, আর সবচাইতে দরকার ব্যক্তি-অস্তিত্বে সুষম সমগ্রতা

অর্জন করা। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহমনের এই বিকাশ ঘটে মানবতন্ত্রী তাকেই যথার্থ শিক্ষা বলে মনে করেন। অপরপক্ষে পরিবেশের বাধা অপসারিত করার জন্য চাই বিজ্ঞান—পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান—এবং ক্রমোন্নতিশীল যন্ত্র, রীতিনীতি, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদির সাহায্যে জ্ঞানের প্রয়োগ। নিজেকে অনুশীলিত করে এবং পরিবেশকে বশে এনে মানুষ বিকাশের দিগন্তকে প্রসারিত করে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করে থাকবেন যে মানবতন্ত্রী দৃষ্টিতে বুদ্ধির চর্চা এবং মুক্তির সাধনা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। বুদ্ধি ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ অসম্ভব এবং ব্যক্তির বিকাশ না ঘটলে বুদ্ধি ক্রমেই জড়ত্ব লাভ করে। সত্যসন্ধিৎসা মুক্তিপ্রয়াসকে সার্থক হতে সাহায্য করে, আবার মুক্তিপ্রয়াস জিজ্ঞাসাকে অবসন্ন হতে দেয় না। অপরপক্ষে বুদ্ধিবিমুখ মন স্বতঃই আত্মবিলোপে সার্থকতা খোঁজে, আর দাস্যভাবের সাধকরা যে অতি সযত্নে সব রকমে প্রশ্নশীলতাকে এড়িয়ে চলেন ধর্মচর্চার ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলবে। মানবতন্ত্রের নায়ক দাস নয়, সে কর্তা। অনুশীলিত বুদ্ধির দ্বারা সে এই নিয়মনিয়ন্ত্রিত জগতকে তার স্বীয় বিকাশের উপাদানে পরিণত করতে উদ্যোগী। মানবতন্ত্রী দর্শনে জ্ঞান এবং ইচ্ছাশক্তি, ক্লাসিক কার্যকারণবোধ এবং রোমান্টিক সৃষ্টিপ্রেরণা পরস্পরের বিরোধী নয়, তারা পরস্পরের সম্পূরক। মানুষ একাধারে ধীমান এবং মুক্তিকামী বলেই সে ইতিহাসের নায়ক।

তবে ইতিহাসের নায়ক বলে মানুষ ব্রহ্ম নয়। মানুষের অস্তিত্ব দেহের দ্বারা সীমায়িত। সুতরাং যে সর্বগ্রাসী ব্যাপকতা ব্রহ্ম নামক কল্পনায় আরোপ করা হয় তা কখনো ব্যক্তি-অস্তিত্বের গুণ হতে পারে না। ফলে মানুষের বিকাশসাধনায় এমন কোন স্তর নেই যাকে চরম বলে মানা যেতে পারে। মানুষ নানারূপে নানাভাবে নিজেকে বিকশিত করছে, কিন্তু তার কোনো রূপটিই এমন নয় যার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির সব সম্ভাবনা একদেহে আকার লাভ করেছে। ব্রহ্ম এমনি কল্পনা যার কোনো দেহাশ্রিত বাস্তবীকরণ অসম্ভব। ব্রহ্মত্ব অর্জন তাই মানুষের সাধনা নয়। তার সাধনা নিজের অন্তর্নিহিত বহুমুখী সম্ভাবনাকে নানারূপে বিকশিত করা। রনেসাঁসী সাহিত্যে তাই ব্যক্তির বিকাশ প্রসঙ্গে একক মানুষ (uomo singolare), অনন্য মানুষ (uomo unico) এবং বৈশ্বিক মানুষ (uomo universale) এর উল্লেখ পাওয়া

যায়। প্রথমে ব্যক্তি নিজেকে গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে শেখে; তারপর ক্রমে সে তার স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে; এবং পরিশেষে এই বিকাশের পথে সে বৈশ্বিকতা অর্জন করে। মানবতন্ত্রের আদর্শ ব্রহ্ম নয়, তার আদর্শ l' l'uomo universale বা এই বৈশ্বিক মানব।

ব্রহ্মত্বে মানবতন্ত্রীয় এই অনাস্থা বুদ্ধির পরিশীলনের ক্ষেত্রে আরো সুস্পষ্ট। মানুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতানির্ভর, এবং যেহেতু কোনো অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতা-সমষ্টি বিশ্বপ্রকৃতির স্থানকালবিস্তৃত সীমাহীন সমগ্রতাকে আত্মস্থ করতে পারে না, সে কারণে জগৎ সম্বন্ধে সব ধারণাই অসম্পূর্ণ। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান নিরর্থ কল্পনা মাত্র। কোনো জ্ঞান সম্বন্ধেই একথা বলা চলে না যে এটি সম্পূর্ণ সত্য, এর পরে আর কিছু বলবার নেই। ইন্দ্রিয়গ্রামের সূক্ষ্মতাসাধনের ফলে, বিচিত্র এবং বহুমুখী অভিজ্ঞতারাশির সন্নিবেশের ফলে, অভিজ্ঞতাসন্নিবেশের পদ্ধতিগুলি মার্জিত হওয়ার ফলে, মানুষের জ্ঞান ক্রমেই অধিকতর যাথার্থ্য অর্জন করে। মানুষের প্রতিটি ধারণাই প্রশ্নসহ; এবং এই প্রশ্নশীলতাই অধিকতর যাথার্থ্য অর্জনের একমাত্র পন্থা। সুতরাং যাঁরা যোগাভ্যাস কি অবতারতত্ত্ব কি ঐশী প্রেরণার সাফাই গেয়ে নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞ বলে দাবী করেন, তাঁদের সঙ্গে মানবতন্ত্রী বুদ্ধির কোনো রফা সম্ভব নয়। এই অর্থে মানবতন্ত্রী নিয়ত সংশয়বাদী। কোনো বাণী, তা সে বেদ বাইবেল কোরান বা গীতাতেই থাক, কি পোপ পুরোহিতের মুখ থেকে উচ্চারিত হোক, কি স্বৈরাচারী শাসনকর্তার সিংহাসন থেকে নেমে আসুক, মানবতন্ত্রী তাকে আপ্তবাক্য বলে মানতে নারাজ। মানবতন্ত্রীর সত্যান্বেষণ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে স্তব্ধ হতে পারে না; সিদ্ধান্তে পৌঁছেও যাথার্থ্যের প্রয়োজনে সে সিদ্ধান্ত বদলাবার জন্য তার মন সব সময়েই প্রস্তুত। লেওনার্দোর নোট-বইতে, এরাজ্‌মুসের বিভিন্ন নিবন্ধে এবং সবচাইতে সুস্পষ্টভাবে মঁতাইয়ঁ-র প্রবন্ধাবলীতে রনেসাঁসী উন্মুক্তবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই উন্মুক্ততার ফলে এঁদের মন সব রকম গোঁড়ামী, সঙ্কীর্ণতা এবং অসহনশীলতা থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। রনেসাঁসের যুগে এবং তারপরে দর্শন ও বিজ্ঞানের যে দ্রুতবিকাশ ঘটে, এই উন্মুক্ত সত্যসন্ধিৎসাই তার মূল উৎস। এই উন্মুক্ত নিরাসক্ত জিজ্ঞাসাবৃত্তি না থাকলে মানুষ স্বাধীনতার সাধক হতে পারত না। সেক্ষেত্রে মানুষের ইতিহাস পর্যবসিত হত বুদ্ধির-চোখে-ঠুলি-আঁটা, অভ্যাসের-জোয়ালটানা, আপ্তবাণীর-জাবরকাটা, স্ফূর্তিহীন, আনন্দহীন, অর্থহীন দিনগুজরানিতে।

॥ চার ॥

পূর্বোক্ত দার্শনিক প্রস্তাবগুলিকে অবলম্বন করে মানবতন্ত্রী নীতিচিন্তা গড়ে উঠেছে। নীতিচিন্তা বলতে আমাদের মনে যে সব আধ্যাত্মিক তেতো ওষুধের স্মৃতি ভেসে ওঠে, মানবতন্ত্রী নীতিচিন্তার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। মানুষকে ব্যাধিগ্রস্ত জীব হিসেবে কল্পনা করে নিয়ে তার জন্য মোহমুদ্গরের দাওয়াই বাতলানোকে যাঁরা নীতিচিন্তা মনে করেন, তাঁরা বৃথাই মানবতন্ত্রে নৈতিকতার হদিশ খুঁজবেন। মানবতন্ত্রের দৃষ্টিতে মানুষ মাত্রই অসীম সম্ভাবনার আকর, আর সেই সম্ভাবনারাশিকে কি ভাবে সার্থক করা যায়, মানবতন্ত্রী নীতিচিন্তার এটিই একমাত্র আলোচ্য।

প্রতি মানুষই যখন অসীম সম্ভাবনার আকর, তখন মানুষমাত্রই অমূল্য। হরিপদ কেরানী অবশ্য আকবর বাদশা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্য যে হরিপদ কেরানীর অভাব আকবর বাদশার দ্বারা পূরণ করা যায় না। হরিপদ হরিপদ বলেই সে অদ্বিতীয়; অপর কোনো কিছুকেই—তা সে যত মহৎ, যত মূল্যবানই হোক না কেন—তার এই প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের তুল্যমূল্য ভাবলে ঘোরতর ভুল করা হবে। অতএব মানুষমাত্রই মূল্যবিচারের দিক থেকে স্বয়ংসিদ্ধ; তার অতিরিক্ত কোনো অস্তিত্বের বাহন বা উপাদান হিসেবে তার মূল্য নির্ণীত হতে পারে না। মানুষ ঈশ্বর কি দেবদেবীর মহিমা প্রচারের বাহন নয়; দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ, শ্রেণী, বর্ণ, দল ইত্যাদি গোষ্ঠীগত স্বার্থের উদ্দেশ্য সাধনের সে যন্ত্র নয়; রাজা, পুরোহিত, মহাত্মা কি মালিকের প্রয়োজন মেটানোর সে উপায় নয়। মনুষ্যজাতির যদি কোনো সর্বজনীন এবং স্বতঃসিদ্ধ উদ্দেশ্য থাকে তবে তা হল, প্রতিটি ব্যক্তিকে অমূল্য জেনে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে ব্রতী হওয়া।

সুতরাং সর্বাঙ্গীণ বিকাশই হল মানবতন্ত্রী নীতির মূল আদর্শ। এই বিকাশে যা সাহায্য করে, তা ভালো; এ বিকাশকে যা ব্যাহত করে তা মন্দ। যে নিয়ম, যে ব্যবহার, যে ক্রিয়াকলাপ, যে ভাবনা, যে সম্বন্ধ ব্যক্তির অস্তিত্বকে সমৃদ্ধতর করে তোলে, তাই যথার্থ কল্যাণকর। অপর পক্ষে যার ফলে অস্তিত্ব সঙ্কীর্ণতর, রুক্ষতর, ক্ষীণতর হয়, তাই অশিব, তাই অন্যায়। মানবতন্ত্রীর অন্বেষণ সেই আদর্শ সমন্বয়ের জন্য যাতে কোনো মানুষের বিকাশকেই ব্যাহত না করে প্রতি মানুষের বিকাশকেই সুগম করে তোলা

যায়। এই অন্বেষণেরই প্রকাশ মানবতন্ত্রীর বিবেক। সে বিবেক তাই কোতোয়াল নয়, বরং তাকে বলা যায় কবি। তার স্ফূর্তি নিপীড়নে নয়, তার স্ফূর্তি বিকাশের নবতর, প্রকৃষ্টতর পদ্ধতির উদ্ভাবনে।

ব্যক্তির এই বহুমুখী বিকাশের জন্য চাই বিচিত্র এবং অব্যাহত সম্ভোগ, চাই অনুভূতির পরিশীলন, মনের সুষমিত সমগ্রতা, চাই বুদ্ধির সূক্ষ্মতাসাধন, জ্ঞানের প্রসার, প্রকাশরীতির চর্চা, চাই মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এবং বিশেষ করে মানুষের সঙ্গে মানুষের অসঙ্কোচ আত্মীয়তা। বাঁচার মানে যদি টেঁকা না হয়ে ফুটে ওঠা হয়, তবে তার জন্য এর প্রত্যেকটিই অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই পৃথিবীতে কত ঐশ্বর্য ছড়ানো রয়েছে, কত রং, কত গন্ধ, কত ধ্বনি, কত স্বাদ, কত বিচিত্র অনুভূতির সম্ভাবনা। আর মানুষের দীর্ঘদিনের চেষ্টায় তাতে আরো কত নতুন ঐশ্বর্য না যুক্ত হয়েছে, কত ছবি, কত গান, কত বই, কত কল্পনা। এসব সম্ভোগ না করলে মানুষের দেহই-বা কি করে সরস হবে, মনই-বা কি করে সমৃদ্ধ হবে। মানবতন্ত্রীর নীতিচিন্তায় ভোগের স্থান তাই এত সম্মানের—কেননা ভোগ ছাড়া বিকাশই যে অসম্ভব। শুধু ভোগ নয়, সম্ভোগ, সম্যক্‌রূপে ভোগ, রসিয়ে রসিয়ে, ভোগ্যবস্তুর মধ্যে যতখানি সম্পদ আছে তাকে পরিপূর্ণভাবে নিজের অভিজ্ঞতায় আত্মসাৎ করে। সেই ত' বিদগ্ধ সম্যক্‌ভোগে যে পারদর্শী। কনস্টান্‌টাইনের দানপত্রের ধাপ্পা ধরিয়ে দিয়ে যিনি অমর কীর্তি অর্জন করেন সেই লোরেঞ্জো ভালা তাই সম্ভোগতত্ত্বের উপরে একটা রীতিমত ডিস্‌কোর্স্ লিখে ফেললেন। (Lorenzo Valla, *The Donation of Constantine* ; *Pleasure and True Good*)। ভোগ্যবস্তু দেখলে যাদের মন ছিছি করে ওঠে, তারা ত' বেঁচেও বেঁচে নেই, তারা আবার বিকাশের কথা ভাববে কি করে। বিকৃত মনই শুধু আত্মনিপীড়নে বাহবার কারণ খুঁজে পায়। সুস্থ মনের পরিপুষ্টি সম্ভোগে।

আর সম্ভোগের জন্য অনুভূতিকে পরিশীলিত না করলে চলে না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে সম্ভোগের উপাদান সংগ্রহ করি। আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ যদি স্থূল হয় তবে সম্ভোগের উপাদানসম্ভারও দরিদ্র হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, সে ক্ষেত্রে সম্ভোগের অভিজ্ঞতাও দুর্বল এবং স্বল্পস্থায়ী হয়ে পড়ে। আমাদের অনুভূতি যত সূক্ষ্মতর হবে, ততই অস্তিত্বে সম্ভোগের বিচিত্রতর সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে পারব, আর ততই আমাদের

ভোগের অভিজ্ঞতা আরো গাঢ়ত্ব এবং স্থায়িত্ব অর্জন করবে। সম্ভোগ যে পরিশীলনসাপেক্ষ এদেশের বিদগ্ধজনেরা এককালে সেকথা খুব ভাল করেই জানতেন। কামসূত্রে উল্লিখিত চৌষট্টিকলায় তার প্রমাণ আছে। রূপের সঙ্গে রূপের, স্বরের সঙ্গে স্বরের, সুরার সঙ্গে সুরার, চুম্বনের সঙ্গে চুম্বনের, সুরতের সঙ্গে সুরতের যে বিচিত্র পার্থক্য সম্ভব অথবা বর্তমান, অনুভূতির পরিশীলন সে তত্ত্বে মনকে পারদর্শী করে তোলে। আর এই পারদর্শিতা শুধু সম্ভোগকেই সমৃদ্ধতর করে না, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের ক্ষেত্রকেও প্রসারিত করে দেয় এবং প্রকাশপ্রচেষ্টাকেও বলিষ্ঠতর করে তোলে।

অতঃপর মনের সুষমিত সমগ্রতা। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নানা রকমের বাসনা-প্রবৃত্তি ক্রিয়া করছে। এর একটির দাবী মেটাতে গেলে অনেক সময় অন্যগুলিকে অবহেলা করতে হয়; এমন কি অনেক সময় তাদের অবদমিত করারও প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কোনো মূলবৃত্তিকে স্থায়ীভাবে অবদমিত রাখা সম্ভব নয়: সে চেষ্টায় মনের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও বাসনার মধ্যে সৌষম্যসাধনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সম্ভোগের দ্বারা প্রতিটি মূল বৃত্তিকে তৃপ্ত করতে হবে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে এটিও দেখতে হবে যাতে একটির পুষ্টি অন্যগুলির শীর্ণতার কারণ না হয়। সেই সম্ভোগই শ্রেষ্ঠ সম্ভোগ যার ফলে বিভিন্ন বৃত্তির একই কালে পুষ্টি সাধন হয়, এবং এমনিতর সম্ভোগের ভিতর দিয়ে ব্যক্তির সত্তা সুমিত সমগ্রতা অর্জন করে। এই সমগ্রতা অবশ্য কোনো সময়েই সম্পূর্ণ নয়। নব নব সম্ভোগ এবং প্রকাশের ফলে তা পরিণতি থেকে সার্থকতর পরিণতির পথে অগ্রসর হয়: পরিণতির সবচাইতে প্রধান লক্ষণ এই সুমিত সমগ্রতা। সুমিত, কারণ কোনো বৃত্তিই অতি-প্রবল হয়ে অন্যদের আচ্ছন্ন করে নি। সমগ্র, কারণ এখানে বহুত্ব বিরোধকে অতিক্রম করে প্রাণময় ঐক্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

বুদ্ধি এবং জ্ঞানের কথা পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রকাশ বিকাশেরই বহিরঙ্গ। বিকাশের পথে বিচিত্র রূপে ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশিত করে। এটি সবচাইতে স্পষ্ট শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু শিল্পসাহিত্য ছাড়াও সাধারণভাবে জীবনের অন্য নানা ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যক্তিমন নিজের বিকাশকে ব্যক্ত করতে পারে। প্রকাশ ছাড়া বিকাশ অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন পরোক্ষ উপাদানকে বশে এনে ব্যক্তি আত্মপ্রকাশের নানা সম্ভাব্য রূপ উদ্ভাবন করে। প্রকাশ মাধ্যম-নির্ভর, এবং মাধ্যমের সার্থক প্রয়োগপদ্ধতির নাম প্রকাশরীতি।

প্রকাশরীতির চর্চা তাই ব্যক্তির বিকাশের পথে একান্ত প্রয়োজনীয়। মানবতন্ত্রী শিক্ষাদর্শে শিল্পকলার অনুশীলন যে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে, তার কারণ মানুষের অন্যসব ক্রিয়াকর্মের তুলনায় শিল্পকলার প্রকাশরীতি সবচাইতে বেশী সমৃদ্ধ ও পরিণত। রনেসাঁসের শিক্ষাব্রতীরা তাই বার বার ঘোষণা করেছেন যে ব্যক্তিকে প্রকাশক্ষম করে তোলা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য আমরা সম্প্রতিকালে প্রায় ভুলতে বসেছি। উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় তাই সৃষ্টিশীলতার চাইতে যান্ত্রিকতার লক্ষণ ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছে।

কিন্তু আপনাকে প্রকাশিত করার আগে আপনাকে ত' সমৃদ্ধ করা দরকার। তা না হলে সে প্রকাশের কতটুকু-বা মূল্য থাকবে। আত্মসমৃদ্ধির জন্য একদিকে চাই প্রকৃতির সঙ্গে ব্যাপক এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়, অন্যদিকে যত বেশীসংখ্যক মানুষ সম্ভব তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা। প্রকৃতির ঐশ্বর্য অফুরন্ত; তার কিছু-বা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে ছড়ানো রয়েছে, আর অনেকটাই রয়েছে লুকোনো, না-জানা। যা সামনে রয়েছে তাকে অন্তরে গ্রহণ করতে হবে; যা লুকোনো কি আজো অজানা, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। অজানাকে জানার জন্য মানুষ বার বার অভিযানে বেরিয়েছে। দুর্গম পর্বতচূড়া, অন্ধকার অরণ্যানী, দূরবিস্তৃত মরুভূমি, বরফে-মোড়া মেরুপ্রদেশ, গভীর সাগরতল, সীমাহীন আকাশ—কোনো কিছুকে সে অজানা থাকতে দেবে না। আর তারি সঙ্গে যা আপনা থেকেই সামনে পড়ে রয়েছে, তাকে আরো খুঁটিনাটি করে বুঝতে হবে। পায়ের নীচের ঐ অবহেলিত ঘাসফুলটির মধ্যে কত অজ্ঞাত তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। ক্ষেতের শস্য, গাছের ফল, রোদবৃষ্টি, পিঁপড়ে, প্রজাপতি, ধাতুপাথর, ধুলোহাওয়া, প্রত্যেকটি অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিকে আহ্বান করছে। সে আহ্বান জানার জন্য, ভোগ করার জন্য। নিজের নাভীকুণ্ডের দিকে স্থিরদৃষ্টি হয়ে বসে যোগাভ্যাস করলে কোনো মানুষ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি যার আগ্রহ নেই তার বিকাশ সঙ্কীর্ণ, তার প্রকাশ দরিদ্র।

লেওনার্দো তাঁর নোট বইতে লিখেছিলেন, "প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করাকে আমি আমার জীবনের ব্রত বলে জেনেছি।" *The Literary Works of Leonardo da Vinci*, ed. Jean Paul Richter)। অজানাকে জানবার অদম্য বাসনা কলম্বাস-এর মত আরো অনেককেই ঘরছাড়া

করেছিল। পেত্রার্কের "প্রকৃতির রূপ" গ্রন্থ থেকে জানা যায় বহির্জগতের নানা খুঁটিনাটি তিনি কত যত্নের সঙ্গেই না লক্ষ্য করেছেন। (Petrarch, *Aspects of Nature*)। এই আগ্রহের ফলে রনেসাঁসের যুগে নতুন করে ভূগোলবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়; উবর্তি এবং ঈনিআস সিলভিউস এদিকে পথ-প্রদর্শক। তাছাড়া জীবজন্তু, গ্রহনক্ষত্র, ইত্যাদি সম্বন্ধেও বিশদ অনুসন্ধান এইযুগে শুরু হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গতা এযুগের চিত্রকলায় বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। রনেসাঁসের প্রকৃতিপ্রীতি সম্বন্ধে সবচাইতে সুন্দর বর্ণনা আছে হুম্বোল্ট-এর বিখ্যাত গ্রন্থ "কস্‌মস্"-এর দ্বিতীয় খণ্ডে।

আর অপর মানুষের সঙ্গে যোগসাধন না ঘটলে আমরা ত প্রত্যেকে আজীবনকাল শুধু আপন আপন কক্ষেই ঘুরে মরতাম। অপরের অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করতে পারি বলেই না আমাদের আত্মবিকাশের কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডী নেই। প্রতি মানুষই অসামান্য, এবং প্রতি মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে অপর মানুষের মন নিজের সমৃদ্ধিসাধনের উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। প্রতি মানুষই যে স্বতন্ত্র এবং তাদের প্রত্যেককেই পৃথকভাবে বোঝা দরকার, মধ্যযুগের শেষভাগে দান্তের মহাকাব্যে এই বোধের প্রথম পূর্বাভাস চোখে পড়ে। বোকাচ্চিও, চসার থেকে শুরু করে শেক্সপীয়র পর্যন্ত রনেসাঁসের সাহিত্য এই বোধের আলোয় সমুজ্জল। রনেসাঁসের যুগে যে জীবনী এবং আত্মজীবনীর হিড়িক দেখা যায়, এই বোধ তার উৎস। এরি তাগিদে ঐযুগে শরীরবিজ্ঞানের চর্চা সুরু হয়। লেওনার্দোর নোটবইতে উল্লেখ আছে, তিনি দেহসম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করার জন্য গোপনে দশটি শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। মানুষ সম্বন্ধে তাঁর যে কি অক্লান্ত কৌতূহল ছিল এবং সে কৌতূহল পূরণের জন্য তিনি যে কি অমিত অধ্যবসায়ী, তাঁর অসংখ্য স্কেচগুলির মধ্যে তার প্রমাণ আছে। (এই সূত্রে E. MacCurdy, *The Mind of Leonardo da Vinci* দ্রষ্টব্য)।

রনেসাঁসের বহু পূর্বে টেরেন্স লিখেছিলেন, আমি মানুষ, সুতরাং মানুষ সংক্রান্ত কোনো কিছুই আমার অনাত্মীয় হতে পারে না। টেরেন্সের এই উক্তি মানবতন্ত্রী মনোভাবের অন্যতম মূল প্রত্যয়। জ্ঞানের দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সহযোগিতার দ্বারা যতবেশী সংখ্যক মানুষ সম্বন্ধে আমরা অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারব আমাদের মন মানবীয় উপাদানে ততই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে। প্রাচীন সংস্কৃতি-সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে আমরা অতীতকালের মানুষের সঙ্গে

আত্মীয়তা পাতাই; নানাদেশ ঘুরে আমরা নানাধরণের মানুষকে আপনার করি; শবব্যবচ্ছেদ করে আমরা মানুষের দেহের গঠন সম্বন্ধে বিচক্ষণ হই; সাধু, চোর, জ্ঞানী, মূর্খ, সুন্দর-কুৎসিত নির্বিশেষে বিচিত্র-প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে শুধু যে মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যথার্থতর হয়ে ওঠে তাই নয়, আমাদের নিজেদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিচিত্র সম্ভাবনা সার্থকতর রূপ পরিগ্রহ করে। এই অর্থে মানবতন্ত্র একই সঙ্গে বিশ্বমানবিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিশ্ব-মানবিক, কারণ দেশকাল জাতিবর্ণের কোনো প্রাচীর মানুষ সম্বন্ধে তার আগ্রহকে ব্যাহত করতে পারে না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কারণ তার সমস্ত প্রয়াসের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য ব্যক্তি-মানুষকে বিকশিত করা, কারণ ব্যক্তির বিকাশই তার বিচারে সার্থকতার একমাত্র মানদণ্ড।

॥ পাঁচ ॥

রনেসাঁসের ভিতর দিয়ে যে মানবতন্ত্রী জীবনবোধ প্রকাশ এবং বিকাশ লাভ করেছিল, এই হল মোটামুটি তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এ পরিচয়ের মধ্যে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে; তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার মনে করি। প্রথমত, মানবতন্ত্রের সব দিক এখানে উল্লেখ করা হয় নি; আমি শুধু কয়েকটি প্রধান সূত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছি। উল্লিখিত দিকগুলি ছাড়াও মানবতন্ত্রের আরো অনেক দিক আছে; এবং কেউ যদি আমার বর্ণনা থেকে মানবতন্ত্রের একটি পুরো ছবি পেয়েছেন মনে করেন, তবে তিনি মস্ত ভুল করবেন। দ্বিতীয়ত, মানবতন্ত্র কোনো একটা সুপরিকল্পিত দার্শনিক মত হিসেবে গড়ে ওঠে নি; রনেসাঁসের কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দল বা প্রতিষ্ঠান মানবতন্ত্রের বিভিন্ন প্রত্যয়গুলিকে ভেবেচিন্তে একটি সমগ্র মতবাদের মধ্যে গ্রথিত করেন নি। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে, ক্রিয়া-কলাপে এবং রচনায় এইসব প্রত্যয় ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ফলে রনেসাঁসের যুগে এমন অনেক মানবতন্ত্রী চোখে পড়ে যাঁরা মানবতন্ত্রের কোনো কোনো প্রত্যয়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, অথচ অন্য প্রত্যয়গুলি তাঁদের উপরে তেমন প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে নি। শুধু তাই নয়, পরিবেশে ও ব্যক্তিত্বের প্রভেদের ফলে এমনও দেখা যায় যে এক মানবতন্ত্রী এবং অন্য মানবতন্ত্রীর মধ্যে বহুক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিরোধ বর্তমান। যেমন ধরুন,

ফ্লরেন্সের মানবতন্ত্রীরা ঝোঁক দিয়েছেন শুধু মাত্র ব্যক্তির বুদ্ধি এবং অনুভূতির সূক্ষ্মতা সাধনের উপরে ; ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব তাঁরা একরকম অবহেলা করেছেন। অপরপক্ষে পাদুয়ার মানবতন্ত্রীরা বেশী জোর দিয়েছেন সহৃদয়তা গুণের উপরে ; তাঁদের মতে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধি বা সৌন্দর্যবোধ খুব সূক্ষ্ম না হলেও তাঁর ব্যবহারে যদি সংযম, দয়াদাক্ষিণ্য, সততা ইত্যাদি গুণ থাকে তবে তিনি আদর্শ নাগরিক। তেমনি এরাজ্‌মুস্‌ এবং মাকিয়াভেলির নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। আমি রনেসাঁসের মনীষীদের মধ্যে এই সব পার্থক্য অথবা বিরোধ নিয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করি নি। তৃতীয়ত, রনেসাঁসের সব মানবতন্ত্রী কিছু আর আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য থেকে মুক্তিলাভ করেন নি। তাঁদের অনেকেরই আচার-ব্যবহার-চিন্তার উপরে খৃস্টধর্মের প্রভাব কমবেশী বর্তমান। পিএত্রো পম্পনাজি, জিয়াকোমো জবারেলা, লোরেঞ্জো ভালা, লেওনার্দো, মাকিয়াভেলি, মঁতাইয় প্রমুখ কয়েকজনকে বাদ দিলে লোকায়ত দৃষ্টিসম্পন্ন মানবতন্ত্রী রনেসাঁসের যুগেও খুব বেশী মিলবে না। তবে একথাও সত্য যে রনেসাঁসের প্রায় কোনো মানবতন্ত্রীর মনেই আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য দৃঢ়মূল ছিল না ; এবং রনেসাঁসের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী যতই স্পষ্টতা অর্জন করেছে, আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য ততই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে এসেছে।

বর্তমান প্রবন্ধে রনেসাঁসী সাধনার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার এই ত্রিবিধ অসম্পূর্ণতা স্বীকার করে নিয়েও একথা বলা যায় যে উপরোক্ত বর্ণনা মোটামুটি যথার্থ ; এবং রনেসাঁসের তিন শতক ধরে আধুনিক সভ্যতার যে ভূমিকা রচিত হয়েছিল, এই বর্ণনার মধ্যে তার অধিকাংশ প্রধান সূত্রের পরিচয় মিলবে। এই সূত্রগুলি পরস্পরে মিলিত হওয়ার ফলে একটি সমগ্র জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল ; এবং যদিচ রনেসাঁসের পথকর্তারা সকলে এ বিষয়ে সমান সচেতন ছিলেন না, তবু একদিকে সেই জীবনদর্শন তাঁদের যুগকে মধ্যযুগ থেকে পৃথক করেছে, অন্যদিকে তাকে আশ্রয় করেই আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিবর্তন সম্ভবপর হয়েছে। এই জীবনদর্শনের ঊষাকালে তার এককণা আলো বৈজান্তীয়, রোমানেস্ক এবং গথিক প্রকাশরীতির ব্যূহ ভেদ করে চোদ্দ শতকের ইতালীয় শিল্পীর কল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছিল, আর তারপর তিনশ' বছরে কি রূপান্তরই না সাধিত হল ইয়োরোপের চিত্রকলায়। উচ্চেলো আনলেন পরিপ্রেক্ষিতবোধ, পোলেইউওলো

আনলেন নগ্ন মানবদেহের অঙ্গ-সংস্থানজ্ঞান; আর সেই বোধ, সেই জ্ঞান, সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যে সার্থক প্রকাশ পেল লেওনার্দো, মিকেলাঞ্জেলোর চিত্রে, ভাস্কর্যে। রনেসাঁসের শিল্পীরা বিভিন্ন রীতির সাধক; একই যুগে বাস করা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে স্থূল-সূক্ষ্ম বিচিত্র রকমের পার্থক্য বিদ্যমান। ভান আইক, মান্তেনা, বেলিনী, ডুয়েরার টিশিয়ান, রাফাএল, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ধারার শিল্পী। তবু এঁদের সকলের সাধনার মধ্যে একটি মূল ঐক্যের উপস্থিতি চোখে না পড়ে পারে না, এবং সে ঐক্য মানবতন্ত্রী জীবনবোধের। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ যে কত বিচিত্র, কত সুন্দর, মানুষের দেহমন যে কি অফুরন্ত রহস্যের আধার, এই মানবতন্ত্রী উপলব্ধি তাঁদের শিল্পকল্পনার অন্যতম মূল উৎস। এই জীবনদর্শন পেত্রার্ককে পূর্ববর্তী কবিদের থেকে পৃথক করেছে; এরি প্রেরণায় রনেসাঁসের সাহিত্যিকেরা ক্রমে লাতিনের আওতা ছেড়ে দেশজ ভাষায় লিখতে শিখেছেন; এরই বিস্ময়কর বহুমুখী প্রকাশ বোকাচ্চিওর দেকামেরন-এ, মাকিয়াভেলির প্রিন্স্-এ, কাস্তিলিওনের কোর্টিয়ার-এ, আরিওস্তোর অর্লান্দো ফুরিওসো কাব্যে, এরাজ্‌মুস-এর প্রেজ অব্‌ ফলি-তে, রাবলে-র গার্গাঁতুয়া ও পাঁতা-গ্রুয়েল্‌-এর আজব কাহিনীতে, মঁতাইয়-র প্রবন্ধাবলীতে, সের্ভান্তিস-এর ডন কিহোটে উপন্যাসে, শেক্সপীয়রের নাটকে এবং কবিতায়। রনেসাঁসের লিরিক কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, অর্থাৎ সাহিত্যের সব কটি প্রধান ক্ষেত্রই মানবতন্ত্রের কোনো না কোনো দিকের আলোতে উদ্ভাসিত।

রনেসাঁসের যুগে যাকে "বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব" বলা হত তার মধ্যে এ জীবনদর্শনের সার্থকতম রূপায়ণ দেখতে পাই। যে মানুষদের মধ্যে এই বৈশ্বিকতা স্ফুরিত হয়েছিল তাঁরা ছিলেন একই সঙ্গে কবি, চিত্রকর, সুরজ্ঞ, ভাস্কর, আইনবিশারদ, পদার্থবিদ্‌, রাসায়নিক, ব্যায়ামকৌশলী, যোদ্ধা, এবং খাদ্য, সুরা ও সম্ভোগশাস্ত্রে সুরসিক। অর্থাৎ জীবনের প্রায় এমন কোনো দিক ছিল না যার এঁরা অনুশীলন করেন নি এবং অনুশীলনের ফলে যেদিকে এঁরা পারদর্শী হন নি। প্রতি মানুষের মধ্যে যে কত সম্ভাবনা নিহিত আছে, এঁদের সার্থকান্বিত জীবন তারি প্রমাণ। বুর্কহার্ট এমনি বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বের উদাহরণ হিসেবে লেওন বাতিস্তা আলবর্তি-র নাম উল্লেখ করেছেন। আলবর্তি-তে যে বিকাশের সূচনা তারই সুপরিণত প্রকাশ লেওনার্দো দা ভিঞ্চির ব্যক্তিত্বে। লেওনার্দোর প্রতিভার তুলনা

নেই; কিন্তু যে বৈশ্বিকতা সে প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, রনেসাঁসের যুগে আরো অনেকের মধ্যেই তা কমবেশী বিকশিত হয়েছিল।

রনেসাঁসের তিনশ' বছর ধরে পশ্চিম ইয়োরোপে যে জীবনবোধ জেগে উঠেছিল, পরবর্তী কালে তা নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, এবং ইয়োরোপের বাইরেও প্রসার লাভ করেছে। এই বিবর্ধন এবং সম্প্রসারণের পথে গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিজ্ঞান এবং যন্ত্রশিল্প, আধুনিক শিল্পকলা এবং সাহিত্য, শিক্ষাপদ্ধতি এবং নীতিবোধ—এক কথায় আধুনিক সমাজ এবং সংস্কৃতি। গোয়েটের জীবনশিল্প এই সাধনারই প্রতিচ্ছবি। ফরাসী এনসাইক্লোপেডিস্ট এবং ইংরেজ র‍্যাডিক্যালদের আন্দোলন এই বোধের দ্বারাই মুখ্যত উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। (এই প্রসঙ্গে কাসিরার-এর *The Philosophy of the Enlightenment* মহাগ্রন্থ কৌতূহলী জনের অবশ্যপাঠ্য) ইংরেজের সূত্রে রনেসাঁসী জীবনবোধ কিছুটা কুশিত অবস্থায় এদেশে আসে। বাঙালী ভাবুকদের মধ্যে রামমোহন, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ অনেকে এই বোধের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে আমাদের দীর্ঘদিনের মানসিক জড়ত্ব অপহৃত হয়ে সাংস্কৃতিক জীবন আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ফলত আধুনিক সভ্যতার অন্তরে যে মহৎ প্রতিশ্রুতি বর্তমান তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে এই জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস শুধু রনেসাঁসী সাধনার বিবর্ধনের ইতিহাস নয়। সে সাধনা পদে পদে ব্যাহত হয়েছে, সে জীবনবোধের বিকাশ এবং বিস্তারের পথে বহু দুস্তর প্রতিবন্ধক দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ মানুষের মন আজও মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের দ্বারা আচ্ছন্ন। বুদ্ধির চাইতে অভ্যাসাশ্রয়ীতা, জ্ঞানের চাইতে অন্ধভক্তি আজো তাদের জীবনে বেশী প্রভাবশীল। নিজের ভাগ্যরচনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবার প্রত্যয় আজো তারা অর্জন করে নি। মানুষের জড়বুদ্ধি আজো আধ্যাত্মিকতার মুখোশের আড়াল থেকে বহু মানুষের জীবন পরিচালিত করছে। তাছাড়া শিল্পসাহিত্য এবং পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রনেসাঁসী সাধনা বহুদূর অগ্রসর হলেও সমাজসংগঠনের ক্ষেত্রে সে সাধনা আজো যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে নি। কিছুটা সুফল অবশ্যই ফলেছে; বিস্তর গলদ আজো রয়ে গেছে। এসব গলদের কিছুবা অতি প্রাচীন, কিছু আধুনিক সভ্যতার নিজেরই সৃষ্টি।

ধর্মান্ধতা, জাতীয়তা, সাম্রাজ্যতন্ত্র, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকের ফলে মানবতন্ত্র আজো একটি বিশ্বমানবীয় সভ্যতায় সার্থক হয়ে উঠতে পারল না। তাছাড়া গত একশ' দেড়শ' বছরের মধ্যে নতুন দুটি বাধা অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। একদিকে যন্ত্রের দ্রুত প্রসারের ফলে মানুষের জীবন অত্যন্ত যন্ত্রনির্ভর এবং মানুষের মন মারাত্মক ভাবে যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। যান্ত্রিকতার ফলে মানুষের প্রাতিস্বিক সত্তায় ভাঙন দেখা দিয়েছে; তার বুদ্ধি, মুক্তিস্পৃহা এবং সৃষ্টিক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে আসছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক জীবনে জনতার অংশ ক্রমেই স্বীকৃত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের হাতে সমাজ-জীবনের অধিকাংশ শক্তি এবং দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। তার ফলে একদিকে ব্যক্তির সামর্থ্য যত কমে আসছে, যূথবৃত্তি ততই প্রবলতর হয়ে উঠছে, আর রাষ্ট্রের ক্ষমতা তত বেড়ে চলেছে। এই দুইধারার মিলন থেকে জন্ম নিয়েছে এ শতাব্দীর সার্বিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার অর্থ মানবতন্ত্রী সাধনার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন। অথচ মানবতন্ত্রী সাধনার সার্থকতার জন্য যন্ত্রের প্রসার এবং সর্বসাধারণের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যন্ত্র অথবা জনসাধারণ কোনোটি থেকে মুখ ফেরালে মানবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। মানুষের বিকাশের জন্য যন্ত্রকে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যন্ত্রপাতি যেন মানুষের প্রভু না হয়ে ওঠে, মানুষের মন যাতে যান্ত্রিক না হয়। তেমনি সমাজ-জীবনে সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই প্রতিষ্ঠার পথে রাষ্ট্র বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রচুর শক্তির যেন কেন্দ্রীকরণ না ঘটে, ব্যক্তিসত্তা যেন যূথসত্তার মধ্যে বিলুপ্ত না হয়। রনেসাঁসের আজ যাঁরা উত্তর-সাধক এ সমস্যার সমাধান তাঁদেরই ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সে দায়িত্ব যদি তাঁরা পালন করতে পারেন, তবে ভবিষ্যৎ কালে ঐতিহাসিকেরা বিংশ শতাব্দীকে এক অভিনব বিশ্বব্যাপী রনেসাঁসের সূচনাকাল বলে স্মরণ করবেন। আর তা যদি তাঁরা না পারেন, তবে পৃথিবীতে এমন এক অন্ধকার যুগ দেখা দেবে, অতীতে যার তুলনা মেলা কঠিন এবং যার সমাপ্তি যে কবে বা কোথায় আজ তা কল্পনা করাও প্রায় অসম্ভব।

উইলিয়ম ব্লেকের ছবির জগৎ

The Enquiry in England is not whether a Man has Talents and Genius, But whether he is Passive and Polite and a Virtuous Ass and obedient to Noblemen's Opinions in Art and Science. If he is, he is a Good Man! If Not, he must be starved……

Poetry and Prose of William Blake, Ed. Geoffrey Keynes, পৃ: ৭৭৯ ॥

……I am under the direction of Messengers from Heaven, Daily and Nightly ; but the nature of such things is not, as some suppose, without trouble or care. Temptations are on the right hand and left ; behind, the sea of time and space roars and follows swiftly ; he who keeps not right onward is lost, and if our footsteps slide in clay, how can we do otherwise than fear and tremble ?

টমাস বাট্‌স্‌-কে লেখা ব্লেকের চিঠি, ১৮০২। ঐ, পৃ: ৮৫৫ ॥

জীবদ্দশায় ব্লেকের প্রতিভা তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে কোনো স্বীকৃতি পায় নি। এবং যদিচ ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে রোমান্টিক যুগের প্রবর্তক হিসেবে পরবর্তীকালে তিনি কিছুটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তবু তাঁর গ্রন্থাবলীর একটা বড় অংশ আজও সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য। অন্যদিকে বিলেতি চিত্রশিল্পের ইতিহাসে কিছুদিন আগে পর্যন্তও তিনি ছিলেন অপাংক্তেয়। ওয়াল্‌টার আর্মস্ট্রং তাঁর "আর্ট ইন গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড" কেতাবে কিম্বা উইলিয়ম অর্পেন তাঁর "আউটলাইন অব্‌ আর্ট" গ্রন্থে ব্লেকের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। অথচ সম্ভবত শেক্সপীয়র, মিলটন, ব্রাউনিং এবং ইয়েট্‌সকে বাদ দিলে ব্লেকের সঙ্গে তুলনীয় কবি-প্রতিভা ইংরেজি সাহিত্যেও দুর্লভ। এবং পশ্চিমের সেরা ছবি-আঁকিয়েদের

তালিকায় যে তিন জন ইংরেজ যায়গা দাবী করতে পারেন, তাঁরা হচ্ছেন হোগার্থ, ব্লেক এবং টার্নার।

ব্লেকের কল্পজগৎ প্রবলভাবে প্রাতিস্বিক। আমি আকৈশোর তাঁর কবিতার অনুরাগী। কিন্তু তাঁর অঙ্কন প্রতিভাও যে কত অসামান্য তার পরিচয় মেলার প্রথম সুযোগ ঘটে বছর পনের আগে: ব্লেকের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। সার্থক শিল্পকর্মে প্রাতিস্বিকতা যে বৈশ্বিকতার উৎস, মুগ্ধ চিন্ময়ে আবার তা অনুভব করি।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর এক অতি গরিব কারিগরের ঘরে ব্লেকের জন্ম।[১] এদিক থেকে তাঁকে অবশ্য অনন্য বলা চলে না। হোগার্থের বাবা ছিলেন পাঠশালার মাস্টার; টার্ণারের বাবা ছিলেন নাপিত। ছেলেবয়েস থেকেই বাস্তব জগতের চাইতে কল্পনার জগৎ তাঁর কাছে বেশী সত্য বলে ঠেকত। গল্প আছে, চার বছর বয়সে ঘরের জানলায় ঈশ্বরের মুখ প্রত্যক্ষ করে শিশু ব্লেক ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। গাছের ডাল থেকে দেবদূতরা নাকি তার সঙ্গে গল্প করত, মাঠে তার সঙ্গী হত আদ্যিকালের এজেকিএল, আইসায়া। শেষদিন পর্যন্ত শরীরী স্ত্রী-পুরুষদের চাইতে দেবদূত, প্রেত, প্রফেট এবং স্বকপোলকল্পিত চরিত্ররাই ছিল ব্লেকের কাছে অনেক বেশী প্রত্যক্ষ। গরীব বাপের সাধ ছিল ছেলেকে আঁকার ইস্কুলে পাঠান, কিন্তু সাধ্যে কুলোয় নি। তখনকার ইংল্যাণ্ডে গরিবঘরের ছেলেমেয়ের সাধারণ লেখাপড়ারও বিশেষ সুযোগ ছিল না। চৌদ্দ বছর বয়সে ব্লেক এক এনগ্রেভারের অ্যাপ্রেন্টিস নিযুক্ত হন। সাত বছর কাটে শিক্ষানবিশীতে। তারপর নিজেই এনগ্রেভিং এবং ছাপাখানার দোকান খুলে বসেন। একাজ থেকেই এই কবি-শিল্পীকে সারাজীবন জীবিকা উপার্জন করতে হয়েছে। আর কী সে উপার্জন! এনগ্রেভিং করে, অন্যের বই চিত্রণ অলঙ্করণ করে, ছবি ছেপে, বই বাঁধিয়ে বছরের পর বছর ব্লেকের গড়পড়তা সাপ্তাহিক আয় দশ শিলিং-এর উপরে ওঠে নি। বিলেতে সেটা যন্ত্রশিল্পের যুগ; প্রগতির দাম উসুল হচ্ছিল কারিগরদের উপর দিয়ে। ছবি-আঁকিয়ে হিসেবে ব্লেকের পক্ষে স্বীকৃতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না; ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর

১। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

ছবির যে প্রদর্শনী করেন, তার খরচা পর্যন্ত তুলতে পারেন নি। অথচ যন্ত্রশিল্পের প্রসারের চাপে কারুশিল্পীদের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। ফলে সারা জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগস্ট ব্লেক যখন মারা গেলেন, তখন এই অমর শিল্পীর দেহ আর তিনজন নিঃসম্বল ভিখিরির শবের সঙ্গে একত্রে কবর দেওয়া হোল। কবরের পাথরে নাম লেখার পয়সা না জোটায় তাঁর সমাধিক্ষেত্র আজও নাকি অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

কিন্তু সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যে বঞ্চিত হলেও ব্লেক অসুখী ছিলেন না। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি এক মালীর নিরক্ষর মেয়ে ক্যাথরিন সোফিয়া বুচারকে বিয়ে করেন। তাঁকে তিনি নিজে লেখাপড়া শেখান। পরে ক্যাথরিন স্বামীর পাণ্ডুলিপি কপি করতেন, তাঁর ছবিতে রং লাগাতে শিখেছিলেন, ব্লেকের প্রতিকৃতিও তিনি এঁকেছিলেন, এমনকি স্বামীর রহস্যময় কল্পলোকে বিচরণ করার সামর্থ্যও নাকি তাঁর জন্মেছিল। স্বামীকে তিনি সন্তান উপহার দিতে পারেন নি। কিন্তু ইয়েট্সের ভাষায় সে অভাব তিনি ভরে দিয়েছিলেন সীমাহীন প্রেমে, ত্রুটিহীন বন্ধুত্বে। ("She repaid her husband for the lack of childish voices by a love that knew no limit and a friendship that knew no flaw.")। কখনো কখনো ঘুম থেকে উঠে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন পনেরো বিশ ক্রোশ পথ। পথে যা জোটে খেয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন রাতে তারার আলোয় পথ দেখে। মাঝরাতে স্বামীর খেয়াল মাফিক বিছানা ছেড়ে উঠে হাত ধরাধরি করে দুজনে বসে থাকতেন ভোরের আলোর প্রতীক্ষায়। কখনো-বা আদম ইভ হয়ে দুজনে গিয়ে বসতেন বাড়ির পিছনের বাগানে; তাঁদের নিষ্পাপ নগ্নতাকে সর্পবেশী শয়তান জ্ঞানবৃক্ষের আপেল ফল খাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করত।

ধৈর্যশীলা সহৃদয়া সহধর্মিণীর প্রশ্রয়ে অর্ধোন্মাদ শিল্পী দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন সাধনায় গড়ে তুলেছিলেন তাঁর কল্পনার জগৎ। গল্পে আছে, ব্রহ্মার উপরে অভিমান করে বিশ্বামিত্র আলাদা এক নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু পর্যাপ্ত যোগবল না থাকায় সে জগৎ শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি। ব্লেকও তাঁর সমাজ পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বকপোলকল্পিত রূপের জগতে। রেখা, রং এবং ব্যঞ্জিত বাক্যের উর্ণায় বোনা সে-জগৎ সময়ের স্পর্শে ম্লান না হয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। তার কারণ, সামাজিক-

বিধিনিষেধের-চাপে-বিশীর্ণ, প্রথাবদ্ধ, হিসেবী-বুদ্ধির-পরামর্শে-সঙ্কুচিত, মানবীয় অস্তিত্বকে ব্লেক দুর্জয় সাহসে মুক্তি দিতে পেরেছিলেন আদিম এবং নিত্য, প্রাতিস্বিক অথচ সর্বজনীন, প্রবৃত্তি-পরিচালিত স্বপ্নের নির্দিগন্ত আকাশে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে স্যুররেয়ালিস্ত আন্দোলন গড়ে ওঠবার প্রায় সোয়াশো বছর আগে বেনের দেশ বিলেতের রাজধানীতে বসে এই অবজ্ঞাত শিল্পী ঐ আন্দোলনের মূল প্রত্যয়টিকে শিল্পরূপে যে ভাবে অভিব্যক্ত করেছিলেন, তাঁর অতিপ্রাকৃততন্ত্রী উত্তরসাধকদের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই সে সার্থকতার কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছেন।

॥ দুই ॥

ব্লেকের মুক্তিস্পৃহায় কোন খাদ ছিল না। কিন্তু ফাঁক ছিল তাঁর মননে, তাঁর শিল্পকর্মে, তাঁর উপাদান সংগ্রহে। শিল্পী হিসেবে তাঁর ত্রুটি স্পষ্ট। পূর্বসূরীদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে অল্প কথার মধ্যে অনেকখানি অর্থ সঞ্চারিত করার বৈদগ্ধ্য তাঁর রচনায় দুর্লভ। লিরিক কবি হিসেবে তিনি অসামান্য, কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে লিরিকের অংশ আর কতটুকু। প্রফেসি, দীর্ঘকাব্য, নাটক, সব মিলিয়ে তাঁর লেখার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সংযমের অভাবে ব্যঞ্জনা বাগ্মিতায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মুখোসের আড়ালে কবি ব্লেকের মুখ অনেক সময় আর নজরে আসে না। তাছাড়া যেসব প্রতীকের মারফৎ তিনি তাঁর ভাবনা-অভিজ্ঞতা-আবেগরাজিকে রূপ দিয়েছেন, তারা তাঁর কল্পনায় প্রত্যক্ষ হলেও অধিকাংশ পাঠকের কাছে তাদের অর্থ পণ্ডিতদের বিস্তর টীকা ভাষ্য সত্ত্বেও আজো অনেকটা অনধিগম্য। তাঁর ব্যবহৃত বেশীর ভাগ প্রতীকই পূর্বসূরী মিস্টিকদের কাছ থেকে পাওয়া।[২] কিন্তু তাঁর কল্পনায় তারা যে অর্থের ধারক এবং বাহক, তা প্রায়শই অনতিক্রম্যভাবে ব্যক্তিগত। এমন কি সন্দেহ করা যায় যে একই প্রতীকের অর্থ রচনা থেকে রচনায় পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে ব্লেক-ভক্ত এ. ই. হাউসম্যানকে বলতে হয়েছে যে

২। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

ব্লেকের কবিতায় অর্থভেদ নিষ্প্রয়োজন ; শুধু কান পেতে তাঁর দিব্য সুর শোনাই রসিক পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট। ("Blake's meaning is often unimportant or virtually non-existent, so that we can listen with all our hearing to his celestial tune.")।[৩]

অপরপক্ষে ছবি আঁকতে গিয়ে ব্লেক বহির্জগত থেকে উপাদান আহরণের পন্থাকে সযত্নে বর্জন করেছিলেন। প্রকৃতি, তাঁর মতে, শয়তানের সৃষ্টি। প্রাকৃতিক রূপের অনুসন্ধান আমার কল্পনাকে দুর্বল, নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ("Nature is the work of the Devil!" "Natural objects always did and now do weaken, deaden and obliterate imagination in Me.")[৪] তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমকালীন ইংরেজ ছবি-আঁকিয়েদের রীতিকে তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। (বিশেষ করে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রয়্যাল অ্যাকাডেমির সভাপতি যোশুয়া রেনল্ড্‌স্‌কে)। অথচ অন্য দেশের অথবা কালের সেরা আঁকিয়েদের কাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল সামান্য। যেটুকু বা পরিচয় ছিল, তাও প্রায় ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে নয়, কপির সঙ্গে। এই স্বল্পজ্ঞানের উপরে নির্ভর করে তিনি টিশিয়ানকে গাল পেড়েছেন 'ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র অনুকারক' বলে। উক্ত মহাশিল্পীর পুরুষেরা নাকি 'চামড়ার তৈরী' আর মেয়েরা 'খড়িমাটির'। পূর্বসূরীদের মধ্যে এক মিকেলাঞ্জেলোকে তিনি গুরু হিসেবে স্বীকার করতেন। কিন্তু এনগ্রেভিং-এর কাজে ব্লেকের যতই দক্ষতা থাক, মিকেলাঞ্জেলোর মত তীক্ষ্ণ বলিষ্ঠ রেখায় প্রাণময় ত্রিবেধরূপ সৃষ্টির রহস্য তিনি ভেদ করতে পারেন নি। তাঁর অঙ্কনশৈলী এবং উদ্ভাবনী শক্তির মধ্যে তাই অনেক সময়েই মস্ত ফারাক রয়ে গেছে।

এসব অভিযোগ সঙ্গত। তা সত্ত্বেও ব্লেক যে মহৎ কবি এবং অসামান্য চিত্রকর এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। ওয়র্ডসওয়র্থ ব্লেককে বলেছিলেন পাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, "এই মানুষটির পাগলামি স্কট কিংবা বায়রণের বিচক্ষণতার চাইতে আমাদের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে।" ব্লেক যে-অতিপ্রাকৃত লোকে বিশ্বাস করতেন, মানবীয় কল্পনার বাইরে তার কোন অস্তিত্ব আছে, একথা ভাবার স্বপক্ষে যুক্তি দেখি না। কিন্তু ব্লেক সেই জাতের দুর্লভ মানুষ, যাঁদের কাছে কল্পনার জগৎ

৩। প্রবন্ধের শেষে টীকা।
৪। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

প্রাকৃতিক জগতের চাইতে অনেক বেশী প্রত্যক্ষতা অর্জন করেছিল। এবং কাবালা, বোএম্ কিংবা স্বেডেনবর্গের গুহ্যতত্ত্ব থেকে প্রতীকের উপাদান সংগ্রহ করলেও ব্লেকের কল্পনার মূল উৎস ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতিবোধ, ঐকান্তিক আবেগ এবং অলজ্জ প্রবৃত্তি। ফলে তাঁর প্রতীকের অর্থভেদ আমরা করতে পারি বা না পারি, তাদের আড়ালে এই উৎসের প্রবল অস্তিত্ব প্রাত্যহিক অভ্যাসের জড়তাকে ভেদ করে আমাদের চৈতন্যের মূলে ধাক্কা মারে।

॥ তিন ॥

ব্লেক কল্পনাকে দুই জাতে ভাগ করেছিলেন। গ্রিসিয়ান আর গথিক। তাঁর মতে গ্রিসিয়ান মন গাণিতিক রূপের সাধক: যুক্তিধর্মী স্মৃতির মধ্যে এ রূপ নিত্যতা লাভ করে। অন্যদিকে জৈব রূপ বা শাশ্বত অস্তিত্বের সাধনা গথিকের বৈশিষ্ট্য। ("Greecian is Mathematic Form: Gothic is Living Form. Mathematic Form is eternal in the Reasoning Memory: Living Form is Eternal Existence.")। এ বিভাগ কতখানি সঙ্গত, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে; কিন্তু ব্লেক গথিককেই তাঁর আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য গথিক শিল্পরীতির সঙ্গে ব্যাপক পরিচয়ের সুযোগ তাঁর ঘটে নি। এবিষয়ে যেটুকু তাঁর জ্ঞান তা প্রধানত ওয়েস্ট-মিনস্টার অ্যাবি এবং অন্য কয়েকটি প্রাচীন বিলেতি গির্জা থেকেই আহৃত। গথিক বলতে তিনি বুঝেছিলেন সেই শিল্পরীতি যা প্রকৃতির অনুকরণ ছেড়ে ধ্যানের দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ রূপ সৃষ্টি করে, যা সমতল পটের ছবিতে বেধের ইঙ্গিত আনার প্রয়াস না পেয়ে রেখার দৃঢ় বন্ধনের মধ্যে প্রাণের প্রোজ্জ্বলতা এবং গতি সঞ্চারে উদ্যোগী, যা রং-এর সঙ্গে রং মেশানো আলোক-আঁধারির আকর্ষণ এড়িয়ে বিশুদ্ধ বর্ণের সমাবেশে ব্যঞ্জনা সৃজনে সক্ষম। ব্লেকের সেরা ছবিগুলি এই রীতিতেই আঁকা। ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত শিল্পসম্ভারের মধ্যে অ্যাসিরিয়া এবং ব্যাবিলনের আইকনগ্রাফির সঙ্গে ব্লেকের শিল্পরীতির সবচাইতে বেশী মিল চোখে পড়ে। এদের মত ব্লেকের ছবিতেও বিশ্বপ্রকৃতি মানবরূপকে আশ্রয় করেই শিল্পীর কল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে। অঙ্গসংস্থান বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি-সামান্য; মডেল সামনে রেখে আঁকতে

তিনি শেখেননি ; তাঁর অধিকাংশ ছবিই হল কোন-না কোন কাহিনীকে রং-এ এবং রেখায় প্রত্যক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে আঁকা। ফলে শিল্পী হিসেবে ব্লেকের ত্রুটি বিস্তর। কিন্তু সব ত্রুটি ছাপিয়ে যেখানে তিনি অসামান্য, তা হল তাঁর রেখার ছন্দময়তায়, তাঁর বর্ণবিন্যাসের দীপ্তিতে, এবং সবচাইতে যা বড়, তাঁর কল্পনার ক্লান্তিহীন প্রাবল্যে। ছবির মধ্য দিয়ে যে জগৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার প্রাণৈশ্বর্যে অভিভূত না হয়ে উপায় নেই। বাহ্যরূপের অনুকরণ নয়, মননের স্পষ্টতা নয়, প্রাণশক্তির উৎক্ষেপ তাঁর সেরা ছবি এবং সেরা লিরিকের উৎস। এই উৎক্ষেপ তাঁর আঁকা গাছ, পাহাড়, সমুদ্র, দেবতা, নারী, প্রতিটি আকৃতিতে ছন্দের সঞ্চার করেছে। উল্লাস এবং আতঙ্ক, করুণা এবং জিঘাংসা, প্রেম এবং ঘৃণা—আদিম অসংস্কৃত প্রাবল্যে স্ফুরিত হয়েছে তাঁর ছবির জগতে। মিকেলাঞ্জেলোর প্রজ্ঞা এবং কলানৈপুণ্য তাঁর ছিল না, কিন্তু কল্পনার এই নৈসর্গিক গতিশীলতায় তিনি তাঁর-ই আত্মীয়। অন্তত "বুক অব জব"এর জন্য করা তাঁর এনগ্রেভিং এবং "ডিভাইন কমেডির" জন্য আঁকা তাঁর রঙিন ছবিগুলি দেখলে এ আত্মীয়তা বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

বিলেতি চিত্রশিল্পের ইতিহাসে ব্লেক একক পুরুষ। প্রাচীন কেল্টিক এবং মধ্যযুগীয় অ্যাংলো-স্যাক্সন শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল আছে। কিন্তু ব্লেকের তীব্রতা, গতি বা প্যাশনের সন্ধান পূর্বোক্তদের ক্ষেত্রে দুর্লভ। রনেসাঁসের পর থেকে বিলেতী চিত্রকলা নিজের স্বকীয়তা হারাতে শুরু করে। হলবেইন, রুবেনস, ভান ডাইক প্রমুখ বিদেশী শিল্পীদের প্রতিপত্তির চাপে দেশী চিত্রকরেরা ক্রমেই নিজেদের আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেলেন। তাদের শিল্পচর্চা অন্যদের অনুকরণে পর্যবসিত হয়। এ অবস্থা থেকে বিলেতী চিত্রশিল্পকে উদ্ধার করলেন হোগার্থ। হোগার্থও ব্লেকের মত প্রকৃতি থেকে অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। ব্লেক এই বিরোধকে নিয়ে গেলেন তার ন্যায়সঙ্গত পরিণতিতে : সিম্বলিস্ট চিত্রকলার তিনিই জনক। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রতীকবাদীর প্রতীক একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। প্রাকৃতিক জগতের বিচিত্র রূপের মত সে প্রতীক যদি তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ না হয়ে ওঠে, তাহলে রেখা রঙের মধ্যে তার যে প্রকাশ তাতে প্রাণসঞ্চার ঘটে না। ব্লেকের কল্পনায় প্রতীক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের প্রত্যক্ষতা অর্জন করেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ ইংরেজী ঐতিহ্যে তিনি ব্যতিক্রমমাত্র। ব্রিটিশ মিউজিয়মে এবং পরে ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট

মিউজিয়মে ব্লেক এবং তাঁর সমকালীন ও উত্তরসাধক শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনী দেখে ব্লেকের অনন্যতা বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না। ফ্লেমিংর রেখাঙ্কনের হাত ব্লেকের চাইতে পাকা, কিন্তু ব্লেকের প্রোজ্জ্বল, স্বতঃসিদ্ধ কল্পনায় তিনি একেবারেই বঞ্চিত। এই কল্পনার কিছুটা আভাস মেলে স্যামুয়েল পামারের ছবিতে। সম্প্রতি কালে পামারের উত্তরসাধক জন ন্যাশ এবং গ্র্যাহাম সাদারল্যাণ্ড ইংরেজী চিত্র শিল্পে ব্লেকের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়মে ব্লেকের ছবির পাশেই এঁদের ছবির প্রদর্শনী দেখে এ চেষ্টার সার্থকতা বিষয়ে আমি অন্তত খুব উৎসাহিত বোধ করি নি। অন্য ক্ষেত্র থেকে একটা উদাহরণ দিলে আমার নিরুৎসাহের কারণটা হয়ত একটু স্পষ্টতর হবে। তফাৎ যেন মেঘনাদবধ কাব্যের সঙ্গে বৃত্রসংহার কাব্যের, অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গে রচনার।

শিল্পী হিসেবে ব্লেকের যদি উত্তরসাধক খুঁজতেই হয়, তবে বিলেতের চাইতে কন্টিনেন্টে সে সন্ধান সার্থক হবার সম্ভাবনা বেশী। বিশুদ্ধ এবং মিশ্রণবিমুখ বর্ণ প্রয়োগের দিক থেকে ব্লেককে হয়ত ফোভিস্ত্‌দের পূর্বসূরী বলা চলে। প্রাণময় কিন্তু বেধহীন রেখাধৃত রূপসৃষ্টিতে তিনি মাতিসের আত্মীয়। সুররেয়ালিস্ত্‌দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তাঁর সবচাইতে বেশী মিল সম্ভবত আধুনিক এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রকরদের সঙ্গে। জৈবরূপের অনুকরণ না হয়েও জীবন্ত, নিসর্গের প্রতিফলনে পরাঙ্মুখ হয়েও নৈসর্গিক, রহস্যময় অবচেতনের গুহা থেকে উৎসারিত হয়েও সূর্যকরোজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ রেখার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও গতিশীল—ব্লেকের ছবি প্রাচীন অ্যাসিরিয়ান-ব্যাবিলোনিয়ান শিল্প-কল্পনা এবং নব্য এক্সপ্রেশনিস্টদের রীতির মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে।

॥ চার ॥

ব্লেক লিখেছিলেন, আমার কাজ সৃষ্টি করা। আমি অন্যের সৃষ্ট জগতের দাস হতে চাই না, নিজের আত্মসম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করতে চাই। প্রাণ এবং প্রেরণা যাতে শুকিয়ে না যায় সেই উদ্দেশ্যেই ত আমার এই দিনরাত পরিশ্রম। ("I labour Day and Night that Enthusiasm and Life may not cease. I must create a system, or be enslaved by

another man's. My business is to create.")। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, প্রকৃতি যেসব রূপ সৃষ্টি করে, মনের সৃজিত রূপ তার চাইতে অনেক বেশী বলিষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন, গতিশীল। ("Is it not reasonable to suppose that one can create by the workings of the mind forms stronger, clearer and more moving than any thing produced by Nature?")। একথার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, বিপদের সম্ভাবনা বোধ হয় তার চাইতে কম নেই। মন ত শূন্য থেকে সৃষ্টি করে না, প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই মনকে কাজ করতে হয়। প্রকৃতির প্রতি যে-কল্পনা উদাসীন, একদিকে পুষ্টির অভাবে তা যেমন শীর্ণ হয়ে আসে অন্যদিকে তার কল্পিত রূপে অসংলগ্নতা দেখা দেবার আশঙ্কা খুব বেশী। স্বতঃসিদ্ধতার অহঙ্কারে সে কল্পনা হয়ত লক্ষ্য করে না যে তার সৃজিত রূপ সংখ্যায় স্বল্প এবং বৈচিত্র্যে দরিদ্র। প্রকৃতি থেকে উপাদান আহরণের অভাবে সে কল্পজগতে রূপের পুনরাবৃত্তি এড়ানো কঠিন। অপরপক্ষে প্রকৃতির সম্বন্ধযুত জগৎকে উপেক্ষা করার ফলে সেই কল্পিত রূপের গঠনে সৌষম্য এবং অর্থগ্রাহ্যতা প্রায়শই দুর্লভ হয়ে ওঠে। এসব কারণেই অধিকাংশ সিম্বলিস্ট শিল্পপ্রচেষ্টা হয় কিছুটা এগিয়ে থমকে গেছে, আর নয়ত পাগলামির গোলকধাঁধায় পথ হারিয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতিবোধ হল এরিয়াড্‌নির সেই সুতো গ্রীক পুরাকাহিনী-কথিত মিনটোরকে জয় করার পর শিল্পী থিসিয়ুস যা অবলম্বন করে অন্ধকার গুহা থেকে আবার বেরিয়ে আসতে পারেন।

ব্লেক বহিঃপ্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে অন্তঃপ্রকৃতিকেই শিল্পের একমাত্র উৎস এবং উপজীব্য ঠাউরেছিলেন। আমার বিশ্বাস, শিল্পী হিসেবে তার জন্য তাঁর কম ক্ষতি হয় নি। তা সত্ত্বেও যে তাঁর বেশ কিছু কবিতা এবং অনেক ছবি সিম্বলিস্টদের বিভ্রান্তি এড়িয়ে সৎ শিল্পের সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছে, তার কারণ অন্তঃপ্রকৃতির উদ্‌ঘাটন ব্যাপারে তাঁর মনে কিছুমাত্র দ্বিধাসঙ্কোচ ছিল না। এই নির্ভীক সততা হয়ত তাঁকে পাগলামির দিকে টেনে নিয়ে গেছে, কিন্তু কখনোই নির্বীর্য অভ্যাসাশ্রয়িতার সঙ্গে রফা করতে দেয় নি। ফলে তাঁর শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে আমার মত সংশয়ী ব্যক্তির পক্ষেও ব্লেকের সৃষ্টির সান্নিধ্যে এসে গভীরভাবে বিচলিত না হওয়া অসম্ভব।

ব্লেকের গুরুও ছিল না, শিষ্যও নেই। ব্যতিক্রমদের ওসব বালাই থাকে না। সুস্থ লোক পাগলের কাছ থেকেও টেকনিক হয়ত শিখতে পারে, কিন্তু ভিসন (vision)-এর অংশভাক্ সে কি করে হবে?

১। ব্লেকের জীবনকাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য: Alexander Gilchrist, *Life of William Blake* (ed. by Ruthven Todd)।

২। ব্লেকের দার্শনিক প্রত্যয় এবং প্রতীক-কল্পনাদি সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: S. F. Damon, *William Blake, His Philosophy and Symbols*; M. Percival, *William Blake's circle of Destiny*; J. Brownski *William Blake, A Man without a Mask*।

৩। A. E. Houseman, *The Name and Nature of Poetry.*

৪। *Poetry and Prose of William Blake* ed. by Geoffrey Keynes. এই প্রবন্ধে ব্লেকের রচনা থেকে সমস্ত উদ্ধৃতি উক্ত সংস্করণ থেকে নেওয়া।

আধুনিক কবিতায় ব্যঞ্জনা

ভাষা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বৈয়াকরণরা অভিধা, তাৎপর্য এবং লক্ষণার মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করেছিলেন। কতকগুলি ধ্বনির সন্নিবেশ থেকে একটি অখণ্ড শব্দ উৎপন্ন হয়। যখন বার বার ব্যবহারের ফলে একটি বিশেষ শব্দের সঙ্গে একটি বিশেষ অর্থের যোগ সাধারণ স্বীকৃতি বা প্রসিদ্ধি লাভ করে, তখন সেই অর্থকে সেই শব্দের অভিধা বলা চলে। আবার কতকগুলি শব্দ বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে একটি বাক্যরচনা করলে তা থেকে একটি অখণ্ড বাক্যার্থ আমাদের মনে প্রতিভাত হয়। যে-সব শব্দ ঐ বাক্যের উপাদান, পৃথক পৃথক ভাবে শুধুমাত্র তাদের আভিধানিক অর্থ থেকে বাক্যার্থের এই অখণ্ডতা পাওয়া যায় না; বাক্যের গঠনের মধ্যে বিভিন্ন শব্দার্থের অন্বয়ের ফলে অর্থের সমগ্রতা সাধিত হয়ে থাকে। এরই নাম তাৎপর্য। তা ছাড়া বাক্যের মধ্যে শব্দের আর-এক ধরনের প্রয়োগ হামেশাই দেখা যায়। যে-কোনও শব্দের একটা সাধারণ-স্বীকৃত বা প্রসিদ্ধ অর্থ ত থাকেই; তা ছাড়া সেই অর্থের কাছাকাছি বা তারই অনুরূপ অন্য অর্থেও তা অনেক সময় ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন কলম বলতে আমরা একটি বিশেষ জিনিস বুঝে থাকি; কিন্তু তলোয়ারের চাইতে কলমের ক্ষমতা বেশী এ-কথায় "কলম" শব্দ লেখকের নির্দেশ দিচ্ছে। এটি শব্দের লক্ষণা।

আলঙ্কারিকরা বললেন, এ-তিনটি ছাড়াও ভাষার আর-একটি বিশেষ শক্তি আছে; এবং এই শক্তির ক্রিয়ার ফলেই সাধারণের ব্যবহৃত ভাষা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হয়। অভিধা, তাৎপর্য, লক্ষণা থেকে আমরা পাই বাচ্যার্থ; সাহিত্যিক এই বাচ্যার্থের সাহায্য নিয়ে অথচ তাকে অতিক্রম করে বাক্যে আর-একটি প্রতীয়মান অর্থ সঞ্চার করেন, আর তারই নাম ব্যঞ্জনা। ভাষার এই ব্যঞ্জনা-শক্তি না থাকলে ভাব, আবেগ এবং অভিজ্ঞতা রসে রূপান্তরিত হতে পারত না। এবং নৈয়ায়িকের বিশ্লেষণে ব্যঞ্জনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকৃত হলেও, সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিকদের অপরোক্ষ অভিজ্ঞতায় এর আস্বাদন বারংবার পরীক্ষিত। ধ্বনিকার তাই বলেছেন, যেমন অঙ্গনাদেহে অবয়বের অতিরিক্ত এক লাবণ্য উদ্ভাসিত হয়, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে বাচ্যার্থকে

আশ্রয় করে তার অতিরিক্ত আর-একটি প্রতীয়মান অর্থ অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। এটিই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। অভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের "লোচন"-টীকায় বিশদ করে দেখিয়েছেন যে, এই ধ্বনি দ্বারাই রস প্রতীত হতে পারে। যে "অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা" প্রতিভার লক্ষণ তারই সামর্থ্যে সাহিত্যিক ব্যাকরণ-অভিধানের নিয়ম মেনে নিয়েও প্রচলিত শব্দের এবং শব্দসমাবেশের মধ্যে বাচ্যার্থের অতিরিক্ত ব্যঙ্গার্থের পরিস্ফুটন ঘটান।

অবশ্য স্রেফ্ প্রতিভার দোহাই পেড়ে কোন কিছুরই অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না। আলঙ্কারিকরাও তা করেননি। রসকে ব্রহ্মস্বাদসহোদর বলার পরেও যাঁরা রসের ভাব, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাব প্রভৃতি উপাদান এবং কলাকৌশল বিশ্লেষণ করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা-যে ভাষাতে কী পদ্ধতিতে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় ব্যঞ্জনা আসে এটিরও খুঁটিনাটি বিচার করতে চাইবেন, এটি ত স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন এবং অভিনবগুপ্তের বিচার অতুলচন্দ্র গুপ্তের কল্যাণে আধুনিক বাঙালী পাঠকের কাছে সমধিক পরিচিত। কিন্তু বোধহয় সংস্কৃত ভাষায় এ-রহস্যের সবচাইতে পরিচ্ছন্ন এবং সূক্ষ্ম আলোচনার সন্ধান মিলবে অভিনবগুপ্তের সমকালীন আলঙ্কারিক কুন্তল বা কুন্তকের 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে।

কুন্তক ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার বদলে "বক্রতা" শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভামহ লিখেছিলেন, "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যং"। কুন্তক প্রস্তাবটিকে বিশদ করে দেখালেন যে শব্দ এবং অর্থ দুয়ের মধ্যেই আহ্লাদসৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ-দুয়ের বিন্যাসের মধ্যে মিল না ঘটলে কাব্যে চমৎকারিত্ব আসে না। মানে না-বুঝেও সৎ কবিতা শুধু কানে শুনে আনন্দ পাওয়া যায়। এ আনন্দের কারণ হল শব্দবিন্যাসের অন্তর্নিহিত সঙ্গীতধর্ম। অন্য দিকে শুধু অর্থসম্পদের দ্বারাও কোন বাক্য পাঠককে আনন্দ দিতে পারে। কিন্তু যখন কোনও বাক্যে ছন্দ-এবং-ধ্বনিবিন্যাস অর্থবিন্যাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরস্পরের সমৃদ্ধি ঘটায় একটি সমগ্র সত্তায় সামঞ্জস্য লাভ করে, তখনই ভাষা সাহিত্য হয়ে ওঠে। এই সমগ্রতার সামঞ্জস্যের ফলে শব্দরূপ বাচক এবং অর্থরূপ বাচ্যকে অতিক্রম করে ভাষায় একটি নতুন সামর্থ্য সঞ্চারিত হয়—এরই নাম বক্রতা। দার্শনিকপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে এখনকার সমালোচকরা যাকে 'ইস্থেটিক কোয়ালিটি' বলেন, কুন্তক 'বক্রতা' কথাটিতে তারই সূচনা করেছিলেন। এর যেটি অন্তরঙ্গ দিক (অর্থাৎ এর ফলে চেতনায় যে

হ্লাদরসের আস্বাদ হয়), তাকে কুন্তক বলেছেন সৌভাগ্য; আর যেটি বহিরঙ্গ (অর্থাৎ শব্দার্থের বিশিষ্ট সন্নিবেশের ফলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়), তার নামকরণ করেছেন লাবণ্য। কোন্ কোন্ কারণ এবং প্রক্রিয়ার ফলে কাব্যদেহে এই সৌভাগ্য এবং লাবণ্য সঞ্চারিত হয়, কুন্তক তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় উন্মেষে বিস্তারিতভাবে তার বিশ্লেষণ করেছেন। সংস্কৃত-সাহিত্য থেকে প্রভূত উদাহরণ-সহযোগে বিভিন্ন প্রকারের বক্রতা বিষয়ে তাঁর এই আলোচনা অলঙ্কারশাস্ত্রে এক অসামান্য সংযোজন।

ফলত ধ্বনি, বক্রতা বা ব্যঞ্জনা-সমন্বিত হওয়ার ফলেই সাধারণ-প্রচলিত ভাষা সাহিত্যের ভাষায় বিকাশলাভ করে। এবং সাহিত্যের মধ্যে কবিতা হল ব্যঞ্জনা-সামর্থ্যে সব চাইতে সমৃদ্ধ। প্রাচীন হিন্দু আলঙ্কারিকদের যেন প্রতিধ্বনি করে আধুনিক কবি এজরা পাউণ্ড তাই বলেছেন, গাঢ়তম ভাষাই কবিতা। অথচ শিশুবয়স থেকে এমন বহু রচনা আমাদের পড়তে হয়, অভিভাবক, শিক্ষক এবং টীকাকারদের মতে যারা নাকি কবিতা, কিন্তু যাদের মধ্যে ব্যঞ্জনার আভাস পর্যন্ত আমরা কখন খুঁজে পাই না। আলঙ্কারিকদের পরিভাষা অনুসারে এরা আসলে কবিতা নয়, চিত্রকাব্য মাত্র। আমরা এদের পদ্য আখ্যা দিতে পারি। কবিতার পাশাপাশি পদ্য সব দেশেই চিরকাল লেখা হয়ে আসছে। কারণ সৃষ্টি-প্রতিভা না থাকলেও যাঁদের রচনার প্রবৃত্তি অদম্য, এজাতীয় ব্যক্তিরা কোন দেশে-কালেই দুর্লভ নন। তবে বিপদ তখনই ঘটে যখন নানা কারণে কবিরা পর্যন্ত স্বভাবোক্তি এবং অর্থব্যক্তির নামে ব্যঞ্জনা বিষয়ে উদাসীন হয়ে ওঠেন। তার ফলে যা সৃজিত হয় তাকে ঠিক পদ্য বলা যায় না। কারণ কুন্তকোক্ত সৌভাগ্যে সে-রচনা পুরোপুরি বঞ্চিত নয়, কিন্তু অব্যুৎপত্তিকৃত দোষে তার রস ফিকে, তার প্রতীয়মানতা ক্ষীণ, সহৃদয়ের হৃদয়ে অনুরণন জাগাবার সামর্থ্য তার সীমাবদ্ধ। এ-অবস্থায় কাব্যে বাচ্যার্থ ও ভাব মুখ্য হয়ে ওঠে, এবং ফলে তার দেহে লাবণ্য বা আভা ম্লান হয়ে আসে। এই অবক্ষয় থেকে কবিপ্রতিভাকে বাঁচাবার জন্য তখন প্রয়োজন হয় ব্যঞ্জনার রহস্য নিয়ে নতুন করে বিচার বিশ্লেষণ, কবিকর্ম বিষয়ে কবিদের অভিষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা। কাব্যের ইতিহাসে এমনিতর অবস্থাকেই বোধহয় কালান্তর আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

॥ দুই ॥

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইয়োরোপীয় কবিতার ইতিহাসে এমনিতর এক কালান্তর সূচিত হয়েছিল। আঠার শতকের চতুর কবিরা অলঙ্কারপ্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তাঁদের রচনায় বামনোক্ত শ্লেষ, সমতা, সমাধি, উদারতা, অর্থপ্রতীতি ইত্যাদি গুণের অভাব ছিল না; কিন্তু তাঁদের কল্পনায় অলঙ্কার প্রায়শই ব্যঞ্জনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে ওঠেনি। এঁদের কাব্যাদর্শের প্রতিবাদে আঠার শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যে রোমান্টিক আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতেও সাধারণভাবে ব্যঞ্জনা হয়ে রইল গৌণ, মুখ্য হয়ে উঠল একদিকে ভাব বা আবেগ এবং অন্যদিকে দার্শনিকতা। এ-প্রস্তাবের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম কীট্‌স্; এবং কোলরিজের কয়েকটি আশ্চর্য কবিতা সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে না। তবু মোটামুটিভাবে বোধহয় বলা চলে যে ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ-বায়রন-শেলী, লামার্তিন-ভিনী-উগো মুসে, মানজনি-লেওপার্দি, শিলার প্রমুখ কবিদের রচনায় ব্যঞ্জনা অনুপস্থিত না থাকলেও তা প্রায়শই ভাক্ত; আবেগের প্রাবল্য অথবা তাত্ত্বিকতার গুরুভার অথবা উভয়ের মিলিত চাপে ধ্বনির বিচ্ছিত্তিসাধন অনেকটাই যেন অবহেলিত। এ অভিযোগ হয়ত স্বয়ং গোয়েটের কিছু কবিতা সম্বন্ধেও করা চলে। এঁদের প্রত্যেকেরই কবি-প্রতিভা সংশয়োর্ধ্ব। তবু স্বীকার করতে হয় এঁদের অনেক কবিতাতেই ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তি সম্যকভাবে স্ফুরিত হয়নি।

রোমান্টিক মানসে বাচ্যার্থের প্রতি অনুরাগ যখন ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন ব্যঞ্জনার প্রতি নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এক মার্কিন কবি: এডগার অ্যালান পো (১৮০৯—১৮৪৯)। পো গল্পলেখক হিসেবেই সমধিক পরিচিত; কিন্তু পশ্চিমী কাব্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগের প্রবর্তনে তাঁর দান কম নয়। তিনি বোঝালেন, কবিতার ফল জ্ঞান নয়, নীতিবোধ নয়, তার ফল একান্তভাবেই আনন্দ। আর এই আনন্দ সৃজিত এবং সঞ্চারিত হয় নিখুঁত শব্দবিন্যাসের মারফৎ ইন্দ্রিয়জাত আবেগকে ভাবধৃত আবেগে রূপান্তরিত করে। তাঁর মতে দীর্ঘ কবিতা স্ববিরোধী এবং সে-কারণে অসম্ভব। কারণ আনন্দের স্বাদ বেশীক্ষণ বজায় রাখা যায় না, আর তাই কবিতা দীর্ঘ হলে তা বাচ্যার্থপ্রধান হয়ে উঠতে বাধ্য। কবির কাজ হোল সঙ্গীতধর্মী স্বল্প শব্দে আনন্দময় গূঢ় ব্যঞ্জনার উদ্বোধন। তাঁর সমকালীন

ফরাসী কবি-ঔপন্যাসিক তেয়োফিল গোতিয়ে (১৮১১—১৮৭২) শিল্পের স্বতঃসিদ্ধ মূল্যের উপরে জোর দিয়ে রোমান্টিক কাব্যের পরতন্ত্রতার প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু পো কিংবা গোতিয়ে প্রথমশ্রেণীর কবি ছিলেন না। তাঁদের উভয়েরই শিষ্য বোদলেয়ারের (১৮২১—৬৭) অসামান্য কবি-প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করার ফলেই তাঁদের কাব্যাদর্শ পশ্চিমী কাব্যের ইতিহাসে কালান্তর ঘটাতে পারল। বোদলেয়ার জটিল অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিত-গ্রামকে শব্দার্থের নিখুঁত অর্কেস্ট্রায় অভিব্যক্ত করে কবিকর্মের কেন্দ্রে ব্যঞ্জনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটালেন। তর্ক করে নয়, তাঁর নিজেরই রচিত কবিতার অপরোক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করে তিনি দেখালেন যে, লৌকিক স্তরে যে-ভাব হয়ত নিতান্তই জুগুপ্সাকর, ব্যঞ্জনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে তাই হৃদয়ের চমৎকারিতার কারণ হতে পারে। এবং এ-দাবিও তিনি করলেন যে, ব্যঞ্জনা শুধু বাচ্যার্থ এবং ভাবের উপাদানকে আমূল রূপান্তরিত করে না, ব্যঙ্গের প্রয়োজনে ব্যাকরণ এবং অভিধানের নিয়মলঙ্ঘনেও কবির পূর্ণ অধিকার আছে।

ব্যঞ্জনা-সামর্থ্যে বোদলেয়ার যে-কোনও যুগের এবং যে-কোনও ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তা ছাড়া গত একশ বছরে আধুনিক কবিতায় যে বিশেষ মেজাজ এবং রীতি গড়ে উঠেছে তার উপরে তাঁর গভীর প্রভাব সর্ববাদিসম্মত। স্বভাবতই এ-প্রভাব প্রথমে ফরাসী কবিদের মধ্যে স্পষ্টতা পায় ; পরে তা ইংরেজী, জার্মান, রুশ, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, মায় সম্প্রতিকালে বাংলা কবিতাতেও প্রসার লাভ করেছে। এই মেজাজ এবং রীতির মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য থাকলেও সমগ্রভাবে একে বোধ হয় সিম্বলিস্ট্ বা প্রতীকতন্ত্রী আখ্যা দিলে বিশেষ ভুল হবে না। প্রতীকতন্ত্রের প্রথম এবং হয়ত এতাবৎ সার্থকতম কবি বোদলেয়ার নিজেই। কিন্তু কাব্যাদর্শরূপে এর প্রথম এবং প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন স্তেফান্ মালার্মে (১৮৪২—১৮৯৮)। জীবিকার জন্যে মালার্মেকে প্রায় সারাজীবন সামান্য ইস্কুল-মাস্টারি করতে হয়েছিল ; আর সেই বৃত্তিগত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তিনি কোজাগর সাধনায় বিশুদ্ধ রূপের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। বিদ্যালয়ের স্বল্পবুদ্ধি, অভ্যাসাশ্রয়ী সহকর্মীরা স্বভাবতই এই উন্নাসিক, হ্রস্বকায়, অদিষ্ট প্রতিভাবান পুরুষটিকে বিশেষ পাত্তা দেননি। কিন্তু রু দ্য রোম-এ তাঁর অ্যাপার্টমেণ্টে সপ্তাহে সপ্তাহে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যে-সব তরুণ এবং প্রবীণ শিল্পীদের সমাগম হত, তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন কবিগুরু। এখানে আসতেন ভার্লেন, পিয়ের লুই,

আঁদ্রে জিদ্, পোল ভালেরি, আলডেন ম্যানে, হুইসলার, আর্থার সাইমনস। ঘরের দেয়ালে ম্যানের আঁকা পোর্ট্রেট, গোগ্যাঁর কমলারঙা উডকাট, আর রদ্যাঁ-র ফন্ ও নিম্ফ্ ; আর ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁধে মোটা পশমের শাল, হাতে তামাকের পাইপ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মালার্মে মৃদুস্বরে এঁদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন প্রতীকতন্ত্রী কাব্যাদর্শ। একটি গল্প আছে : এটি মালার্মে-শিষ্য ভালেরির কাছে পাওয়া। উনিশ শতকের একজন সেরা ছবি-আঁকিয়ে দেগা-র সনেট লেখার শখ ছিল। একদিন আর-একজন ছবি-আঁকিয়ের বাড়িতে বসে দেগা দুঃখ করছিলেন, "দেখ, সারাদিন ধরে চেষ্টা করলাম, তবু সনেটটা রূপ নিল না। অথচ আমার মনে ত ভাবের দারিদ্র্য নেই।" "দেগা," মালার্মে বললেন; "ভাব দিয়ে ত সনেট হয় না, সনেট হয় কথা দিয়ে।"

কথার শব্দার্থময় দেহে যে-জাদুতে ব্যঞ্জনার দীপ্তি দেখা দেয় মালার্মে তাকেই বলেছেন কবিত্ব। মালার্মের মতে এই দীপ্তির কেন্দ্রে থাকে কোনও প্রতীক, যে প্রতীকের মধ্যে ভাবনা-অভিজ্ঞতা-আবেগের বিচিত্র বহুবাচনিক উপাদানসত্তার অর্থ এবং সঙ্গীতময় একটি সমগ্র রূপে কেলাসিত। কবির কল্পনায় কোন দুর্লভ রহস্যময় মুহূর্তে একটি প্রতীক উদ্ভাসিত হয় ; কিন্তু কবিতার কেন্দ্রে তার সার্থক প্রতিষ্ঠা নিরলস অনুশীলনসাপেক্ষ। প্রতীকের আবির্ভাব ভাষায় ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে, কিন্তু সে-ভাষা "গোষ্ঠীর ভাষা" নয়, সে হল কবির স্বোপার্জিত বৈদগ্ধ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট এবং পরিমার্জিত ভাষা। এ-বৈদগ্ধ্যের জন্যে চাই একদিকে ভাষার সাঙ্গীতিক সামর্থ্য বিষয়ে নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জীবনব্যাপী অনুশীলন।

প্রতীকতন্ত্রী মালার্মে ব্যঞ্জনাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করলেন বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে। আর প্রতীকতন্ত্রী র‍্যাঁবো (১৮৫৪—১৮৯১) তার উৎস সন্ধান করলেন ব্যক্তির অবচেতনায়। বোদলেয়ার যে দুই আপাতবিরোধী ধারাকে তাঁর কবিতায় মিলিয়েছিলেন, মালার্মে এবং র‍্যাঁবো তাদের দুই স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত করলেন। র‍্যাঁবোকল্পিত বিভিন্ন প্রতীকের ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করতে হলে অরফিউস-এর মত প্রাক্‌চৈতন্যের অন্ধকার লোকে অবতরণ করতে হয়। র‍্যাঁবোর মতে কবি দ্রষ্টা (Voyant)। কিন্তু অস্তিত্বের যে সামান্য অংশ যুক্তি এবং সামাজিক ঔচিত্যবোধের ছকের মধ্যে মানচিত্রিত হয়েছে, তাতেই তাঁর চোখ ঠেকে যায়নি। তার পিছনে অস্তিত্বের যে বিরাট জটিল, নিয়ত-পরিবর্তনশীল, মগ্ন বিশৃঙ্খলা বর্তমান, তার সমগ্র রূপটির তিনি সন্ধানী। এই

অবচেতন সমগ্রতার বীক্ষণপ্রয়াস থেকেই তাঁর বিভিন্ন প্রতীকের জন্ম, এবং এই প্রয়াসের সূত্রেই তাঁর ছন্দ এবং ভাষা ব্যঞ্জনাগর্ভ।

আধুনিক কবিকল্পনা প্রতীকতন্ত্রের এই দুটি ধারার কখনও একটিকে কখনও অন্যটিকে অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের ইঙ্গ-মার্কিনী কাব্যে ইমেজিস্ট আন্দোলনের উপরে মালার্মে-কল্পিত কাব্যাদর্শের প্রভাব উল্লেখ করা চলে। অপরদিকে এরই কিছু পরে দক্ষিণ এবং মধ্য ইয়োরোপে যে স্যুররেয়ালিস্ত্ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল গীওম্ আপলিনেয়ার মারফত র‍্যাবোর সঙ্গে তার যোগ যেমন গভীর তেমনি প্রত্যক্ষ। তবে এ শতকের যাঁরা শ্রেষ্ঠ কবি তাঁদের অধিকাংশই তাঁদের কাব্যব্যঞ্জনায় এই দুই ধারাকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। এবং ফলে তাঁদের সঙ্গে যে-পূর্বসূরীর আত্মীয়তা সব চাইতে ঘনিষ্ঠ, তিনি মালার্মেও নন, র‍্যাবো-ও নন, তিনি হলেন শার্লবোদলেয়ার। পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নবৃত্তির কবিপ্রতিভা সত্ত্বেও, আমার বিশ্বাস, এদিক থেকে রিল্‌কে, ভালেরি, ইয়েটস্ এবং এলিয়ট বোদলেয়ার-এরই যথার্থ উত্তরসাধক।

॥ তিন ॥

যদিচ সম্পূর্ণভাবে ব্যঞ্জনাহীন কবিতা অকল্পনীয়, তবু সাহিত্যের ইতিহাসে এ-ধরনের যুগ মোটেই দুর্লভ নয় যখন এক-আধজনকে বাদ দিলে অধিকাংশ কবিই ভাষার ব্যঞ্জনা-সামর্থ্য বিষয়ে নিরুৎসুক, এবং ফলে তখন কবিতা এবং পদ্যের মাঝখানের ব্যবধান যেন আর দুর্লঙ্ঘ্য ঠেকে না। ব্যঞ্জনা-ব্যাপারে অমনোযোগের ফলে কবিতায় বাচ্যার্থ মুখ্য হয়ে উঠবে এটাই প্রত্যাশিত। এবং বাচ্য-প্রধান রচনা সহজবোধ্য বলে তার সাধারণ পাঠক বেশী। কিন্তু আলঙ্কারিকেরা যাকে "রসাস্বাদন-চমৎকারচর্বণা" বলেন, সেই বিশেষ জাতীয় অনুব্যবসায় বা অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি না থাকায় যাঁরা রসিক পাঠক, এ-ধরনের রচনার প্রতি তাঁরা স্বভাবতই বীতরাগ।

এখন আধুনিক কবিদের অনেক দোষ থাকতে পারে: কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যঞ্জনা বিষয়ে ঔদাসীন্যের অভিযোগ একেবারেই অসঙ্গত।

আধুনিক কবিরা নানা পদ্ধতিতে শব্দার্থে ব্যঞ্জনা-সঞ্চারের প্রয়াস

পেয়েছেন। কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমেই আসে তাঁদের সঙ্গীতধর্মের কথা। কুন্তক লিখেছিলেন :

অপর্যালোচিতেঽপ্যর্থে
বন্ধসৌন্দর্যসম্পদা।
গীতবদ্ধৃদয়াহ্লাদং
তদ্বিদাং বিদধাতি যৎ॥

পো এবং তাঁর অনুসরণে মালার্মেও এই তত্ত্বের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। "একটি পংক্তি", মালার্মে লিখেছেন, "অল্প কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ধ্বনি-কম্পন, আর দেখ, ব্যঞ্জনার স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতা গড়ে উঠল।" র্যাঁবোর মতে প্রতি স্বরবর্ণেরই নাকি একটি নিজস্ব রঙ আছে : "এ" কালো, "ই" সাদা, "আই" লাল, "ইউ" সবুজ, এবং "ও" নীল। এটা নিশ্চয় বাড়াবাড়ি ; কিন্তু অধিকাংশ আধুনিক কবিই সচেতন যে কানের দিক থেকে শব্দের হাল্কা এবং ভারী, মসৃণ এবং রোমশ, স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ, আংশিক স্বচ্ছ ইত্যাদি ভাগ করা চলে এবং ধ্বনির সার্থক নির্বাচন ও পারম্পর্যের ভিতর দিয়ে বাক্যে বিচিত্র ব্যঞ্জনা সঞ্চার করা যায়। ধ্বনিগত ব্যঞ্জনার প্রয়োজনে তাঁরা অনেক সময় ব্যাকরণের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন, অভিধান-বহির্ভূত শব্দ উদ্ভাবন করেছেন। এ-শতকের কবিদের মধ্যে শ্রীমতী ইডিথ সিটওয়েলের কবিতায় এর বিস্তর উদাহরণ মিলবে। তাঁর 'কালেক্টেড পোয়েম্‌স'এর ভূমিকায় এ-বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় প্রকৃতি হল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইঙ্গিতময় ব্যবহার। পশ্চিমী সংস্কৃতির দুই প্রধান উৎস এদিক থেকে আধুনিক কবিদের খুব কাজে লেগেছে। এক দিকে গ্রেকো-রোমান পুরাকাহিনী এবং অন্যদিকে খ্রীস্টীয় উপাখ্যান থেকে বিচিত্র চরিত্র এবং ঘটনাকে তাঁরা অনেকেই প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের অপরোক্ষানুভূতির রসায়নে এসব প্রাচীন উপাদান যেমন নবীন অর্থ পরিগ্রহ করেছে, তেমনি এদের সূত্রে দু-তিন হাজার বছরের স্মৃতির অনুরণন অভিজ্ঞতার প্রকাশকে অসামান্য বিচ্ছিত্তিশালী করে তুলেছে। আধুনিক কবিতায় এর উদাহরণ অসংখ্য : যেমন মালার্মের 'ফন্', ভালেরীর 'নার্সিসাস' কি 'নিয়তি' দেবীরা, ক্লোদেল্-এর 'আনিমুস এবং আনিমা'-র রূপক-কাহিনী, রিল্‌কের 'আর্ফিউস', অথবা দেবদূতগণ, ইয়েট্‌স্-এর 'লিডা,' পাউণ্ড-এর 'অডিসিউস', এলিয়ট-এর টিরেসিয়াস অথবা হোলি গ্রেল, ইডিথ সিটওয়েল-

এর ডাইভিজ্ এবং ল্যাজারাস ইত্যাদি। শুধু ধর্ম এবং পুরাকাহিনী নয়, ইতিহাসের চরিত্র এবং ঘটনাবলীর মধ্যেও এঁরা প্রতীক খুঁজেছেন। পাউণ্ডের "সর্গমালায়" (Cantos) অথবা প্যার্স্-এর "হাওয়ারা" (Vents) কাব্যে তার অনেক উদাহরণ মিলবে।

কিন্তু আধুনিক কবিতায় ঐতিহ্যের সব চাইতে ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ হল কাব্য-দেহে পূর্বসূরী কবিদের স্বীকরণ। ব্যাপারটা অবশ্য কিছু অভিনব নয়। কালিদাসের কাব্যে বাল্মীকির প্রতিধ্বনির সঙ্গে রসিক পাঠকমাত্রেই পরিচিত। কিন্তু ব্যঞ্জনার উপায় হিসেবে এ-পদ্ধতির এত বিচিত্র এবং ব্যাপক প্রয়োগ প্রাগাধুনিক কবিতায় বিশেষ দেখা যায় না। আধুনিক কবিরা তাঁদের উপমায়, শব্দার্থবিন্যাসে, অলঙ্করণে পূর্বসূরী কবিদের রচনাকে প্রয়োজনমত উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। ফলে পাঠকের স্মৃতিতে মূর্ছনা জাগে এবং কাব্যদেহ ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে ওঠে। প্রতিভাসম্পন্ন কবির হাতে এ-পদ্ধতি যে কতখানি সার্থক হতে পারে এলিয়টের কবিতার সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনি অবশ্যই তার খবর রাখেন। ওভিড্, দান্তে, শেক্সপীয়র, ওয়েবস্টার, ডান, মার্ভেল, গোল্ডস্মিথ, বোদলেয়ার, ভার্লেন প্রমুখ কবিদের প্রতিধ্বনি এলিয়টের কাব্যে বারবার নিগূঢ় ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে।

ব্যঞ্জনার আর-এক পদ্ধতি হল অবচেতন থেকে প্রতীক আহরণ। সম্ভবত র‍্যাবোই প্রথম এর ব্যাপক প্রয়োগ করেন। পরবর্তীকালে আপলিনেয়ার, ব্রেঁত, মিশো, আংশিকভাবে প্যার্স, এলুয়ার এবং আরাগঁ, লর্কা অডেন, ডিলান টমাস প্রমুখ অনেকেই মগ্নচেতন থেকে কবিকর্মের উপাদান সংগ্রহ করে ভাষার ধ্বনিসম্পদ বাড়িয়েছেন। প্যার্স-এর ভাষায় "স্বপ্নের ভস্মাবশেষ থেকে কবিকল্পনার উদ্ভব।" মানুষের বহু নিরুদ্ধ কামনা স্বপ্নের জগতে প্রতীকী রূপ ধারণ করে মুক্তি পায়। এসব প্রতীক যখন কবিতায় ব্যবহৃত হয়, তখন ছন্দের সঙ্গে অন্বিত হয়ে তা পাঠকচৈতন্যে এক গূঢ় এবং তীব্র অনুব্যবসায় বিশেষের উদ্রেক করে। তার আভিধানিক অর্থ তখন গৌণ হয়ে অবচেতনিক ব্যঞ্জনা মুখ্য হয়ে ওঠে। এদিক থেকে ফ্রয়েড-য়ুঙ্গ প্রমুখ মনোবিশ্লেষকদের আবিষ্কার আধুনিক কবি-কল্পনায় গভীর প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে আধুনিক কবিরা নৃতত্ত্ব থেকেও ব্যঞ্জনার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। আদিম সমাজে মানুষ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা থেকে বিমূর্ত কল্পনায় আরোহণে অভ্যস্ত হয়নি, তখন তার অস্তিত্ববোধ মীথ্ (Myth) আকারে

প্রকাশ পেত। এখনও পৃথিবীতে বহু আদিম জাতি বর্তমান, যাদের ভাবনা-কল্পনা মুখ্যত মীথ্-আশ্রয়ী। নৃতাত্ত্বিকেরা এসব মীথ্ সযত্নে সংগ্রহ করে তাদের নানাভাবে তুলনা এবং বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন ও করছেন। তাঁদের গবেষণার ফলে এদের মধ্যে মানবীয় অস্তিত্বের একটি অত্যন্ত সরলীকৃত নিত্যরূপের আভাস ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। আধুনিক কবিরা অনেকেই নৃতাত্ত্বিকদের দ্বারা সংগৃহীত এই সব আদিম কাহিনী থেকে প্রতীক সংগ্রহ করে ভাবের সাধারণীকরণের এবং ব্যঞ্জনা-বৃদ্ধির প্রয়াস পেয়েছেন। ফ্রেজারের "গোল্ডেন বাউ"-এর সঙ্গে এলিয়টের "ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের" সম্পর্কের কথা কে না জানে!

কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম, গ্রেকো রোমান পুরাকাহিনী, মনোবিকলন-শাস্ত্রের অবচেতন বা নৃতাত্ত্বিক-সংগৃহীত আদিম মীথলজি ছাড়া ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বপ্রকৃতিও আধুনিক কবিদের মনে সার্থক প্রতীকের বহু উপাদান জুগিয়েছে। পশু-পাখি, গাছপালা, আকাশ-সমুদ্র, আলো-অন্ধকার, সব কিছুর মধ্যেই কবি-কল্পনা অভিনব অর্থের ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে পারে। এরা শুধু বাহ্যবস্তু বা ঘটনা নয়: এদের সান্নিধ্যে এসে কবির সৃষ্টিশীল চৈতন্যে যেসব বিচিত্র অনুরণন জাগে, এরা তখন তারই প্রতীক। উদাহরণ: বোদলেয়ারের সিন্ধু-শকুন, মালার্মের রাজহাঁস, প্যার্স-এর সমুদ্র এবং বাতাস, ইডিথ সিট্‌ওয়েলের সূর্য এবং সোনালী শস্যখেত, এলিয়টের লাইলাক, রিল্‌কের ডুমুরগাছ, লরকার জলপাই-বীথি, গাঁজোর জেলি ফিশ্। এর প্রতিটি প্রতীকই বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে এক-একটি স্বতঃসিদ্ধ এবং নিগূঢ়, প্রাতিস্বিক এবং অসামান্য, অনুব্যবসায় দ্বারা ব্যঞ্জিত।

॥ চার ॥

ব্যঞ্জনা বিষয়ে অবহিত হওয়ার ফলে আধুনিক কাব্যের যেমন সমৃদ্ধি ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি এক সঙ্কটের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ সাধারণ পাঠক আধুনিক কবিতার আবেদনে সাড়া দিতে অপারগ। এর কারণ নানা, কিন্তু তার মধ্যে প্রধান একটি হল এই যে আধুনিক কাব্যের ব্যঞ্জনা উপভোগ করতে হলে যতখানি বৈদগ্ধ্য এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিশীলতা প্রয়োজন, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। এবং

যেহেতু আধুনিক সমাজ এবং শিক্ষার ঝোঁক ব্যবহারিক দক্ষতা এবং সাফল্যের উপরে, মনের বিকাশ এবং ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা-সাধনের উপরে নয়, সে-কারণে কবি এবং সাধারণ পাঠকের মধ্যে এই ব্যবধান কমার সম্ভাবনাও বিশেষ দেখি না। এতে পাঠকের লোকসান সুস্পষ্ট, কিন্তু কবিদেরও বোধহয় খুব পুলকিত বোধ করার কারণ নেই। কারণ যদিচ একদা এলিয়ট তাঁর ওয়েস্টল্যাণ্ড কাব্যের পিছনে নিজেই কিছু টীকা-ভাষ্য জুড়েছিলেন, তবু কোনও সৎ কবিই বোধহয় ভট্টির অনুকরণে একথা বলে সুখী বোধ করবেন না যে, তাঁদের কাব্য শুধু বিদ্বজ্জনের জন্যে, তা ব্যাখ্যার দ্বারা বোধ্য এবং ফলে তা সাধারণ পাঠকের অগম্য।

ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলং।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া॥

ব্যাচ্যার্থপ্রধান কাব্য কাব্য নয়, পদ্যমাত্র। অপরপক্ষে ব্যঙ্গ্যার্থের অনুশীলন যদি কবিকর্মকে গুহ্যসাধনায় পর্যবসিত করে, তবে সেও ত কাব্যের এক ধরনের অপমৃত্যু। একদা-সুররেয়ালিস্ত্ ফরাসী কবি রেনী শার লিখেছেন, মানুষের এক অংশের প্রতীক গাছ, আর-এক অংশের প্রতীক পাখি। কাব্যে গাছ পায় মাটি, পাখির মেলে আকাশ। আধুনিক কবিতায় পাখিরা ত ডানা মেলেছে; কিন্তু গাছদের শুকিয়ে যাবার আভাসও কি চোখে পড়ছে না?

রবীন্দ্রনাথ ও গোয়েটে

রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করে লিখেছিলেন আমাদের দেশের সাহিত্য আলোচনা "নিতান্ত মুদীর দোকানের ব্যাপার—ছোট ছোট শালপাতার বন্দোবস্ত—সমালোচনার ভঙ্গী দেখলেই সেটি বোঝা যায়—নিতান্ত গেঁয়ো রকমের।" নানা ভাষায় লেখা নানা সাহিত্যের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভালো পরিচয় আছে জেনে তাঁর কাছে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন: "কাব্যকে, সাহিত্যকে একটা বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না কেন?" কবির আরও অনেক প্রস্তাবের মত এটিও বিশেষ কার্যকরী হয়নি। সাহিত্যের পাঠক হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বনাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য বিচারের প্রৌঢ়ত্ব তিনি অর্জন করেন নি। তিনি নানা ভাষা থেকে বিস্তর কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন; অন্যান্য ভাষার বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছন্দ নিয়ে বাংলা ভাষায় তিনি যে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন আজও তার তুলনা মেলে না; তাঁর "ছন্দ সরস্বতী" বাংলা সাহিত্যের একটি মহৎ সম্পদ। তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তাঁর সাহিত্য চর্চার মধ্যে পরিণত বিচারবোধের বিশেষ অভাব ছিল। যাঁদের সে অভাব ছিল না—যেমন প্রমথ চৌধুরী অথবা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—তাঁরাও বিশ্বভূমিকায় বাংলা সাহিত্য সমালোচনার কাজে বিশেষ যত্নশীল হননি। ফলত বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য বিষয়ে কবির উপরোক্ত অভিযোগ আজও কম-বেশী অপ্রতিখণ্ডিত রয়ে গেছে।

অবশ্য বিশ্বভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দেখালে বিশ্বকে দেখাবার মত বাংলা সাহিত্যের কতটুকু যে শেষ পর্যন্ত টিকবে বলা শক্ত। ছোট কি মেজো-সেজোদের কথা ছেড়ে দিয়ে বাংলা এমন কি আধুনিক ভারতের যিনি নিঃসন্দেহে সব চাইতে বড় লেখক সেই রবীন্দ্রনাথের কথাই যদি ধরা যায় তাহলেও বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান কত উঁচুতে সে বিষয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ থাকে। নাট্যকার হিসেবে তিনি কি ইউরিপিদিস্, শেক্সপীয়র, মলিএর, ইবসেন, অথবা ও'নীলের সমতুল্য? ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁকে কি স্তাঁদাল, ডস্টয়েভ্স্কী, টলস্টয়, টমাস মান অথবা প্রুস্ত্-এর কোঠায় ফেলা চলে? এমন কি এত যে তাঁর কবিখ্যাতি তা সত্ত্বেও একথা কি আমরা বলতে পারি যে

র‍্যাঁবো, রিল্‌কে বা ইয়েট্‌স জীবনের যে সব অতলস্পর্শ অভিজ্ঞতাকে তাঁদের সার্থকতম কবিতার মধ্যে ধরতে পেরেছিলেন রবিঠাকুরের কবিতায় তাদের সন্ধান মেলে ?[১] তিনি যত গান বেঁধেছিলেন পৃথিবীতে কেউ বোধ হয় কখনও একা অত গান বাঁধেনি। তাঁর সে গানে আমরা মুগ্ধ। তবু মুখ্যত সুরের দিক থেকে বিচার করলে কি এদেশের কি পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ সুরকারদের রচনার সঙ্গে তার কি সত্যিই কোন তুলনা সম্ভব ? আমি যতটুকু বুঝি তাতে মনে হয় এক ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বের প্রধানদের অন্যতম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি আখ্যা দিয়ে এদেশে যাঁরা তাঁর গরবে গরবী, বিশ্বভূমিকায় তাঁর এ ধরণের মূল্যায়নের সম্ভাবনায় তাঁদের মন উঠবে ভরসা হয় না।

তবে এক ব্যাপারে বিশ্ব সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা শক্ত। প্রতিভার এমন নৈসর্গিক বহুমুখীনতা এবং প্রাচুর্য আর কজন সাহিত্যিক এতাবৎ দেখাতে পেরেছেন ? পৃথিবীর প্রাচীন এবং আধুনিক সেরা লেখকদের কথা, যতটুকু জানি, একে একে ভেবে দেখেছি। তাঁদের অনেকে আপন আপন ক্ষেত্রে তাঁর তুলনায় হয়ত বেশী সার্থকতা অর্জন করেছেন। কিন্তু এত বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁরা কেউই সার্থক হননি, এমন কি বিচরণ পর্যন্ত করেননি। না, দান্তে নয়, শেক্সপীয়র নয়, টলস্টয় নয়। পশ্চিমী রনেসাঁসের যুগে যাকে বলা হত বৈশ্বিক মানব বা I'uomo universale সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তারই আশ্চর্য উদাহরণ। রনেসাঁসের যুগে এ ধরণের কিছু মানুষ দেখা গিয়েছিল, এঁদের মধ্যে অলবর্তি এবং লেওনার্দো সমধিক খ্যাত। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ মুখ্যত সাহিত্যিক ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত সাহিত্যিক এবং সাহিত্যের এমন কোন রূপই আমাদের জানা নেই যার মধ্যে তাঁর প্রতিভা স্ফূর্তি পায়নি। কবিতা, নাটক (ট্রাজেডি, কমেডি, নৃত্যনাট্য, প্রহসন), উপন্যাস, ছোট এবং বড় গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ডায়েরী-চিঠিপত্র—কিছুই তিনি বাদ দেননি। এমন কি দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস, শিক্ষাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ এ সব বিষয়েও তিনি যথেষ্ট ভেবেছেন এবং নেহাৎ কম লেখেন নি। তাছাড়া তাঁর গান আছে, ছবি আছে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে তিনি জমিদারী চালিয়েছেন, একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, তাঁর নিজের নানা নাটক প্রযোজনা করেছেন, এমন কি সাময়িকভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। না, রবীন্দ্রনাথের মত বিচিত্র-

১। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

প্রতিভা সাহিত্যিক এদেশে কেন গোটা পৃথিবীতে আর চোখে পড়ে না। শুধু একজন ছাড়া। তিনি হলেন যোহান্ হ্বোল্ফ্গাঙ্ গোয়েটে।

॥ দুই ॥

বিশ্বভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বিচার করতে গেলে গোয়েটের কথা আপনা থেকেই মনে পড়ে। গোয়েটেও মুখ্যত সাহিত্যিক এবং তাঁর প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের মতই বিচিত্রমুখী। গদ্য এবং পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধহস্ত; জার্মান সাহিত্যের প্রায় এমন কোন বিভাগ বা শাখা প্রশাখা নেই, যার উপরে তাঁর প্রতিভা আপন স্বাক্ষর রাখেনি। তিনিও কিছুকাল চিত্রকলার চর্চা করেছিলেন; তবে রবীন্দ্রনাথের মত বৃদ্ধ বয়সে নয়, প্রথম যৌবনে। তাঁর বিজ্ঞান সাধনা রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অধিকতর তন্নিষ্ঠ; উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং অঙ্গসংস্থান শাস্ত্রে তাঁর গবেষণা সমকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল; এমন কি পদার্থ বিজ্ঞানও তাঁর নজর এড়ায়নি। রবীন্দ্রনাথ যেমন গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বভারতী, গোয়েটেও তেমনি গড়ে তোলেন হ্বাইমারের রঙ্গমঞ্চ। শুধু কি তাই? মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি হ্বাইমারের অন্যতম মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। অর্থ, কৃষি এবং খনিজ সম্পদের দপ্তর তাঁর অধীনে ছিল। দশ বছর ধরে এ দায়িত্ব তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিস্তর চিন্তা এবং চেষ্টা করেছিলেন। ফলত রবীন্দ্রনাথের মত গোয়েটেও ছিলেন জীবন শিল্পী এবং মুখ্যত তাঁরা উভয়েই সাহিত্যিক হলেও সাহিত্য তাঁদের কাছে জীবনেরই একটি দিক হিসেবে দেখা দিয়েছিল, জীবনের চাইতে বড় বলে স্বীকৃত হয়নি।

তা ছাড়া যে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে গোয়েটে এবং রবীন্দ্রনাথ দেখা দিয়েছিলেন সেখানেও তাঁদের মধ্যে আশ্চর্য মিল চোখে পড়ে। গোয়েটের জন্ম সতেরোশ উনপঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে। জার্মানীর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন তখনও গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। তাঁর বয়ঃপ্রাপ্তির যুগে জার্মানীর সাংস্কৃতিক জীবনে ইয়োরোপীয় রনেসাঁস্ আন্দোলনের কিছু কিছু প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। কাণ্টের যুক্তিবাদী দর্শন, হ্বিংকেল্‌মানের শিল্পতত্ত্ব, লেসিঙ্-এর সাহিত্য বিচার এবং হার্ডার-এর ইতিহাস তত্ত্বের মারফৎ প্রাচীন গ্রীস এবং আধুনিক ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালি জার্মান মানসে প্রবেশ লাভ করে। রিফর্মেশন্

জার্মানীকে রনেসাঁসের মহৎ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল।[২] এঁদের প্রয়াসে আঠার শতকে জার্মানীতে সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এঁদের কর্ষিত জমিতে ফসল ফলালেন গোয়েটে। তিরাশি বছর-ব্যাপী দীর্ঘজীবনের প্রচেষ্টায় জার্মানীকে তিনি রনেসাঁসের উত্তরসাধকদের মধ্যে প্রধান করে তুললেন। তাঁর পূর্বে জার্মানীতে সাহিত্য বলতে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না; যেমন দরিদ্র ছিল জার্মান ভাষা তেমনি অপুষ্ট ছিল জার্মান মানস। গোয়েটে জার্মান সাহিত্যকে প্রাদেশিকতার স্তর থেকে বিশ্বসাহিত্যের স্তরে পৌঁছে দিলেন; দেখা গেল প্রকাশ ক্ষমতায় জার্মান ভাষা অন্যান্য প্রধান ইয়োরোপীয় ভাষার চাইতে খুব খাটো নয়। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে জার্মান মন ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ এবং পরিপুষ্ট হয়ে উঠল। রনেসাঁসের মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য যখন ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে ক্ষীণ হয়ে আসছিল, গোয়েটে তাতে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করলেন। শুধু জার্মানীরই উজ্জীবন ঘটালেন না, নিয়ে এলেন ইয়োরোপের পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি।

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক পটভূমি এদিক থেকে গোয়েটের পটভূমির সঙ্গে অনেকটা এক। গোয়েটে মারা যান আঠারশ বত্রিশ সালে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম তা থেকে প্রায় তিরিশ বছর পরে, আঠারশ একষট্টিতে। রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে ভারতবর্ষের দশা প্রায় একশ বছর আগে গোয়েটের জন্মকালে জার্মানীরই সমান। এদেশের স্থবির সমাজ এবং জীবনবিমুখ সংস্কৃতির উপরে পশ্চিমী রনেসাঁসের ধাক্কা সবে তখন ঢেউ তুলেছে। কাণ্ট, হ্বিঙ্কেল্‌মান, লেসিঙ্‌ এবং হার্ডার যেমন ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রাচীন গ্রীস ও রোম এবং আধুনিক ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের চিন্তাকে জার্মানীতে স্বাগত করেছিলেন, এদেশে তেমনি রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, লোকহিতবাদী ফুলে, মাইকেল (এবং গোড়ার দিকে বঙ্কিম) প্রমুখ সংস্কারক এবং সাহিত্যিকেরা ইয়োরোপের নবাগত সংস্কৃতির ধারাকে এদেশের ভূমিতে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করছেন। ভারতবর্ষের বহুবিলম্বিত রনেসাঁস আন্দোলনের উপক্রমণ কাল হিসেবে উনিশ শতকের প্রথম সত্তর বছর তাই বিশেষ স্মরণীয়। কিন্তু এঁরাও শুধু ভূমিকাই রচনা করতে পেরেছিলেন; তার বেশী এগোতে পারেন নি। এই ভূমিকার নির্দেশ অনুসরণ করে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাবার দায়িত্ব নিয়ে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম দিকে এ দায়িত্ব তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। উনিশ

শতকের শেষদিক থেকে এদেশে জিজ্ঞাসা বিরোধী যে আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে (বাংলা দেশে সে আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন প্রথমে বিবেকানন্দ এবং পরে অরবিন্দ), রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পর্যন্ত তার প্রভাব অনেকটাই এড়াতে পারেন নি। বিশ শতকের সূচনা পর্যন্ত তাই তাঁর রচনায় এবং কাজকর্মে রক্ষণশীল জাত্যভিমান এবং অভ্যাসাশ্রয়ী ধর্মসংস্কারের মনোভাব চোখে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন এই আত্মঘাতী সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আশ্রয় পায়নি। যতই তাঁর বয়স বেড়েছে ততই তাঁর চিন্তায় এবং ব্যবহারে উনিশ শতকের অসমাপ্ত রনেসাঁসের দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ফলত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন অনুধাবন করলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে পুরোপুরি না হলেও মুখ্যত রবীন্দ্রনাথ গোয়েটের মতই রনেসাঁসের উত্তরসাধক এবং আধুনিক ভারতের, বিশেষ করে আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে তাঁর একক দান বাকী সকলের সমবেত দানের চাইতে বেশী। গোয়েটের মত রবীন্দ্রনাথও আমাদের শিক্ষিত সমাজকে সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিকতার সংস্কার থেকে মুক্ত করে বৈশ্বিকতার বোধে উদ্‌বুদ্ধ করলেন; মাতৃভাষার অপুষ্টতা এবং আড়ষ্টতা দূর করে তাকে মহৎ প্রকাশের মাধ্যমে রূপান্তরিত করলেন। গোয়েটের মত রবীন্দ্রনাথও তাই তাঁর আপন মাতৃভাষা এবং সংস্কৃতির জনক না হলেও মুখ্য ভর্তা।

॥ তিন ॥

যেহেতু গোয়েটে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আপন আপন দেশে রনেসাঁসি ঐতিহ্যের প্রধান উত্তরসাধক, সে কারণে তাঁদের উভয়ের মানসিক গঠনেও যে বহু মিল থাকবে এটা সহজেই অনুমান করা যায়। উভয়েই যুক্তিবাদী, ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ মূল্যে বিশ্বাসী এবং বিশ্বমানবতার অকুণ্ঠ সমর্থক। গোয়েটের যুক্তিবাদ তাঁকে মুগ্ধ রোমান্টিক একদেশদর্শিতার প্রভাব থেকে মুক্ত করেছিল। "গোয়েট্‌স্ ফন্ বের্‌লিখিঙ্গেন" অথবা "হ্বের্‌টরের দুঃখ" কাহিনী লিখে তিনি ফুরিয়ে যান নি, "হ্বিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্টার", "ইফিগেনী" এবং "ফাউস্ট"-এ ক্লাসিক ও রোমান্টিকের সার্থক সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন; রুসোর কাছে দীক্ষা নেওয়া সত্ত্বেও দিদেরোর শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবনে তাঁর কিছু মাত্র অসুবিধা হয়নি।

২। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও যুক্তিবাদ একদিকে তাঁকে বৈষ্ণব ভাবালুতার হাত থেকে অনেকখানি রক্ষা করেছে, অন্যদিকে এরই জোরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে জয় করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ তাই পানু বাবুর চরিত্র আঁকতে কুণ্ঠা বোধ করেননি; ধার্মিক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'চতুরঙ্গে'র নাস্তিক জ্যাঠামশাইকে শ্রদ্ধা জানানো সহজ হয়েছিল। এমন কি গান্ধীকে মহাত্মা বলে ঘোষণা করার পরেও তিনি 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তাঁর যুক্তিবিরোধী মনোভাবের তীক্ষ্ণ সুচিন্তিত প্রতিবাদ করতে পেরেছিলেন।[৩] তিনি নিশ্চিত করে বুঝতে পেরেছিলেন যে "ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে বিচিত্র এবং বিস্তীর্ণভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়" (সমাধান)। এরাজ্‌মুস্‌-শিষ্য গোয়েটে ধর্মান্ধতার মূঢ়তা থেকে মুক্ত হবার জন্য জার্মানীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। রামমোহনের উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের হিন্দুদের স্মরণ করতে বললেন, "আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে ঘৃণা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করেছি এবং সকল প্রকার বুদ্ধি যুক্তিকে একেবারে লঙ্ঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে।" (পত্র, ২০শে আষাঢ়, ১৩১৭)। তাঁর সত্য ভাষণ তাই বারবার এদেশের জড়বুদ্ধিকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছে। বুদ্ধির এই জড়তাকে তিনি আঘাত করেছেন 'অচলায়তনে', 'তাসের দেশে', শিক্ষা, ধর্ম এবং রাজনীতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে। বারবার তিনি আমাদের স্মরণ করিয়েছেন, "অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব কোনো জাতি কখনো ভালো করে বুঝতেই পারবে না, বহন করা দূরের কথা" (সমাধান)। তাঁর একেবারে শেষের দিকের লেখা 'ল্যাবোরেটরী' গল্পটি দুঃসাহসী মুক্তবুদ্ধির এক আশ্চর্য উদাহরণ। এই যুক্তিশীলতার জোরেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন, 'মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা…কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরমপদ অধিকার করিতে চায়

৩। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

তখন তাহার মত মননে বাধা আর কি হইতে পারে! কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না—তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে। তখন চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়া রচিত, তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৫০৬-৭)।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ এবং তিলকের যুগে জন্মেও এই যুক্তি-শীলতার সামর্থ্যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁদের প্রভাব অতিক্রম করে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের ভাবগত আত্মীয়তা অর্জন সম্ভব হয়েছিল।[৪] তাই ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পের পর গান্ধীজী যখন ঘোষণা করলেন যে এ বিপর্যয় নাকি অস্পৃশ্যতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ভগবানের ইচ্ছায় ঘটেছে তখন অন্যেরা চুপ করে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ সেই যুক্তিহীন ঘোষণার প্রবল প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেননি। অন্যদিকে এই সত্যনিষ্ঠা তাঁকে "আনন্দ মঠের" চোরাবালি থেকে রক্ষা করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মত বুদ্ধিমান লোকও যখন "যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই তো মা সেই ধন্য দেশ!" জাতীয় দেশাভিমানের বুলি দিয়ে সস্তায় বাজী মাতের চেষ্টা করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক চরিত্র আঁকতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করেন নি। ফলে গোয়েটের মত তাঁকেও আপন দেশবাসীর কাছে বিস্তর ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে। তিনি যে স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হিসেবে আবেদন নিবেদন কিংবা জোরজবরদস্তির চাইতে বিচারবিশ্লেষণ এবং শিক্ষাবিস্তারকে শ্রেয় জেনেছিলেন, দেশের উন্নতির জন্য বিদেশী বর্জনের পন্থায় ভরসা না রেখে সমবায়-ভিত্তিক সংগঠনের আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন—এ সবের মধ্যে তাঁর সুদূরপ্রসারী যুক্তিশীলতার প্রত্যক্ষ পরিচয় চোখে পড়ে।

॥ চার ॥

পশ্চিমী রনেসাঁসের ইতিহাস যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন রনেসাঁসী দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ মূল্য বিষয়ে বোধ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। ব্যক্তিমাত্রই অনন্য : প্রতি ব্যক্তির মধ্যে যে মুক্তিস্পৃহা বর্তমান,

৪। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

তার স্ফুরণ ছাড়া সমাজের অগ্রগতি অসম্ভব: ব্যক্তির বিকাশ সর্ববিধ কল্যাণের মূল উৎস। গোয়েটের প্রথম বয়সের খণ্ড রচনা "মাহমেট-এর গান" এবং 'প্রমেথেয়ুস' থেকে শুরু করে শেষ বয়সের রচনা 'ফাউস্টের' দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত সর্বত্রই ব্যক্তিসত্তার মুক্তিতৃষ্ণা প্রবল প্রাচুর্যে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে হ্বিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্টারএর মহাকাহিনীতে গোয়েটে সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়েছেন, প্রতি মানুষই বিচিত্র সম্ভাবনার আকর এবং চরিত্র মাত্রই, প্রধান হোক বা অপ্রধান হোক, আপন প্রাতিস্বিকতায় অনন্য। "একরমানের সঙ্গে আলাপে" তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "আমি চিরদিন প্রত্যেক মানুষকে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে জ্ঞান করেছি, বুঝতে চেয়েছি কোথায় তার স্বকীয়তা, সামান্যের মধ্যে তাকে মিশিয়ে দিতে চাইনি।" অন্যত্র লিখেছেন "এই জগৎ এমন আশ্চর্যভাবে তৈরি যে প্রত্যেকটি মানুষ তার আপন স্থান-কালে অন্যসব মানুষের চাইতে বড়।" কান্টের মত গোয়েটেও জানতেন প্রতি মানুষ নিজেই একটি চরম উদ্দেশ্য—তাকে অন্য কোন উদ্দেশ্যের উপায় হিসাবে ভাবলে তার চাইতে মারাত্মক ভুল আর কিছু হতে পারে না। গোয়েটে তাই ঈশ্বর, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র, সব কিছুর উপরে প্রধান করে ধরেছেন মানুষকে, ব্যক্তি-মানুষকে, যে ব্যক্তি-মানুষ সমাপ্তিহীন বিকাশের অভীপ্সায় নিত্য সক্রিয়। "হ্বিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্টারের ভ্রমণকাহিনীতে" গোয়েটে যাকে "দার্শনিকের ধর্ম" বলেছেন, তার মূল কথা হল সব মানুষকে আপন মূল্যে মূল্যবান বলে ভাবতে শেখা। এই দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই গোয়েটে পেরেছিলেন কান্টের সঙ্গে দিদেরোকে মেলাতে, পেরেছিলেন একই সঙ্গে লিখতে "হ্বিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্টারের শিক্ষানবিশী" এবং "হারমান ডোরোতেয়ার" কাব্য-কাহিনী।

ব্যক্তির স্বকীয় মূল্য বিষয়ে বোধ রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনেরও অন্যতম মুখ্য সূত্র। তাঁর কাব্যে এটি হয়ত সব সময়ে তত স্পষ্ট নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনায়, বিশেষ করে তাঁর বহু ছোট গল্পে এই বোধ যেমন গভীর, তেমনই প্রত্যক্ষ। আমার ধারণা, অন্য বৈশিষ্ট্য যদি নাও থাকত, শুধু এই গুণেই ছোট গল্পের লেখক রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও অমর হয়ে থাকবেন। কোন মানুষই যে সামান্য নয়, প্রতি মানুষের মধ্যেই যে অক্ষয় সম্পদের সম্ভাবনা নিহিত আছে এবং সেই সম্ভাবনা বিষয়ে সচেতন হওয়ার দ্বারাই মানুষ আপনাকে সমৃদ্ধ করে তোলে—

মানবতন্ত্রের এই মূল প্রত্যয়টিকে রবীন্দ্রনাথ গোয়েটের মতই নানাভাবে, নানারূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ করে 'পরিশেষ' এবং 'পুনশ্চে' এই দুয়টি প্রত্যক্ষভাবে প্রধান। 'বাঁশি' কবিতায় লিখেছেন,

হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।

এই জ্ঞান থেকেই সাহিত্যের জন্ম, জন্ম মানবতার। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের রচনা "পঞ্চভূতের ডায়েরী"র এক জায়গায় একটি ঠিকা মুহুরী যুবকের করুণ কাহিনী প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন খুব মহৎ; তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোন কবি অনুমান করে নাই, কোন পাঠক স্বীকার করে নাই, তাই বলিয়া সে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না—একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিল। কিন্তু খোরাক-পোষাক সমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারো মাস নহে।" গোয়েটে তাঁর 'হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্টারের ভ্রমণ কাহিনী"তে লিখেছিলেন, "দার্শনিক সব মানুষকেই নিজের সমান বলে ভাবতে পারেন, কোন মানুষকে তিনি তুচ্ছ মনে করেন না। জগতের প্রতিটি ব্যক্তিকেই তিনি অনন্য বলে স্বীকার করেন, তাই তিনি সত্যাগ্রহী।" রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক রচনায় মানবধর্মের এই দিকটি সব সময় হয়ত অতটা স্পষ্ট স্বীকার লাভ করেনি—ব্যক্তির প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের চাইতে মানবীয় ঐক্যের উপরে তিনি বেশী জোর দিয়েছেন—কিন্তু তাঁর গল্প কাহিনীতে এ বোধ যেমন গভীর তেমন স্পষ্ট। রতন, রামকানাই, রাইচরণ, কাবুলীওয়ালা, চন্দরা, 'দিদি' গল্পের শশী, 'মাস্টার মশাই' গল্পের হরলাল—প্রতিটি চরিত্রই আপাতদৃষ্টিতে সামান্য ব্যক্তির মধ্যে যে অসামান্যতা নিহিত থাকে, তারই উদাহরণ। 'সবুজ পত্রের' যুগের গল্পগুলিতে এই বোধ আরও প্রবল, আরও পরিস্ফুট। ধর্ম, সমাজ, পরিবার, প্রথা ইত্যাদির নির্বিবেক দাবির সামনে এদেশে যেভাবে ব্যক্তিকে সাড়ম্বরে বলি দেওয়া হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের-প্রতিবাদ এই যুগের গল্প কাহিনীগুলিতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। এই বলিদান যে কত নিরর্থক, বেদনাকরুণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বারবার তা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বাংলা দেশে রামমোহন

এবং বিদ্যাসাগরে যে বোধের স্ফুরণ ঘটেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা যার দ্বারা কিছু পরিমাণে বিচলিত হলেও যাকে যথার্থভাবে গ্রহণ এবং পোষণ করতে পারেননি, রবীন্দ্রনাথের এ যুগের গল্প কাহিনীতে তা সম্যক পুষ্টি এবং পরিণত প্রকাশ লাভ করেছে। 'হালদারগোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদি এই যুগের রচনা। 'স্ত্রীর পত্রে'র মেজ বউ বিয়ের পনের বছর পরে তার স্বামীকে চিঠি লিখেছিল, "আমি তোমাদের মেজবউ। আজ পনের বছর পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে···আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাই-পাঁশ যাই হোক না কেন সেখানে তোমাদের অন্দর-মহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি, আমি। ···তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে···বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই।···এইবার মরেছে মেজবউ আমি বাঁচলুম।"[৫] এ সেই বাঁচা যে বাঁচার আহ্বান গোয়েটে তাঁর সমস্ত রচনায় ধ্বনিত করেছিলেন। এরই ডাকে ইব্‌সেনের নায়িকা তার পুতুল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। মানুষ যে সমাজ পরিবারের ছাপমারা জীব মাত্র নয়, সে যে ব্যক্তি, সে যে বিশেষ, তার মধ্যে যে অসামান্যতা লুকিয়ে আছে, মহৎ সাহিত্য পাঠের ফলে এই ভুলে-যাওয়া সত্যকে আমরা ফিরে ফিরে আবিষ্কার করি। সাহিত্যিক "শ্যামলী"র সেই 'বাঁশিওয়ালা' যার ডাক শুনে

একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী।

॥ পাঁচ ॥

যুক্তিকে যাঁরা জীবনের কেন্দ্রে স্থাপিত করেছেন, ব্যক্তির মূল্য যাঁদের বিবেকে স্বতঃসিদ্ধ, তাঁদের পক্ষে কোন ক্ষুদ্রতার গণ্ডির মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। গোয়েটে এবং রবীন্দ্রনাথ তাই আপন সমাজের উজ্জীবনে

৫। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

প্রধান অংশ নিয়েও আপন জাতিকে মানব জাতির চাইতে বড়ো বলে ভাবতে পারেননি। জাতীয়তার সঙ্গে বিশ্বমানবতার বিরোধ যে কত গভীর, গোড়ার দিকে এঁদের দুজনের কারো কাছেই সেটা খুব স্পষ্ট ছিল না। গোয়েটের জীবনে সে বোধ রবীন্দ্রনাথের চাইতে কিছু আগে এসেছিল। ফরাসীর কাছে জার্মানীর পরাজয়কে তাই তিনি স্বাগত করতে পেরেছিলেন। গভীর সত্যাশ্রয়িতার জোরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ফরাসীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নয়, ফরাসীর কাছ থেকে গ্রহণ করে তবেই জার্মানী যথার্থ বড়ো হয়ে উঠতে পারবে। একথা বলার জন্য সেদিন দেশবাসীর হাতে তাঁকে প্রচুর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য তিনি তাঁর নিজের গভীরতম প্রত্যয়কে গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। তিনি লিখেছিলেন, "মুক্তিই মানুষের মূল সাধনা এবং সে সাধনার সামনে জাতিতে জাতিতে ভেদের সীমারেখা লোপ পেতে বাধ্য। এই সাধনার পথে মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার শিল্প এবং সাহিত্য, তার বিজ্ঞান এবং নীতিবোধ। এর কোনটিই জাতীয় ভেদবুদ্ধির দ্বারা চিহ্নিত নয়; এদের মধ্যে পৃথিবীর সব যুগের সব মানুষের মন এসে মিলিত হয়েছে।" অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "বিজাতি-বিদ্বেষের উদ্ভব সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি থেকে। মন যেখানে অপরিণত, এ মনোভাব সেখানে খুব প্রবল।... মনের যত বিকাশ ঘটে, এ মনোভাব ততই দুর্বল হয়ে আসে। আমরা বুঝতে শিখি আমরা এবং আমাদের প্রতিবেশীরা একই মানবজাতির অন্তর্গত; শিখি তাদের দুঃখদুর্দশাকে আমাদের দুঃখদুর্দশা বলে ভাবতে।" গোয়েটে অবশ্যই জার্মানীকে ভালবাসতেন, কিন্তু দান্তের মত তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সমস্ত পৃথিবীই তাঁর স্বদেশ। জার্মানীর চিৎ-প্রকর্ষের জন্য ইংরেজ, ফরাসী, ইতালীয়, গ্রীক কারো কাছ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করায় তাঁর সঙ্কোচ হয়নি। "একরমানের সঙ্গে আলাপ"-এ তিনি বলেছেন, "কবির মন কোনো ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাঁধা থাকতে পারে না; যেখানে তার কাব্যের উপাদান মিলবে, সেখানে তার দেশ। ঈগল পাখীর মত আকাশ থেকে সে পৃথিবীকে দেখছে—শিকার পাওয়া নিয়ে তার ভাবনা, সে শিকার প্রশিয়ায় মিলল না সাক্সনিতে তাতে কি আসে যায়।"

জাতীয়তার মোহ থেকে মুক্ত হতে গোয়েটের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কিছু বেশী সময় লেগেছিল, কিন্তু মুক্ত যে তিনি হয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর 'গোরা', উপন্যাস, 'কালান্তরের' প্রবন্ধাবলী, 'ন্যাশন্যালিজ্‌ম্' 'মানুষের ধর্ম' ইত্যাদি

বক্তৃতা, বিদেশ থেকে এণ্ড্রুজ সাহেবকে লেখা চিঠিপত্র এবং বিশেষ করে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান। এই শতাব্দীর সূচনায় বাঙলাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যখন প্রাবল্য ঘটে, রবীন্দ্রনাথও তাতে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। .উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে বঙ্কিমচন্দ্র, রাজানারায়ণ বসু, বিবেকানন্দ প্রভৃতির প্রভাবে বাঙালী জাতীয়তাবোধের মধ্যে হিন্দুত্বের ভাবটি বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল। তারপর এ শতকের গোড়ায় কাকুজো ওকাকুরা, কুমারস্বামী, নিবেদিতা ইত্যাদির ঘোষণার ফলে এশিয়ার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে ধারণা এই আন্দোলনকে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি বিমুখ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথও এ যুগে হিন্দু জাতীয়তার সমর্থনে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। (দ্রষ্টব্য, ১৩০৮ সালের বঙ্গদর্শনে 'নকলের নাকাল', 'হিন্দুত্ব' ইত্যাদি প্রবন্ধ)। 'নৈবেদ্য'র অনেকগুলি কবিতা মূলত এই সুরে বাঁধা ; তাঁর অধিকাংশ স্বদেশী গান এই যুগের রচনা। ত্রিপুরার মহারাজকুমারকে ১৩০৮ সালের একটি চিঠিতে লিখেছেন : "বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ।" কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব তাঁকে বেশীদিন আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে নি। এমন কি 'নৈবেদ্য'-র, (১৩০৮) মধ্যেই তিনি জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ রূপটির কথা উল্লেখ করেছেন।

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে। (নৈবেদ্য, ৬৫)

অথবা

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়। (ঐ, ৬৪)

তবে এ যুগে যে-জাতিপ্রেমকে তিনি আক্রমণ করেছেন, সেটি মুখ্যত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রদের জাতিপ্রেম যার বীভৎস প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদে, বুয়র যুদ্ধে, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দুর্বল দেশের উপরে পশ্চিমের নির্বিবেক অত্যাচারের মধ্যে।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর এদেশে স্বাজাত্যবোধের যে আত্মঘাতী রূপ ক্রমে প্রকট হয়ে উঠতে লাগল, তা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের মত যুক্তিশীল এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে হিন্দুয়ানী-ঘেঁসা জাত্যভিমানকে আঁকড়ে থাকা বেশীদিন সম্ভব হ'ল না। ১৩১৪-১৫ সালে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে স্পষ্ট

পরিবর্তনের সূচনা চোখে পড়ে। ঐ সময়ে লেখা 'ব্যাধি ও প্রতিকার', 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা', 'পূর্ব ও পশ্চিম' ইত্যাদি প্রবন্ধের মধ্যে যে নূতন প্রত্যয় ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার একদিকে আছে ব্যক্তিমানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে সর্বমানবীয় ঐক্যে আস্থা। 'ব্যাধি ও প্রতিকার'-এ তিনি লিখেছেন, "· যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে।" অন্যদিকে ১৩১৯ সালে "সংগীত" প্রবন্ধে লিখেছেন, "য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সংগীতকে আমরা সত্য করিয়া বড়ো করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিব।" "আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্বোধন দেখা যাইতেছে, তাহার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে।" 'গোরা' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৩১৪-১৬ সালে। বিবেকানন্দ-অরবিন্দ প্রবর্তিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের সুগভীর ব্যর্থতা এই বিরাট উপন্যাসটির মূল ভাবসূত্র। 'গোরা'র পর থেকে ক্রমেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বিশ্বমানবতাবোধ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এই বোধের বলিষ্ঠতম প্রকাশ জাপান এবং আমেরিকায় ১৯১৬ সালে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী। এই বক্তৃতাগুলি পরে ১৯১৭ সালে "ন্যাশন্যালিজ্‌ম্" এবং "পার্সোন্যালিটি" নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন লেখার সঙ্গে যদি আমাদের পরিচয় নাও থাকত, শুধু এই দুটি বইয়ের জোরেই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারতাম যে বিশ্বমানবিকতার ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ গোয়েটের মহৎ উত্তরসাধক।

"ন্যাশন্যালিজ্‌ম্" প্রবন্ধমালায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে দেখালেন যে জাতীয়তা একদিকে মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার মনুষ্যত্বকে গণ্ডিবদ্ধ করে, অন্যদিকে এক কাল্পনিক সমষ্টির হাতে ব্যক্তিকে বলি দিয়ে মানুষের সমস্ত সৃষ্টিশীল বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। 'নেশন' যে ব্যক্তিকে শুধু যন্ত্রে পরিণত করে তাই নয়, তার ভিত্তি ক্ষমতা এবং আতঙ্কের উপরে। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন, মানবতার খাতিরে আমাদের সোজা দাঁড়িয়ে সকলকে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে যে, জাতীয়তা এক নিষ্ঠুর মহামারী, এই পাপ ব্যাধি আজ মানবজগতে ছড়িয়ে পড়ে তার নৈতিক প্রাণশক্তিকে জীর্ণ করে ফেলছে। ("...for the sake of humanity, we must stand up and give warning to all that Nationalism is a cruel epidemic of evil

that is sweeping over the human world of the present age and eating into its moral vitality.")

জাতীয়তা যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়, তবে কোন্ বিকল্প প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানুষের সমাজ গড়ে উঠবে? এখানেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত গোয়েটের অনুগামী। সভ্যতার প্রথম ভিত্তি, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, জাতির হাত থেকে মুক্তি পাবার পর মানুষের নবজন্ম ঘটবে—বিমূর্ত কল্পনার অস্পষ্ট আবরণ থেকে আপন ব্যক্তিসত্তায় মানুষ মুক্তি পাবে। ("…man will have his new birth, in the freedom of his individuality, from the enveloping vagueness of abstraction.") "পার্সোন্যালিটি" বক্তৃতামালায় রবীন্দ্রনাথ নানা দিক থেকে এই ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করার সঙ্গে মানুষ মানুষে যে ঐক্যের সম্পর্ক তাকেও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই ঐক্য সাধিত হবে বুদ্ধি এবং প্রেম, শিল্প এবং বিজ্ঞান, দর্শন এবং শিক্ষার মধ্য দিয়ে। ১৯২০ সালে ২৫শে নবেম্বর এণ্ড্রুজ সাহেবকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, আমাদের জায়গা করতে হবে মানুষের জন্য, যে মানুষ এ যুগের অতিথি; জাতি যেন তার পথ আটকে না দাঁড়ায়। ("We must make room for MAN, the guest of this age, and let not the NATION of this age obstruct his path.") আর একটি চিঠিতে লিখছেন, "জাতিপ্রেমের অহঙ্কার তার বিপুলতাকে নিয়ে। যে প্রভেদ মৌলিক তাকেও সে মানতে চায় না।…ক্ষমতার নির্ভর সংখ্যা এবং আয়তন।… সে ঐক্যের কথা বলে কিন্তু ভুলে যায় যে মুক্তির মধ্যেই যথার্থ ঐক্য। সকলকে এক ছাঁচে ফেলে যে ঐক্য সে ঐক্য বন্ধনের। ("…patriotism is proud of its bulk. It would not acknowledge a difference which was fundamental…power lies in number and in extension… It talks of unity but forgets that true unity is that of freedom. Uniformity is unity in bondage.) "গোয়েটের মত রবীন্দ্রনাথও হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, মানুষের ঐক্য মানুষের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে তার মধ্যে সঙ্গতি ঘটিয়ে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা তাই জাতীয়

৬। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

সমষ্টিবাদের বৃহত্তর সংস্করণ নয়, তার ভিত্তি স্বাধীনতা এবং সহযোগ। এই তত্ত্ব তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন তাঁর ১৯২০-২১ সালে ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিতে; পরে এগুলি Creative Unity নামে প্রকাশিত হয়। এই সৃষ্টিধর্মী ঐক্যের ভিত্তিতেই তিনি বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করেন।[৭]

ফলত রবীন্দ্রনাথ এবং গোয়েটে উভয়েই আপন দেশ এবং দেশের মানুষকে ভালবেসে সে দেশকে "ভৌগোলিক পৌত্তলিকতার" ঊর্ধ্বে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। "আমরা বিশ্বের মানুষ, কেবলমাত্র দেশের মানুষ নই।" (সবুজপত্র, ভাদ্র, ১৩২৮)। তাঁদের আপন আপন দেশবাসী কিন্তু তাঁদের এই মুক্তবুদ্ধিকে স্বাগত করতে পারে নি। গোয়েটেকে সারাজীবন এজন্য আক্রমণ সইতে হয়েছে; তবু তিনি নির্ভয়ে ঘোষণা করেছিলেন, "জাতীয়তা এবং সভ্যতা পরস্পরের আমরণ শত্রু।" দেশবাসীর দৃষ্টিকে স্বাজাত্যের ঊর্ধ্বে তোলার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকেও কম বিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি। প্রথম যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, এমনকি সাময়িকভাবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল; মধ্য যুগে চিত্তরঞ্জন দাশ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর মৃত্যুর পরে বাঙলা দেশের কমিউনিস্টরা পর্যন্ত তাঁর বিশ্বমানবতাকে নানাভাবে সমালোচনা করেছেন।[৮] সমসাময়িক জার্মানী গোয়েটেকে যথেষ্ট সমীহ করত, কিন্তু তার মন কেড়েছিলেন আবেগবিলাসী দেশপ্রেমী কবি শিলার। বাঙলা দেশও রবীন্দ্রনাথকে বিস্তর সম্মান দেখিয়েছে, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী ছেলেমেয়ের ভালবাসা যিনি পেয়েছিলেন তিনি "গোরা" কি "চার অধ্যায়"-এর লেখক নন, তিনি "পথের দাবী"র লেখক শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের এই সাফল্যের কারণ বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধের পাশে শরৎচন্দ্রের "শিক্ষার বিরোধ" প্রবন্ধটি পড়া দরকার। গোয়েটের মত রবীন্দ্রনাথও জানতেন তাঁর দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁর চিন্তাকে গ্রহণ করে নি এবং সঙ্গে সঙ্গে গোয়েটের মত একথাও তিনি বুঝেছিলেন, "আমি ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার জাত যাবে।" এ জাত-শিল্পীর, সত্যসন্ধের, মুক্তিসাধকের, মানবতন্ত্রীর জাত। এই জাতের কথা মনে রেখেই

৭। প্রবন্ধের শেষে টীকা।
৮। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

রলাঁ। তাঁর বিখ্যাত ঘোষণাপত্র লিখেছিলেন, "আমরা শুধু সত্যকেই সেবা করি, যে সত্য স্বাধীন, যার কোন ভৌগোলিক সীমা নেই, কোন গণ্ডি নেই, কোন জাতিবর্ণের সংস্কার নেই।" এ ঘোষণাপত্র গোয়েটে এবং রবীন্দ্রনাথেরও ঘোষণাপত্র।

॥ ছয় ॥

অর্থাৎ শুধু যে প্রতিভার বহুমুখিনতায় অথবা ঐতিহাসিক পটভূমির দিক থেকে গোয়েটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল আছে তাই নয়, রনেসাঁসের উত্তরসাধক হিসেবে তাঁরা মানবতন্ত্রী সাধনার ক্ষেত্রেও মিলিত হয়েছিলেন। সত্যসন্ধিৎসা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিশ্বমানবতার প্রত্যয়ে তাঁদের সমধর্মিতার কথা আগেই বলেছি; তাছাড়া মানবতন্ত্রী দর্শনের আরো কোনো কোনো মূল প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও তাঁদের মিলন ঘটেছিল। তাঁরা উভয়েই বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে যা যুক্তিশীলতারূপে বিদ্যমান তা আসলে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলারই একটি দিক। অপরপক্ষে প্রকৃতির গতিশীলতা মানুষের মধ্যে মুক্তিস্পৃহার আকার নিয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে এত যে বিচিত্র রূপের বিবর্তন ঘটে তার পেছনে শৃঙ্খলা এবং গতি দুই-ই সক্রিয়। মানুষের মধ্যেও তেমনি যুক্তি এবং মুক্তি দুয়ের প্রতিঘাত ও সমন্বয়ের ফলে বিকাশ এবং সৃষ্টি সম্ভব হয়। ফলে উভয়েরই বিশ্ববীক্ষায় ক্লাসিক ও রোমান্টিকের সম্যক মিলন ঘটেছিল। তাছাড়া মানুষের বিকাশ যে আত্মনিগ্রহের পথে নয়, সুষমিত সম্ভোগের পথে, জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নয়, জগতের সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্ক স্থাপন করে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে নয়, ইন্দ্রিয়বর্গের সূক্ষ্মতা সাধন করে—মানবতন্ত্রী নীতিশাস্ত্রের এই মূল কথাটি রবীন্দ্রনাথ ও গোয়েটের জীবন এবং সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য সূত্র। গোয়েটে কাণ্টের কাছ থেকে শিখেছিলেন মানুষ নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, তার মূল্য স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু কাণ্ট যখন নিয়মানুগত্যের উপরে অতিরিক্ত জোর দিয়ে রনেসাঁসি সম্ভোগতত্ত্বের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান নিগ্রহতত্ত্বকে সমর্থন করলেন, তখন গোয়েটে তাঁর গুরুর নির্দেশ অস্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। জীবনের সার্থকতা বিকাশে এবং সম্ভোগ ছাড়া বিকাশ অসম্ভব—এ প্রত্যয় গোয়েটের জীবনশিল্পের একটি প্রধান সূত্র, তাঁর সমস্ত রচনার একটি মূল সুর। তাঁর তরুণ বয়সের অসমাপ্ত রচনা 'প্রমেথেয়ুস'-এ এ প্রত্যয়কে

তিনি আশ্চর্য কাব্যরূপে ঘোষিত করেছিলেন; তারপর তাঁর বিরাট আত্ম-জীবনীতে (যার নাম দিয়েছিলেন "ডিখ্‌টুঙ উণ্ট্‌ হ্বার্‌হাইট"—কবিতা ও সত্য), তাঁর "রোমিশে এলেগিয়েন্‌"-এ, "হ্বিলহেল্‌ম্‌ মাইস্টার" এর দুখণ্ডে, "হ্বিঙ্কেল্‌মানের জীবনী"তে, "ফাউস্ট" নাটকে, "পশ্চিম-পূব দিউয়ান"-এর কবিতাগুলিতে, "একরমানের সঙ্গে আলাপে", বার বার তিনি নানাভাবে এ সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমার বিশ্বাস তিনি যে চেলিনি এবং দিদেরোর লেখা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন তার কারণ বিশেষ করে এই প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে এঁরা ছিলেন তাঁর নিকট-আত্মীয় এবং এ প্রত্যয় যে বৃদ্ধকালেও তাঁকে ত্যাগ করে নি তার প্রমাণ চুয়াত্তর বছর বয়সে উলরিকার প্রেমে পড়ার পরে লেখা "মারীনবাড্‌-গাথা।"

অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথও বৈরাগ্যসাধনের মধ্যে মুক্তির সন্ধান পান নি। কৃচ্ছ্রতাসাধনকে তিনি বলেছেন 'নেতিধর্ম'; মানুষের পক্ষে এ নেতিধর্ম 'আত্মঘাতী'। রবীন্দ্রনাথের জীবনশিল্পে তাই প্রকৃতি এবং প্রেম এত উঁচুতে স্থান পেয়েছে; তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় নৃত্য-গীত চিত্রকলার তাই এত প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ কোনদিন মোহমুদ্গরের বৈরাগ্যতত্ত্ব অথবা গান্ধীজীর আত্মনিগ্রহ নীতিকে স্বাগত করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন, "মানুষের চিত্ত যেখানে সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থকে আপন শক্তির যোগে উদ্বোধিত করে···মানুষের সকলের চেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে, সে সৃষ্টিকর্তা।" এ যাঁর বিশ্বাস, নিগ্রহের নীতিকে তিনি কি করে মানুষের ধর্ম বলে স্বীকার করবেন।

এ ছাড়া আরও এক ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এবং গোয়েটের জীবনে কিছু মিল চোখে পড়ে। গোয়েটের যখন চল্লিশ বছর বয়স (১৭৮৯) তখন ফরাসী দেশে বিপ্লব শুরু হয়। রুশ দেশে বিপ্লব শুরু হবার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছাপ্পান্ন (১৯১৭)। রনেসাঁসের পর আধুনিক ইতিহাসের এই দুটিই সম্ভবত সবচাইতে স্মরণীয় ঘটনা। স্বভাবতই গোয়েটে এবং রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁদের আপন আপন যুগের ঐতিহাসিক বিপ্লব গভীর অনুরণন তুলেছিল। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে সে দেশে যে নবীন ভাবান্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে, গোয়েটের প্রথম যুগের বিভিন্ন রচনার উপরে তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

ভামির যুদ্ধে জার্মানরা যখন ফরাসীদের কাছে হেরে যায়, তখন গোয়েটে তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "জগতের ইতিহাসে আজ এক নতুন যুগের শুরু হল।" কিন্তু গোয়েটের যুক্তিবাদী মন ফরাসী বিপ্লবকে স্বাগত করেও তার মূল ত্রুটিকে লক্ষ্য করতে ভোলে নি। বল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যে বিপ্লব ঘটে, তা যে মানুষের স্থায়ী কল্যাণসাধনে অপারগ, প্রথম থেকেই সে কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সে বিপ্লবের প্রথম ফল বিশৃঙ্খলা এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত আসে জবরদস্তি। গোয়েটে জানতেন জ্ঞান এবং সহযোগিতার মধ্য দিয়েই মানুষের যথার্থ বিকাশ সম্ভবপর হয়। আবেগের আতিশয্যে মানুষ বড়ো জোর ভাঙতে পারে, কিন্তু গড়ার জন্য চাই জ্ঞান, ধৈর্য, নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ। যে কারণে তিনি একদা রোমান্টিক আতিশয্যকে পরিহার করে ক্লাসিক সংযমের সঙ্গে রোমান্টিক অভীপ্সার সমন্বয়ের মধ্যে মানুষের বিকাশ সাধনার সূত্র নির্দেশ করেছিলেন, সেই কারণেই ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করে নিয়েও তিনি তার মূঢ় বিক্ষোভকে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর সমকালীন বিপ্লববাদীদের অনেকে এজন্য তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল, এমন কি বিশ্বাসঘাতক বলে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু তাঁর সে সমালোচনার মধ্যে যে কতখানি দূরদর্শিতা ছিল, পরবর্তী কালে ফরাসী দেশের ইতিহাস তা বারবার প্রমাণ করেছে।

গোয়েটের মত রবীন্দ্রনাথের মনকেও তাঁর যুগের ঐতিহাসিক বিপ্লব গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ১৯৩০ সালে তিনি পক্ষকালের (১১-২৫ সেপ্টেম্বর) জন্য রাষ্ট্রের অতিথি হিসেবে রুশ দেশে যান, সেখানে তিনি যা দেখেন এবং দেখে তাঁর যা মনে হয়, মোটামুটি তার খতিয়ান পাওয়া যায় 'রাশিয়ার চিঠি' বইটিতে। জড়তা, লোভ, প্রবল অসাম্য, অত্যাচার এবং জাতিগত ভেদবুদ্ধির বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করার যে প্রতিশ্রুতি রুশ বিপ্লবের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল, তাঁর মত মানবতন্ত্রী যে তাকে অন্তর থেকে অভিনন্দিত করবেন এটি প্রত্যাশিত। সে প্রতিশ্রুতির মধ্যে যে কতখানি অসত্য মেশানো আছে, প্রত্যক্ষভাবে তা জানবার সুযোগ তাঁর ছিল না। যে সময়ে তিনি রুশ দেশে গিয়েছিলেন, তখন পর্যন্ত বিপ্লবের বীভৎস রূপ পুরোপুরি প্রকট হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া সেখানে ছিলেন তিনি মাত্র দু সপ্তাহ, তাও সরকারের সম্মানিত অতিথি হিসেবে, সমস্ত সময় মস্কো শহরে। রুশ ভাষা তিনি জানতেন না; তাছাড়া তাঁর নিজেরই কথায় তাঁর

"দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল (বিপ্লবের) আলোর দিক।"[১] ফলে গোয়েটের মত অতখানি প্রবল স্পষ্টতায় বিপ্লবের গলদ দেখিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী অন্তর্দৃষ্টি বিপ্লবের বিরাটত্ব দেখে একেবারে সংবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বরং 'রাশিয়ার চিঠি' খোলামন নিয়ে পড়লে স্পষ্টই নজরে পড়ে, এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রুশ বিপ্লবের অন্তর্নিহিত ট্রাজেডীর অনেকটাই তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। গোড়ার দিকের চিঠিগুলিতে যতটা নির্ভেজাল প্রশংসা আছে, শেষের চিঠিগুলিতে ক্রমেই তা সংশয়মিশ্রিত হয়ে উঠেছে। পঞ্চম চিঠিতেই তিনি আভাস দিয়েছেন, বিপ্লবোত্তর রুশে মানুষের কোনো কোনো মৌলিক সমস্যাকে সমাধান করার নামে অস্বীকার করার চেষ্টা চলছে। "সে জন্যে জবরদস্তির সীমা নেই।" ত্রয়োদশ চিঠিতে খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন, "মানুষের ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্ট্‌দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায়, ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয়, তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে।" পরিশেষে রুশ দেশ সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসাবাচন পড়ে দেশবাসী যাতে ভুল সিদ্ধান্ত না করে, সেজন্য উপসংহারে অনেকটা বিস্তারিতভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বিপ্লবের কোন দিকটি সদর্থক আর কোন দিকটি নঞর্থক। স্বভাবতই তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন সদর্থক দিকটির উপরে; কিন্তু বিপ্লবের নঞর্থক দিকটি যে তাঁকে কম পীড়িত করে নি, উপসংহার থেকে দু একটি উদ্ধৃতি দিলেই সেটি স্পষ্ট হবে। "সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এ অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি।...ওদের নির্মাণ-কার্যের ভিতরটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা একতরফা

১। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে; উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই, মারধোর করে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার করে।...উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার তর সয় না যাদের তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে; অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলে না, তার উপরে দীর্ঘকালের ভর সয় না।" উপসংহারের একেবারে শেষে লিখেছেন, "মানব সমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে গেছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে।...সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে।" এ যেন সেই প্রায় দেড়শ' বছর আগে ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে গোয়েটের সাবধান বাণী। রবীন্দ্রনাথ এবং গোয়েটে উভয়েই গোষ্ঠীর চাইতে ব্যক্তিকে, শক্তির চাইতে শিক্ষাকে, রাষ্ট্র শাসনের চাইতে স্বেচ্ছাকৃত সমবায়-পদ্ধতিকে বেশী মূল্যবান বলে জানতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের উপমা নিয়েই বলা চলে, আগ্নেয়গিরির উৎপাত দেখে তাঁরা সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে ঘোষণা করতে পারেন নি।

॥ সাত ॥

এ পর্যন্ত আমরা গোয়েটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেখানে মিল সে বিষয়েই আলোচনা করেছি। কিন্তু এঁদের মধ্যে মিল আছে বলে অমিলও নেহাৎ কম নয়। এ অমিল শুধু যদি পার্থক্যের ব্যাপার হত তবে তা নিয়ে আলোচনা না করলেও চলতো। যে কোন দু'জন মানুষই যখন কোনো না কোনো জায়গায় পরস্পর থেকে পৃথক, তখন দুজন বিশেষভাবে বিকশিত মানুষের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে বলাই বাহুল্য। কিন্তু গোয়েটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভিতরে এক জায়গায় আমূল বিরোধ আছে এবং আমার ধারণা এই বিরোধের স্বরূপটা না বুঝতে পারলে বিশ্বভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্থান কি, তা যাচাই করা সম্ভব হবে না।

গোয়েটে এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরোধের মূল কথাটা কি? এক কথায়

বলা যায়, এ বিরোধ অস্তিত্বতন্ত্রীর সঙ্গে ভাববাদীর, সত্যসন্ধিৎসুর সঙ্গে শান্তিকামীর। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, রবীন্দ্রনাথ অস্তিত্বকে সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন, অথবা সত্যর প্রতি তাঁর আগ্রহ কম ছিল। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে তাঁকে গান্ধীজীর সমালোচক করে তুলেছিল। রামকৃষ্ণের চাইতে রামমোহন, বিবেকানন্দের চাইতে বিদ্যাসাগর তাঁকে অনেক বেশী আকৃষ্ট করেছেন। এসবই সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সম্ভবত বলা চলে যে মানবতন্ত্রী হয়েও রবীন্দ্রনাথ মানবতন্ত্রের যেখানে চরম পরীক্ষা, সেখানে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তিনি স্বীকার করেছেন যে সত্যের মূল্য স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু যখন সত্যানুসন্ধানের পথে দুরারোহ সংশয় মাথা তুলেছে, তিনি অনেক সময়ে মানবতন্ত্রেব কঠিন নির্দেশ ভুলে প্রাক্তন প্রত্যয়ের শান্তিতে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি জানতেন, প্রতি মানুষই অসামান্য, অথচ তাঁর বহু রচনায় মানুষের প্রাতিস্বিকতা ঔচিত্য-বোধের চাপে খণ্ডিত এবং কিছুটা বিব্রত হয়েছে। অস্তিত্বের দুর্বহ জটিলতা এবং দুঃসমাধেয় বিরোধের মুখোমুখি হয়ে তিনি বহু ক্ষেত্রে আড়াল খুঁজেছেন বিমূর্ত ভাবের সরল সমন্বয়ে। গোয়েটেও যে তা কখনও করেন নি তা নয়, কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে মনে হয় তাঁর জীবনবোধ এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বেশী বলিষ্ঠ, পরিণত, দায়িত্বশীল। সমন্বয়ের শান্তি তিনিও চেয়েছেন, কিন্তু সত্যের পথ থেকে সরে যেয়ে নয়। ভাবের দাবীকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু তার খাতিরে অস্তিত্বের সামান্যীকরণে তিনি অপারগ ছিলেন। ঔচিত্যবোধ তাঁর কিছু কম ছিল না, কিন্তু তার চাইতেও বেশী ছিল জীবনবোধ। আমার বিশ্বাস, এই কারণে রনেসাঁসের উত্তরসাধক হিসেবে গোয়েটে যতখানি সার্থক, রবীন্দ্রনাথকে তা ঠিক বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্র গোয়েটের মানবতন্ত্রের তুলনায় অস্তিত্বনিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেকটা দুর্বল। তাঁর কল্পনা মানুষের ভাবরূপকে নিয়েই ব্যস্ত; তার সমগ্র রূপটিকে স্বীকার করার প্রৌঢ় দুঃসাহস তিনি কচিৎ দেখিয়েছেন। এইখানেই বিশ্বভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের তুলনায় গোয়েটের শ্রেষ্ঠত্ব। এই মৌলিক ত্রুটি থাকার ফলে আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ লেখককে পৃথিবীর চিরকালের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সমপর্যায়ে ফেলা চলে কিনা সন্দেহ।

ব্যাপারটাকে নানাদিক থেকে বিচার করা চলে। যিনি যথার্থ সত্যসন্ধ, কোন ঔচিত্যবোধের নির্দেশেই যা প্রকৃত তাকে তিনি চোখ ঠারতে বা চাপা

দিতে পারেন না। অস্তিত্বের কোনো কোনো বিশেষ দিক তাঁর কাছে পীড়াদায়ক ঠেকতে পারে, কিন্তু পীড়াদায়ক বলেই তাকে তিনি অসত্য বলতে গররাজী। যখন তিনি মানুষের কথা লিখতে বসেন, তখন একথা তিনি ভাবতে পারেন না যে মানুষের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রবল বলে তার বাকী দেহটা অপ্রাসঙ্গিক। মানুষ যে শুধু জ্ঞানচর্চা করে না, সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না, মহৎ আদর্শ কল্পনা করে তার দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে না, মানুষের যে আরও বহু দিক আছে, সে যে ক্ষুৎপিপাসার দ্বারাও চালিত হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে কিম্বা সঙ্গমে পরিতৃপ্তি না ঘটলে তার বিশ্ববীক্ষা যে ব্যাহত হতে পারে, যিনি সত্যসন্ধ, তিনি মানব-অস্তিত্বের এই জটিল, বিচিত্র বহুমুখীতা বিষয়ে সর্বদাই জাগ্রত, নিয়ত কৌতূহলী। ভাববাদীদের বিশ্বাস যে মানুষের এই সমগ্র রূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় কোন ফায়দা নেই; তার মধ্যে শুধু যেটুকু শ্রেয় (তাঁদের বিচারে) সেটুকুকে ফুটিয়ে তোলাতেই জ্ঞানের সার্থকতা। অর্থাৎ তাঁরা শুরু করেন মানুষ সম্বন্ধে একটি কাল্পনিক আদর্শ নিয়ে এবং মানুষের যেসব দিক এই পূর্বকল্পিত ধারণার অনুকূলে শুধু সেগুলিকে প্রাধান্য দিয়েই তাঁরা খুশি। এককালে পশ্চিম ইয়োরোপে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন প্লেটো। কিন্তু সেকালে অন্তত বিদগ্ধজনদের মধ্যে এ দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ স্বীকৃতি পায় নি। রোমক সভ্যতার পতনের যুগে ইয়োরোপ খ্রীষ্টধর্ম আশ্রয় করার পর থেকে প্রায় আট-ন'শো বছর ধরে পশ্চিমী মানস এই মনোভাবের দ্বারা অভিভূত থাকে। রনেসাঁসের যুগে চিন্তাশীল মানুষরা আবার নতুন করে বুঝতে আরম্ভ করেন যে অবিমিশ্র ভাববাদ সত্যসন্ধিৎসার নিতান্ত পরিপন্থী, যথার্থ জ্ঞানের জন্য অস্তিত্বের জটিল সমগ্র রূপটির অনুধাবন প্রয়োজন। সমগ্রসত্যের অনুসন্ধান একদিকে যেমন মানুষের বিকাশ-সম্ভাবনার দিগন্তকে প্রসারিত করে দেয়, অন্যদিকে তেমনি সেই বিকাশসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করে যথার্থতর জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে। লেওনার্দো, এরাজমুস, শেক্সপীয়র এবং তাঁদের পরের যুগে দিদেরো প্রভৃতির মারফৎ রনেসাঁসের এই অস্তিত্বতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গোয়েটের উপরে বর্তায়। রবীন্দ্রনাথ মানবতন্ত্রের অন্যান্য প্রত্যয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও রনেসাঁসের এই দিকটিকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করতে পারেন নি। এ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কল্পনায় প্রভাব অবশ্যই ফেলেছিল, তাঁর নানা রচনায় (বিশেষ করে ছোটগল্পে) সে প্রভাবের কিছু কিছু ছাপ চোখে পড়ে। কিন্তু সমগ্রভাবে

বিচার করলে সন্দেহ থাকে না, ভাববাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি সচেতনভাবে পুরোপুরি অতিক্রম করার সামর্থ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর অনায়ত্ত রয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর কাব্যে জীবনকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়েছে জীবনদেবতা; তার দর্শনে মানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের চাইতে বেশী মূল্য পেয়েছে তাঁর কাল্পনিক ব্রহ্মত্ব; তাঁর নাটক উপন্যাসে বিস্তর মহৎ ভাবের সমাবেশ ঘটা সত্ত্বেও এমন চরিত্র দুর্লভ যারা শেক্সপীয়র, গোয়েটে অথবা ডস্টয়েভ্স্কীর চরিত্রদের মত জটিল এবং জীবন্ত।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সাহিত্য বিষয়ক নানা প্রবন্ধে, 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতামালায় এবং তাঁর আত্মজীবনী জাতীয় নানা রচনায় খুব স্পষ্ট। গোয়েটে তাঁর বিরাট আত্মজীবনীতে নিজের সম্বন্ধে প্রায় কোন কিছুই গোপন করেন নি। এদিক থেকে তিনি রনেসাঁসের শিল্পী বেনভেনুতো চেলিনির শিষ্য। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনা গোয়েটের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত; যাও-বা লিখেছেন, তাতে নিজের আদর্শ রূপটিকেই ফোটাবার চেষ্টা করেছেন, সমগ্র রূপটিকে স্বীকার করেন নি। ফলে তাঁর এসব লেখা থেকে তিনি যা ছিলেন তার চাইতে তিনি যা হতে চেয়েছিলেন তার খবরই আমরা বেশী পাই। বস্তুত ঋষি, বিশ্বকবি, গুরুদেব ইত্যাদি আখ্যার আড়ালে মানুষ-রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস আজো আমাদের অনেকটাই অজানা। প্রভাতবাবুর 'রবীন্দ্র জীবনী'তে কিছু কিছু আভাস আছে, কিন্তু তা শুধু আভাসমাত্র। এমনকি যে মানুষ সারা জীবন ভালবাসার উপরে এত গান, কবিতা, কাহিনী, নাটক লিখে গেলেন, তাঁর নিজের জীবনে প্রেমের অভিজ্ঞতার সংবাদ তিনি সযত্নে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন।[১০]

একথার প্রতিবাদে অবশ্যই বলা যেতে পারে, তাতে কি আসে যায়? মানুষ-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আত্মীয়তা নাই হল, স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ত রয়েছেন, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেটুকু প্রকাশিত করে রেখে গেছেন, তাইত যথেষ্ট। আসলে তাঁর সৃষ্টির জন্যই ত তিনি আমাদের কাছে মূল্যবান। শেক্সপীয়রের জীবন সম্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি। প্রথম নজরে এটা খুব লাগসই জবাব মনে হতে পারে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে এ যুক্তির গোড়াতে মস্ত একটা গলদ আছে। শেক্সপীয়রের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না বটে কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে জীবনের কোন অভিজ্ঞতাকেই তিনি কাল্পনিক আদর্শের খাতিরে খারিজ করেন নি। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যতই প্রকাশের দক্ষতা অর্জন করেছেন, ততই জীবনের নানা জটিল এবং দুষ্প্রকাশ্য

অভিজ্ঞতাকে আদর্শবাদী শুচিতার মোহে পাশ কাটানো মনোভাব তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। এতে মানুষ হিসেবে তাঁর কতটা লাভ বা ক্ষতি হয়েছে জানি না, কিন্তু লেখক হিসেবে যা লোকসান হয়েছে, তা অপূরণীয়। জীবনকে সমগ্রভাবে স্বীকার করতে না শিখলে আর যা-ই হওয়া সম্ভব হোক, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক হওয়া অসম্ভব। ভাষার উপরে তাঁর যতই দখল থাক, ভাবনা তাঁর যতই মহৎ হোক, এই একটি জায়গায় ঘাটতি হলে কোনো কিছুর জোরেই তা পূরণ করা চলে না। রবীন্দ্রনাথও তা পারেন নি। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আমরা যে বিশেষ কিছু জানি না, তাতে কিছু না যেতে আসতে পারে; কিন্তু অপ্রীতিকর খুঁটিনাটিকে এড়িয়ে যাওয়ার যে মনোভাব তাঁর জীবন এবং সাহিত্যসাধনাকে প্রভাবিত করেছিল, তাঁর সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ে সেটি মোটেই অবান্তর নয়। এবং এ সিদ্ধান্ত বোধহয় যুক্তিসহ যে এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই অসামান্য সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি এমন কিছু লিখে যেতে পারলেন না, যা সাহিত্যমূল্যে "মহাভারত" অথবা "অডিসি", "ইন্‌ফর্নো" অথবা "কিং লীয়ার" "ফাউস্ট" বা "ওঅর অ্যাণ্ড পীস"-এর সমতুল্য।

রবীন্দ্রনাথের এই গূঢ় দুর্বলতা বিশেষ করে তাঁর উপন্যাস এবং নাটকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জীবনবিমুখ আদর্শবাদের শরণ না নিলে তিনি কি ধরনের ঔপন্যাসিক হতে পারতেন, তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর প্রথমদিকের লেখা বড় গল্প "নষ্ট নীড়" এবং উপন্যাস "চোখের বালি"তে। এ দুটির রচনা কাল ১৯০১; ভাববাদের প্রভাব এখানে অপেক্ষাকৃত অপ্রবল। তবে এযুগে রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনারীতি ততটা পরিণতি অর্জন করে নি; তা না হলে "নষ্ট নীড়" এবং "চোখের বালি" বাংলা সাহিত্যের দুটি শ্রেষ্ঠ রচনা বলে পরিগণিত হতে পারত। কিন্তু এদুটির ক্ষেত্রেও ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অপ্রবল বলে একেবারে অনুপস্থিত নয়। বিশেষ করে "চোখের বালি"র কাহিনীকে শেষদিকে যেভাবে তালেগোলে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটি কাহিনীর দিক থেকে যেমন অসঙ্গত, জীবনের দিক থেকে তেমনি অবাস্তব। বিহারী-বিনোদিনীর সমস্যার মধ্য দিয়ে লেখক জীবনের যে নিত্য অথচ জটিল রূপটিকে ফোটাতে পারতেন, সামাজিক ঔচিত্যবোধের খাতিরে তাকে তিনি শেষ পর্যন্ত সরল এবং বিকৃত করে সে সুযোগ স্বেচ্ছায় নষ্ট করেছেন। "নৌকাডুবি"তে এই অসঙ্গতি এবং অবাস্তবতা আরো স্পষ্ট; এটি বোধহয় রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতম রচনা। "নৌকাডুবি"র (১৩১০-১২) পর

প্রকাশিত হয় "গোরা" (১৩১৪-১৬); আকারে এটিই তাঁর সব চাইতে বড় উপন্যাস। "গোরা"র উপজীব্য ভাব যেমন মহৎ, এর গদ্যরীতিও তেমনি পরিণত। তবু উপন্যাস হিসেবে "গোরা"কে খুব উঁচুতে স্থান দেওয়া কঠিন। গোরা-চরিত্র লেখকের কল্পনায় একটি ভাবরূপ হিসেবে দেখা দিয়েছে, পুরো মানুষ হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে নি। গোরার বক্তব্য আমাদের ভাবায় বটে, কিন্তু গোরার মনুষ্যত্ব আমাদের কচিৎ স্পর্শ করে। বরং উপন্যাস হিসেবে "চতুরঙ্গ" (১৩২১) গোরার তুলনায় সার্থক; এখানে রবীন্দ্রনাথ জটিল সমগ্র রূপটিকে অনেক বেশী নিষ্ঠা এবং সাহসের সঙ্গে ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখানেও প্রধান চারটি ভাবের কোঠা পেরিয়ে জীবনের ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করে নি। পাউণ্ডের ভাষায় তারা পার্স্‌ন্‌ নয়, পার্সোনা; মানুষ নয়, মুখোশ।

রবীন্দ্রনাথ যে কেন সার্থক ঔপন্যাসিক হতে পারেন নি, তার সব চাইতে প্রামাণিক ব্যাখ্যা মেলে "চতুরঙ্গে"র ঠিক পরেই প্রকাশিত "ঘরে বাইরে" (১৩২২) উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গদ্যরীতি এখানে পূর্ণ বিকাশলাভ করেছে; তাঁর মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। তবু হায়, "ঘরে বাইরে" একটি দীর্ঘ রূপককাহিনীর বেশী কিছু হতে পারল না। ভূপতি নিখিলেশে রূপান্তরিত হয়ে মহত্ত্ব নিশ্চয়ই অর্জন করেছে, কিন্তু তার ফলে সে বঞ্চিত হয়েছে মনুষ্যত্বে। গোরার মত নিখিলেশও প্রায় একটি জ্যামিতিক কল্পনা; তাকে জীবন্ত. ব্যক্তি-মানুষ ভাবা অসম্ভব। "ঘরে বাইরে"র প্রায় বারো বছর পরে "যোগাযোগ" (১৩৩৪ ৩৫) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আর একবার চেষ্টা করেছেন জীবনের দুষ্প্রসহ সত্যকে কল্পনায় স্বীকার করতে। "নষ্টনীড়" এবং "চোখের বালি"তে যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা অনেকখানি সার্থকান্বিত হয়েছে "যোগাযোগে।" রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে মধুসূদনের মত চরিত্র আর দ্বিতীয়টি আমার অন্তত চোখে পড়ে নি। মধুসূদন এবং কুমুকে মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে জীবনের একটি নিষ্ঠুরতম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন। আমার বিশ্বাস, এই উপন্যাসটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এখানে তিনি প্রায় শেক্সপীয়র. গোয়েটে, টল্‌স্টয়-এর সমপর্যায়ে পৌঁছেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি শেষরক্ষা করতে পারেন নি। একদিকে তিনি মধুসূদনের রূঢ় সত্য থেকে আশ্রয় খুঁজেছেন বিপ্রদাসের অস্পষ্ট অশরীরী ভাব রূপে; অন্যদিকে কুমুর সমাধানহীন সমস্যায় যন্ত্রণা সইতে না

পেরে তিনি মাঝপথেই কাহিনীতে ছেদ টেনেছেন।[১১] "যোগাযোগে" লেখক নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়েছিলেন ; ফলে "হ্যামলেটের" মত এখানেও এক অনির্দেশ্য অসম্পূর্ণতা পাঠককে একই সঙ্গে লুব্ধ করে, পীড়া দেয়। অবিনাশ ঘোষালের কাহিনী তাই শেষ পর্যন্ত আর কোনদিনই লেখা হল না। যে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ইতিমধ্যেই তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা নিয়ে সে কাহিনী লেখা সম্ভব হত না। ফলে "চোখের বালি"র পরে যেমন "নৌকাডুবি", "চতুরঙ্গের" পরে যেমন "ঘরে বাইরে", "যোগাযোগের" পরে তেমনি তিনি আড়াল নিলেন "শেষের কবিতা"র জীবনবিমুখ ভাবোচ্ছ্বাসে। "শেষের কবিতা" (১৩৩৫) যে "যোগাযোগে"র (১৩৩৪-৩৫) অব্যবহিত পরের রচনা, রবীন্দ্র মানসের বিশ্লেষণে এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঘটনা। 'নৌকাডুবির' মত এখানেও শেষ পর্যন্ত জোড়ে জোড়ে পাত্রপাত্রীদের খাসা মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা সত্বেও "শেষের কবিতা" যদি "নৌকাডুবি'র মত অত নিকৃষ্ট না ঠেকে, তার প্রধান কারণ ১৩৩৫এ রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং লিখনরীতি ১৩১০-১২ সালের তুলনায় অনেক বেশী পরিণত। কিন্তু জীবন-বোধের দিক থেকে "শেষের কবিতা" দরিদ্র ; চতুর অতি-কথনে সে দারিদ্র্য ঢাকা না পড়ে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে আরও প্রত্যক্ষ। তাঁর কৌতুকনাট্যগুলিতে এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব প্রথম পাঠে হয়ত চোখে পড়ে না ; কিন্তু মোলিএর অথবা শেক্সপীয়রের পরিণত কালের কমেডিগুলির সঙ্গে তুলনা করে পড়লে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় রচনায় জীবনবোধ কত দুর্বল। "মেজার ফর মেজার" অথবা "ল্য মিজাঁত্রোপ"-এর মত নাটক তিনি কোনো দিনই লিখতে পারেন নি। অপর পক্ষে তাঁর কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্য অথবা তত্বনাট্য—সব ক্ষেত্রেই চরিত্রসৃষ্টি নিতান্ত অপ্রধান রয়ে গেছে। এসব রচনায় রস অথবা ব্যঞ্জনার অভাব নেই, কিন্তু অভাব আছে জীবন্ত মানুষের। এরা আমাদের আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু 'কাথারসিস' ঘটায় না। নাচ, গান, ছন্দ, ভাষা এবং তত্বের সম্পদে এ অভাব সাময়িকভাবে আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে ; কিন্তু এ অভাব যে কত বড় অভাব, তা আমরা তখনি বুঝতে পারি যখন রবীন্দ্রনাথের নাটকের পাশে ইউরিপিদিস, শেক্সপীয়র অথবা ও'নীলের নাটক পড়ি। "রাজা"

১১। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

"অচলায়তন", "শারদোৎসব", "রক্ত করবী", "ডাকঘর", "ফাল্গুনী" এমনকি "বাঁশরী"তে পর্যন্ত এমন একটিও চরিত্র নেই যাকে জীবন্ত ব্যক্তিমানুষ বলে মনে হতে পারে। কোনো কোনো নৃত্যনাট্যে জীবন্ত চরিত্রের কিছুটা আভাস মেলে—যেমন "চণ্ডালিকা", "শ্যামা" এবং "চিত্রাঙ্গদা"। আমার ধারণা নাটক হিসেবে এ তিনটিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু এদের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ আভাসের বেশী আর এগোন নি—মূল ভাবটিকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তিচরিত্রের জটিলতাকে সরল করে এনেছেন।

অথচ নাটকে চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের যে একেবারে ছিল না তা নয়। অন্তত তাঁর প্রথম যুগের দুটি নাটকে—"রাজা ও রাণী" (১২৯৬) এবং "বিসর্জন" (১২৯৭)—এ ক্ষমতার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তখনো পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যসাধনা ভাববাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। বিক্রম এবং সুমিত্রা, রঘুপতি এবং গুণবতীর মত জীবন্ত চরিত্র রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের লেখা আর কোনো নাটকে চোখে পড়ে না। দুর্ভাগ্যবশত এ নাটক দুটি লেখার সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের রীতি প্রকরণে যথেষ্ট নিপুণতা অর্জন করেন নি; ফলে এদের মধ্যে বিস্তর রূপগত ত্রুটি বর্তমান। এদের মধ্যে মহৎ রচনার প্রতিশ্রুতি আছে কিন্তু তার ঠিক সার্থকায়ন ঘটেনি। সাহিত্য কর্মে সেই একান্ত প্রয়োজনীয় নিপুণতা যখন তাঁর আয়ত্তে এল, তার আগেই তাঁর মন ভাববাদী ভীরুতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। বৃদ্ধবয়সে "রাজা ও রাণী" কাহিনীটিকে ভেঙেচুরে ঘষেমেজে যখন তিনি "তপতী" (১৩৩৬) রচনা করলেন, তখন সে নতুন নাটকে মূল রচনার যা ছিল বৈশিষ্ট্য প্রথমেই তা বাদ পড়ল। নাট্যকারের পক্ষে ভাববাদ যে কত মারাত্মক "রাজা ও রাণী"র বিক্রম-সুমিত্রার সঙ্গে "তপতী"র বিক্রম-সুমিত্রার তুলনা করলেই সেটি ধরা পড়বে। যারা ছিল জীবন্ত নরনারী, তারা পর্যবসিত হয়েছে তত্ত্বকল্পনায়। বাংলা ভাষায় "ইফিগেনী", "ওথেলো" অথবা "ফাউস্টের" মত নাটক আজো তাই লেখা হল না।

। আট ।

ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সাহিত্যিক শুধু যে অস্তিত্বের জটিল সমগ্র রূপ থেকে মুখ ফিরিয়ে তত্ত্বের খণ্ডিত সারল্যে আশ্রয় নেন তাই নয়; অস্তিত্বের মধ্যে যখনই কোনো দুঃসমাধেয় সমস্যা অথবা দুরতিক্রম্য বিরোধ প্রকট হয়ে

ওঠে তখনই তিনি সমন্বয়ের শান্তির জন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। সমন্বয়ের আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য ; কিন্তু সমন্বয়ের প্রয়োজনে যদি বিরোধের গভীরতাকে অপ্রধান বলে উড়িয়ে দিই, তাহলে যে সমন্বয় আমরা কল্পনা করব তাতে মানসিক শান্তি হয়ত মিলতে পারে, কিন্তু তাতে সত্যের ঘাটতি হওয়ায় তার উপরে নির্ভর করা চলবে না। এ ধরনের সমন্বয়ের শান্তিকে লক্ষ্য করেই "ইস্ট কোকার"এ এলিয়ট লিখেছেন :

The serenity only a deliberate hebetude,
The wisdom only the knowledge of dead secrets
Useless in the darkness into which they peered
Or from which they turned their eyes.

কি জীবনে কি সাহিত্যে এ ধরনের সমন্বয় যেমন সুলভ, তেমনি স্বল্পমূল্য। এর উপরে দাঁড়িয়ে টেনিসনের মত লেখক হয়ত লিখতে পারেন, কিন্তু গোয়েটের মত লেখক পারেন না। মহৎ জীবন এবং মহৎ সাহিত্য বিরোধের মূলে পৌঁছে সমন্বয়ের সন্ধান করে ; লাইব্‌নিট্‌স্‌-এর সর্বশুভ তত্ত্বের চাইতে অলবেয়ার কাম্যু-র আর্ত অনুসন্ধান তাই অনেক বেশী অর্থসমৃদ্ধ। [১২]

রবীন্দ্রনাথ একথা জানতেন, কিন্তু সে জ্ঞান তাঁকে সর্বদা ভাববাদী প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করে নি। তাঁর দর্শনচিন্তায় শান্তির চাইতে সত্যকে অনেক সময়েই বড় বলে স্বীকার করা হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে সে স্বীকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার ন্যায়সঙ্গত পরিণতি লাভ করে নি। বিরোধকে তিনি প্রায়শই বাইরের ব্যাপার বলে দেখিয়েছেন ; অস্তিত্বের গভীরতম স্তর থেকে যে বিরোধের উদ্ভব, তার সঙ্গে সম্ভবত তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল না। অথবা হয়ত পরিচয় ছিল, কিন্তু চেতনার স্তরে তাকে স্বীকার করার সাহস এবং সামর্থ্য ছিল না। ভালো এবং মন্দের পার্থক্য তাই তাঁর অনেক রচনায় অতিমাত্রায় স্পষ্ট, কিন্তু অস্তিত্বের সমগ্র রূপের মধ্যে ভালো আর মন্দ যে কি অচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত সেটি তাঁর লেখায় বিশেষ ধরা পড়ল না। নিখিলেশ, বিপ্রদাস, অতীন নিছক ভালো ; আর সন্দীপ, মধুসূদন, বটু নিখাদ মন্দ। এ বিশুদ্ধতা নীতিশাস্ত্রে হয়ত চলতে পারে, কিন্তু জীবনে এবং সে কারণে সাহিত্যে এ কল্পনা নিতান্তই খণ্ডসত্য। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট বা ওথেলো যে রবীন্দ্রনাথের যে কোনো পাত্র-পাত্রীর

১২। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

চাইতে প্রাণবন্ত তার কারণ স্রষ্টা এদের ক্ষেত্রে মানুষের আদর্শ গুণাবলীকে হিংসা, ক্ষমতাস্পৃহা, সন্দিগ্ধতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি আদিম বৃত্তি থেকে ছাঁকাই করে আলাদা পরিবেশন করেন নি।

গোয়েটের ফাউস্ট প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে আপনি সংগ্রাম করছে। লালসা এবং মমতা, সত্যানুসন্ধান এবং সম্ভোগাসক্তি, আত্মপ্রত্যয় এবং আতঙ্ক তার চরিত্রে নিয়ত যুধ্যমান। আত্মবিরোধের হাত থেকে সে পালাতে চায় নি, তার মধ্য দিয়ে সে মুক্তির সাধনা করেছে। ফাউস্ট এবং মেফিস্টোর সম্পর্ক তাই শাদার সঙ্গে কালোর সম্পর্ক নয়; তারা একই সঙ্গে পরস্পরের বিরোধী এবং পরস্পরের আত্মীয়। মেফিস্টো যদি ফাউস্টের অস্তিত্বের মূলে না বাসা বাঁধত, তবে ফাউস্টের পক্ষে মুক্তির জন্যে সাধনা করাই সম্ভব হত না। নিখিলেশদের অন্তরে কোনো যথার্থ বিরোধ নেই; তাদের বিরোধ বাইরের সঙ্গে। তাই তাদের মধ্যে না আছে ট্রাজেডির স্বাদ, না মুক্তির। গোয়েটের নায়ক যে আর্ত আনন্দের সম্ভোক্তা (Dem Taumel Weih' ich mich, dem schmerzlichen Genuss) রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পাত্রপাত্রীই সে বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

সাহিত্যে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পেলে এসব ছাড়া আরো একটি বিপদের সম্ভাবনা আছে। সেটি হল ভাষার ক্ষেত্রে শুচিবায়ুগ্রস্ততার বিপদ। এ বিপদ সম্বন্ধে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। ত্রুটিটা ভাষার ক্ষেত্রে প্রকট হলেও তার প্রকৃত উৎস ভাবের ক্ষেত্র। জীবনকে আদর্শ অনুযায়ী কোনো ছকের মধ্যে ফেলে সাহিত্যিক যখন তাকে ফুটিয়ে তুলতে চান, তখন তাঁর ভাষাও আর সেই ছকের বন্ধন কাটাতে পারে না। ভাবের খাতিরে ভাষাকেও তখন ধোপদুরস্ত রাখতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যতদিন ভাববাদের পুরোপুরি খপ্পরে পড়েন নি, ততদিন তাঁর ভাষায় অন্য দোষ হয়ত ছিল, কিন্তু কৃত্রিমতা এবং অস্বচ্ছতা ছিল না। ক্রমে যত তিনি ভাববাদী শুচিতার দিকে ঝুঁকেছেন, ততই তাঁর ভাষা সাধারণ মানুষের আটপৌরে ভাষা থেকে সরে গেছে। তাঁর অনেক মূল্যবান চিন্তা যে সাধারণ বাঙালী পাঠকদের মনে বিশেষ কোনো ছাপ রাখতে পারে নি, তার হয়ত একটা কারণ তাঁর পরিণত রচনায়, বিশেষ করে গদ্য রচনায়, এই ভাষাগত অনাত্মীয়তা। এ মনোভাবের সবচাইতে উগ্র প্রকাশ ঘটেছে "শেষের কবিতা"য়; কাহিনী, পাত্রপাত্রী, ভাষা সব দিক থেকে এই বইটির জীবনবিমুখতার তুলনা নেই। তা সত্ত্বেও এ বই

যে আমাদের চোখ ধাঁধায়, তার কারণ এর উপাদান এবং উপজীব্য স্বল্পমূল্য হলেও শিল্পনৈপুণ্যে বইটি অসামান্য। কিন্তু মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য শুধু শিল্পনৈপুণ্যই যথেষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ ভাষার ক্ষেত্রেও ক্রমে ভাববাদী হওয়ার ফলে এক দিকে তাঁর কল্পনার জগৎ থেকে জীবনের অনেক দিককে বাদ দিতে হয়েছে; অপরপক্ষে যে দিকগুলিকে তিনি বেছে নিয়েছেন, সেগুলির রূপায়ণের মধ্যেও অনেক সময় অস্বচ্ছতা এবং অবাস্তবতা রয়ে গেছে। ফাউস্ট অথবা মার্গারেটার মত চরিত্র তাঁর কল্পনায় কোনো দিন ধরা পড়ল না। 'মা আমার বেশ্যা, বাপ আমার ঠগ' (Meine Mutter die Hur···Mein Vater der Schelm) রবীন্দ্রনাথের কোন নায়িকা কি বলতে পারত? অন্য দিকে নিখিলেশ, সন্দীপ, বিমলারা হয়ে রইল কল্পলোকের ছায়াময় অধিবাসী। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে রচিত একটি কবিতায় তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, আপন অন্তরালে বাস করে যে মানুষ, তার অন্তরের মধ্যে প্রবেশের দ্বার তিনি সর্বত্র পান নি।

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী

এ স্বীকারোক্তির মধ্যে অনেকখানি বিনয় মেশানো ছিল। কিন্তু বিনয় বাদ দিয়ে এ কথার মধ্যে যে কতখানি নিষ্ঠুর সত্য বর্তমান, তা বোধ হয় কবি নিজেও বোঝেন নি। তিনি যে কৃষাণের জীবনের শরিক হতে পারেন নি এটি তাঁর সুরের প্রধান অপূর্ণতা নয়। যাঁদের সঙ্গে তাঁর অন্তরের পরিচয় আছে বলে তিনি মনে করেছিলেন, তাদের কথাও যে তিনি বহু ক্ষেত্রে সত্য করে বলতে পারলেন না, এটিই তাঁর সাহিত্যের সব চাইতে বড় ত্রুটি। না পাবার একটি প্রধান কারণ হল তাঁর ভাববাদ পুষ্ট রুচি। সাধারণ মানুষ—শুধু কৃষাণ মজুরই নয়, উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, স্বচ্ছল ঘরের ছেলেমেয়েরাও—যে ভাষায় সচরাচর ভাবে, আলাপ করে, তাদের সুখ দুঃখ, রাগবিদ্বেষ প্রকাশ করে, এ রুচি ক্রমেই তাঁকে সে ভাষার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছিল। অমিত, অতীন অথবা বাঁশরীর ভাষায় তিনি শুধু তাঁর কল্পলোকের নায়কনায়িকা ছাড়া আর কোন্ স্ত্রী-পুরুষেরই বা আত্মীয়তা অর্জন করতে পারতেন? মানবতন্ত্রী হয়েও তাই তিনি শেষ পর্যন্ত একথা বলতে পারলেন না, আমি মানুষ সুতরাং মানুষের কোনো কিছুই আমার অনাত্মীয় নয়। মানবতন্ত্র এবং মানুষের মাঝখানে ভাববাদী শুচিতা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ নয় ॥

পাঁচিল কি গোয়েটেরই ছিল না! তবে সে পাঁচিল তিনি টপকাতে পেরেছিলেন। ভাবের পাঁচিল, নীতির পাঁচিল, ভাষার পাঁচিল। প্রেম তাঁকে সাহায্য করেছিল। প্রথম বয়সে কাটারীনা এবং ফ্রিডেরিকা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সমাজের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও যাকে তিনি বিয়ে করলেন সেই ক্রিস্টিয়ানা,—বহুবল্লভ গোয়েটের জীবনে এবং সাহিত্যে যে মেয়েরা অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছে তাদের অনেকেই সমাজের নীচের তলার মানুষ। তিনি নিজেই লিখেছেন, কাটারীনার প্রেমে পড়ে তিনি প্রথম বুঝতে শেখেন ধর্ম, নীতি, লোকাচারের ভিত্তি কত অগভীর, আবিষ্কার করেন সমাজ-কাঠামোর অন্তরালে জীবনের যত ভয়াবহ অন্ধকার সুড়ঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের ক্ষেত্রে মানব-প্রেমী হয়েও জীবনের ক্ষেত্রে বন্দী রইলেন আভিজাত্যের দুর্গে। কামনা গোয়েটেকে সে দুর্গ থেকে টেনে বার করেছিল।[১৩] তাঁর যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলি ব্যর্থ হয়ে যায় নি। একদিকে যেমন গ্রীক ল্যাটিন পড়েছেন, অন্যদিকে তেমনি দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটিয়েছেন শুঁড়িখানায়, বস্তিতে, বেশ্যালয়ে, সমান আনন্দে মিশেছেন ধার্মিক লাফাটর আর মাতাল প্রকৃতিবাদী বাজেডভ্-এর সঙ্গে, বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন নেতিপন্থী মার্ক আর যুক্তিভীরু যাকোবির সঙ্গে, গরীব গেঁয়ো পুরুতের মেয়ে ফ্রিডেরিকার সঙ্গে প্রেমলীলা ফুরোতে না ফুরোতেই বন্ধুর বাগ্‌দত্তা শার্লোটে বুফ্-এর সঙ্গে জট্ পাকিয়েছেন। ঝড়ঝাপটা যুগের আবহাওয়াও হয়ত তাঁকে সাহায্য করেছিল। তবে আমার বিশ্বাস এই পাঁচিল টপকানোর ব্যাপারে তিনি সব চাইতে নির্ভরযোগ্য সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁর আপন প্রকৃতির মধ্যে। তাঁর যৌবন কালের বন্ধু মার্ক তাঁকে লিখেছিলেন, কাল্পনিক সৌন্দর্যের সাধনা তোমার ধর্ম নয়, বাস্তবকে উদ্‌ঘাটিত করার মধ্যেই তোমার সার্থকতা। গোয়েটে সম্বন্ধে এর চাইতে সত্যকথা আর কেউ বলেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই।

ফলত গোয়েটে সাধনা করেছিলেন মুক্ত মন দিয়ে অস্তিত্বের সমগ্র রূপকে বুঝতে, আর সেই বোঝাকে প্রকাশ করতে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, নিজের জীবনে। 'আমি হতে চাই প্রকৃতির মত, কৃত্রিমতামুক্ত, ভালোয় মন্দয় মেশানো, সব সামাজিক ঔচিত্য বন্ধনের ঊর্ধ্বে'। এ তাঁর প্রথম যৌবনের ঘোষণা। বৃদ্ধ বয়সে একারমানের সঙ্গে আলাপেও বার বার তিনি সেই একই প্রত্যয়ের উল্লেখ

১৩। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

করেছেন। 'শিল্পীকে বিমূর্ত সামান্য ভাবের মোহ এড়িয়ে দেহাশ্রিত বিশেষের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।' 'যার জীবনে মতবাদ যত প্রবল, সে তত খারাপ লেখে; বাস্তবজীবনে অভিনিবিষ্ট হতে পারলে তবেই খাঁটি লেখক হওয়া সম্ভব।' 'শ্লীলতাবোধ সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায়—শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, পরিণতবয়স্কদের জন্য রঙ্গমঞ্চ।' 'আমার কাব্যে কখনো কোনো তত্ত্বকথাকে রূপ দেবার চেষ্টা করি নি।' 'সত্যের চাইতে কোনো কিছুই বড় নয়।' 'প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম এবং শেষ দাবি সত্যানুগত্য।' উগোর লেখা তাই তাঁর মনে বিতৃষ্ণার সঞ্চার করেছিল। এই মানদণ্ডে বিচার করেই তিনি গোল্ড্‌স্মিথ্‌ এবং দিদেরোকে লেখক হিসেবে অনেক উঁচুতে আসন দিয়েছেন।

গোয়েটের এসব উক্তি যে কথার কথা নয় তাঁর দীর্ঘজীবনের রচনাবলী তারই প্রমাণ। বিশদ আলোচনার এখানে অবকাশ নেই; একটি-দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যে প্রচীন কাহিনী থেকে গোয়েটে তাঁর "ফাউস্ট" নাটকের গল্পটি সংগ্রহ করেন তার নায়িকা ছিল গ্রীক মহাকাব্যের বিখ্যাত রূপসী হেলেন। ১৫৮৭ সালে প্রকাশিত স্পীজ্‌-এর "ফাউস্ট-বুখ্‌"-এ আছে ফাউস্ট্‌স্‌ যাদুবিদ্যার জোরে হেলেনকে প্রেতলোক থেকে টেনে আনে এবং তার প্রেমে পড়ে। ফাউস্ট সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় গল্পেও হেলেনের সঙ্গে তার প্রেমের উল্লেখ আছে। গোয়েটে যখন প্রথম "ফাউস্ট" নাটক লিখতে শুরু করেন তখন তিনিও হেলেনকেই নায়িকা করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বতন্ত্রী শিল্পী-প্রকৃতিই জয়ী হল। হেলেন রূপান্তরিত হল গ্রেট্‌খেনে—যে গ্রেট্‌খেনে দেবতার অংশ কিছুই নেই—যে বেশ্যার মেয়ে, গরীব, অশিক্ষিত, নির্বোধ। পারিসের প্রেমিকাকে গোয়েটে দেখেন নি; কিন্তু কেট্‌খেন শোয়েনকফ তাঁকে হাত ধরে শিখিয়েছিল কামনার মধ্যে উদ্দাম আনন্দ আর অসহ্য যন্ত্রণা কি ভাবে মেশানো থাকে; অন্য দিকে নিষ্পাপ ফ্রিডেরিকাকে ভালবেসে ত্যাগ করার গ্লানি তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেননি। তাঁর কল্পনা বড় জোর পৌরাণিক হেলেনের উপরেই কিছু কারিগরি করতে পারত; তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা জন্ম দিল মার্গারেটাকে। মার্গারেটা তাই অমর হল, অন্য কেউ দূরে থাক স্বয়ং গোয়েটেও এমন আর একটি চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে "ফাউস্ট" দ্বিতীয় খণ্ডে গোয়েটে অবশ্য হেলেনকে নিজের অধিকারে নাটকে স্থান দিয়েছেন; দ্বিতীয় খণ্ডের পুরো তৃতীয় অঙ্কটি হেলেনকে নিয়ে লেখা। এখানে কাব্যগুণের

অভাব নেই, যেমন নেই রবীন্দ্রনাথের পরিণত কাব্যরচনায়। কিন্তু প্রথমত, হেলেনের সঙ্গে নাটকের কোনো যোগ নেই (তৃতীয় অঙ্কটি প্রথমে স্বতন্ত্র একটি রচনা হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল); অ্যারিস্টটলের ভাষায় এটি এপিসোড মাত্র। দ্বিতীয়ত, চরিত্র হিসেবে হেলেন একেবারেই অবাস্তব, মার্গারেটার সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। গোয়েটে এখানে নিজের প্রকৃতিকে খর্ব করে নিজের এবং আমাদের লোকসান ঘটিয়েছেন। "ফাউস্ট" দ্বিতীয় খণ্ড তাই প্রথম খণ্ডের মত অমরত্ব অর্জন করতে পারল না।

নাটকের ক্ষেত্রে যেমন উপন্যাস এবং গল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি এই সুগভীর জীবনস্বীকৃতি গোয়েটের বৈশিষ্ট্য "হ্বের্টরের দুঃখ" কাঁচা হাতের লেখা; কিন্তু সেই ঝড়ঝাপটার যুগেও গোয়েটে ভাববাদের মোহে কখনো ভোলেন নি তাঁর নায়ক-নায়িকা মানুষ, সে কারণে জটিল, দ্বিধাবিভক্ত, কোনো ভাবরূপের দেহায়ন নয়। তাঁর সব চাইতে দুঃসাহসী এবং পরিণত উপন্যাস হ্বাহ্লফার-হ্বান্ট্ শাফ্টেন্-এ (এর সঠিক বাংলা তর্জমা কি হতে পারে ভেবে পাই নি—ইংরেজী তর্জমায় ইলেক্টিভ্ অ্যাফিনিটিজ্) এই চেতনা বিচিত্র ফসলে সার্থকতা লাভ করেছে। এ বই পড়ে বায়রন গোয়েটেকে বলেছিলেন "বুড়ো শেয়াল।" রবিঠাকুর সম্বন্ধে এ কথা মুখে আনা দূরের কথা তাঁর অতি বিরূপ সমালোচকও মনে পর্যন্ত আনতে পারবেন না। কিন্তু লেখক হিসাবে তাতে লোকসানটা কার হল? ঋষি হয়ে রবীন্দ্রনাথ কি পারলেন এডুয়ার্ড, শার্লোটে অথবা ওটিলীর মত চরিত্র সৃষ্টি করতে? ঋষি হবার আগে তবু বিনোদিনী মহেন্দ্রের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। ঋষি হবার পর সে জীবনবোধ কোথায় গেল? কোথায় সেই গভীরতা, বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য, সংঘাত, প্রাণৈশ্বর্য? রবীন্দ্রনাথের পরিণত কালের রচনার পাশাপাশি গোয়েটের পরিণত রচনা পড়লে হৃদয়ঙ্গম হয় ভাববাদের গণ্ডী পেরোতে পারার ফলে জার্মান লেখকের জীবনবোধ ব্যাপ্তি এবং গভীরতায় বাঙালী লেখকের চাইতে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। শুধু 'হ্বিল্হেল্ম্ মাইস্টারের শিক্ষানবিশী' উপন্যাসে গোয়েটে যত বিচিত্র স্তরের এবং প্রকৃতির চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—মারিয়ানা, মেলিনা, ফিলিন, লেয়র্টেস্, মিগ্নন্, হার্প-বাজিয়ে বুড়ো, আউরেলিয়া, জার্নো, ফেলিক্স্, লোটারিও, লিডিয়া, টেরেসা, বারবারা, হ্বার্নর, নাটালিয়া ফ্রিডেরিক—রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাস মিলিয়েও তার তুলনা হয় না। শুধু তাই নয়, তারা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট জটিল জীবন্ত, পরিবর্তনশীল।

অপরপক্ষে অস্তিত্বের মূলে যে সংঘাত, ভালোমন্দের যে দুঃসমাধেয় সমস্যা, গোয়েটে তাকে আদর্শ বা নীতির নামে সরল বা সহনীয় করার চেষ্টা করেন নি। মেফিস্টোর সঙ্গে চুক্তি হবার পর ফাউস্ট বলেছিল, মানুষের ভাগ্যে যত যন্ত্রণা আছে আমাদের অস্তিত্ব দিয়ে তার সব আমি জানব, আমার আত্মা দিয়ে ছোঁব তাদের উচ্চতম চূড়া আর নিম্নতম গহ্বর, আমার বুকে টেনে নেব তাদের সব আনন্দ বেদনা, আমার সত্তা ছড়িয়ে যাবে তাদের সকলের সত্তায়।

Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,
Will ich mit meinem inneren Selbst geniessen,
Mit meinem Geist das Hochst und Tiefste greifen,
Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen haufen,
Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern.

এ শুধু ফাউস্ট চরিত্রের মূল কথা নয়, "ফাউস্ট" নাটক এবং গোয়েটের জীবন এবং সাহিত্যসাধনারও মূলকথা। একথা যিনি বলতে পারেন তাঁর পক্ষে নিখিলেশ-সন্দীপের বিরোধকেই অস্তিত্বের চরম বিরোধ ভাবা সম্ভব নয়। তিনি জানেন যে মেফিস্টোফেলিস ফাউস্টকে বাইরে থেকে প্রলুব্ধ করে নি, ফাউস্টের সমগ্র অস্তিত্ব থেকেই তার উদ্ভব। ভালোমন্দর বিরোধ অস্তিত্বের মূলে; সে বিরোধের যন্ত্রণা যে জানে না, অস্তিত্বের উচ্চতম শিখরও তার অনায়ত্ত। এই বোধ থেকে জন্ম নিয়েছে টাসো, ইফিগেনী, ভিল্‌হেল্‌ম্‌, ওটিলী, ফাউস্ট, মেফিস্টোফেলিস এবং মার্গারেটা। গোয়েটে এই বোধের জোরে হোমার, বেদব্যাস, লেওনার্দো, শেক্সপীয়রের সমকক্ষ স্রষ্টা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র মহৎ প্রতিভা সত্ত্বেও সে কক্ষে স্থান পাবার ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কিনা, তা আমার মনে হয় প্রশ্নসাপেক্ষ।

ভাষার দিক থেকেও গোয়েটের মন শেক্সপীয়রের মত সংস্কারমুক্ত। 'ফাউস্ট' নাটকের প্রথম খসড়ার একটি বিখ্যাত চরণে তিনি লিখেছিলেন: 'বাক্‌চাতুরী! পুতুলনাচের সঙ্গেই ওটা মানায়।' (Was Vortrag! Das ist gut furs Puppenspiel)। কোমলকান্ত পদাবলীতে তিনি সিদ্ধ ছিলেন; ধীরোদাত্ত ভাষাও তাঁর আয়ত্তে ছিল। কিন্তু তার জন্যে তিনি হাটবাটের ভাষাকে অবহেলা করেন নি, ভোলেন নি ইতরজনের ভাষার মধ্যেও অসামান্য ব্যঞ্জনার সম্ভাবনা নিহিত থাকে।[১৪] সব চেয়ে বড় কথা অশ্লীলতার

১৪। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

ভয়ে তিনি কখনো তাষাকে কৃত্রিম বা অস্বচ্ছ করে তোলেন নি।[১] ভাষা বিষয়ে গোয়েটের এই মুক্তবুদ্ধির সবচাইতে সার্থক উদাহরণ 'ফাউস্ট'। এখানে তিনি শ্লীল-অশ্লীল, অভিজাত-ইতর, কোমল-রুক্ষ, বিচিত্র স্তর এবং প্রকৃতির ভাষায় যে আশ্চর্য ঐক্যতান সৃষ্টি করেছেন শেক্সপীয়রের নাটকের বাইরে তার তুলনা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার অন্তত জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই; সে ঋণকে ছোট করে দেখানো ঘোর নির্বুদ্ধিতা। রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট হয়েছি বলেই আজ আমরা বিশ্বভূমিকায় তাঁকে বিচার করার কথা ভাবতে পারি। অসামান্য সৃজনশক্তি এবং মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়েও তিনি যদি গোয়েটে এবং শেক্সপীয়রের পর্যায়ে না পৌঁছতে পেরে থাকেন, তবে তার জন্য তিনি যতখানি দায়ী এদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ তার চাইতে কম দায়ী নয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সে পরিবেশের রূপান্তর যে কত প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মহৎ ব্যর্থতার দ্বারা তা প্রমাণ করে গেলেন। কৃতজ্ঞতাজাত ভক্তির আতিশয্যে সে কথা যদি আমরা না বুঝতে পারি তবে তাঁর দাক্ষিণ্যের ঋণ কি করে শুধব?

১। এই প্রবন্ধটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর মাস ছয়েক ধরে—তার নানা প্রতিবাদ বেরোয়। রবীন্দ্রভক্তেরা সবচাইতে উত্তেজিত হয়েছিলেন আমার উপরোক্ত প্রশ্নে। এখন মনে হয় প্রশ্নটিকে আমি ঠিকভাবে উপস্থিত করতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুগভীর অনুভবের সন্ধান অবশ্যই মেলে। কিন্তু সেখানে যা দুর্লভ তা এক বিশেষ প্রকৃতির অনুভব—অনতিক্রম্য শূন্যতার, আপোষহীন আপজাত্যের, ট্র্যাজিক বিষজের। এমনকি তাঁর শেষযুগের কবিতার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আস্তিক্যচিহ্নিত। আনন্দ ও উৎকাজ্ঞা, বিরহ ও প্রতীক্ষা তাঁর কবিতায়, গানে বিচিত্র প্রকাশ লাভ করেছে। কিন্তু নিরুপায় পুরুষের যন্ত্রণা, আপতিক অস্তিত্বের নির্বেদ? রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের প্রত্যাশা যদি অল্প হত তাহলে যা তাঁর কাছে পাইনা সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন হবার প্রয়োজন ঘটত না। যা তিনি দিয়েছেন তা প্রচুর। যা তিনি দিতে পারে নি তার জন্য আমরা যাই বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, রিল্‌কে, ইয়েট্‌স্, এলিয়েটের কাছে।

২। অনেকের ধারণা রিফর্মেশন রনেসাঁসেরই একটা দিক। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রটেস্ট্যান্ট হওয়ার ফলে তাঁদের ইতিহাস ব্যাখ্যায় রিফর্মেশনের প্রতিক্রিয়াশীল দিকটি খুলে দেখানো হয়নি। এবং যেহেতু আমরা ইংরেজের লেখা ইতিহাস পড়ে ইয়োরোপ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছি, সেকারণে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের ধারণা রনেসাঁস আর

রিফর্মেশ্যনের মধ্যে বিশেষ কোন ফারাক নেই। আসলে কিন্তু রনেসাঁস এবং রিফর্মেশ্যনের মধ্যে মিলের চাইতে বিরোধ অনেক বেশী। রিফর্মেশ্যনের অভাবাত্মক দিকটি বিষয়ে যাঁরা জানতে চান তাঁদের বিশেষ করে এরিখ ফ্রোম্ সাহেবের "দি ফিয়ার অব্ ফ্রিডম্" (পৃঃ ৫৩-৮৮) এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের "রীজন্, রোমান্টিসিজ্ম্ অ্যাণ্ড রেভোলিউশ্যন," প্রথম খণ্ড (পৃঃ ১০৩-১৩১) পড়তে অনুরোধ করি। গোয়েটে অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন প্রটেষ্ট্যান্টিজ্ম্ জার্মানীর কতখানি ক্ষতি করছে। তাঁর এই চরণ দুটি খুব বিখ্যাত:

Franztum drangt in diesen verworrenen Tagen, wie einstmals
Luthertum ist getan, ruhige Bildung Zuruck.

"শান্ত সংস্কৃতি পূর্বে যেমন লুথারের দ্বারা পীড়িত হয়েছিল, আমাদের এই ক্ষুব্ধ যুগে তেমনি ফ্রান্সের দ্বারা তাড়িত হয়ে পিছু হটছে।" এই কারণেই তিনি হ্বিঙ্কেল্মানের প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্ম ত্যাগ করে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করার মধ্যে কোনো দোষ দেখতে পাননি। বরং তিনি বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে হ্বিঙ্কেল্মান্ আসলে প্রটেষ্ট্যান্টও নন, ক্যাথলিকও নন, তিনি একান্ত ভাবেই প্রকৃতিপন্থী। "হ্বিঙ্কেল্মানের জীবনী" পড়ে শ্লেগেল তাই বলেছিলেন, ‚এ বই যে লিখেছে সে ঈশ্বরদ্রোহী।

(৩) শুধু "সত্যের আহ্বান"-এ নয়, আরও অনেক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর কঠোর সমালোচনা করেছেন। অথচ গান্ধীকে তিনি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন; তাঁর সততা আত্মপ্রত্যয়, মানবপ্রেম, নিষ্ঠা এসব দুর্লভগুণের জন্য তাঁকে তিনি বারবার শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু যেখানে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতে মেলেনি, সেখানে সে অমিলের কথা তিনি সোজাসুজি স্বীকার করেছেন। খিলাফৎ, চরকা, স্বরাজ, অসহযোগ, পশ্চিম-বিমুখ মনোভাব, আত্মনিগ্রহ, জাতীয়তাবাদ, ঐশী নির্দেশ ইত্যাদি অনেক ব্যাপারেই তিনি গান্ধীজির বিরোধিতা করেছেন। প্রতিক্ষেত্রেই কবি যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গান্ধীর সমালোচনা করেছেন সেটি স্পষ্টতই মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী। কৌতূহলী পাঠক এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত লেখাগুলি পড়ে দেখতে পারেন: ১৯২০-২১ সালে বিদেশ থেকে এণ্ড্রুজ্ সাহেবকে লেখা পত্রাবলী; বরদৌলী সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে লাল দলপত রায়কে লেখা খোলা চিঠি; "শিক্ষার মিলন", "সত্যের আহ্বান", "সমস্যা", "সমাধান" "চরকা", "স্বরাজ সাধন"; ১৯৩০ সালে বিলেতে স্পেক্টেটর পত্রিকায় (১৫ নভেম্বর) গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব সম্বন্ধে চিঠি; ১৯৩৪ সালে বিহার ভূমিকম্পের পরে গান্ধীজির বক্তব্যের প্রতিবাদ করে চিঠি। চিঠিগুলি ছাড়া বাকী প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ডে "কালান্তর" এবং তার "সংযোজনে" মিলবে। ***Gandhi, India and the world*** নামক আমার সম্পাদিত গ্রন্থে এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

(৪) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ একই সময়ের মানুষ হ'য়েও পরস্পরকে আগাগোড়া এড়িয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১তে; বিবেকানন্দের ১৮৬৩। প্রথম যৌবনে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেছেন। বিবেকানন্দ যখন মারা যান (১৯০২) রবীন্দ্রনাথ তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তাঁর "চোখের বালি" উপন্যাস তখন প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ বিবেকানন্দের লেখায় রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ নেই: এবং বিবেকানন্দের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর সম্বন্ধে যে সামান্য উল্লেখ আছে তাতে ব্যঙ্গের ভাব খুব প্রচ্ছন্ন নয়। (বঙ্গদর্শন,

"সমাজভেদ", ১৩০৮, আষাঢ়।) পরবর্তীকালেও কবি তাঁর লেখায় রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দকে বিশেষ আমল দেননি। অথচ রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর মত শ্রদ্ধাশীল এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রচনা আজ পর্যন্ত আর কেউ লেখেননি।

৫। একথা বলার জন্য রবীন্দ্রনাথকে কম আক্রমণ সইতে হয়নি। প্রগতিপন্থী "সবুজপত্র"-র সমকালীন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল চিত্তরঞ্জন দাসের রক্ষণশীল পত্রিকা "নারায়ণ"। উক্ত পত্রিকায় "স্ত্রীর পত্র"কে বিদ্রূপ করে স্বামীর তরফ থেকে পাল্টা জবাব প্রকাশিত হয়—তার লেখক সম্ভবত বিপিনচন্দ্র পাল।

(৬) এখানে সব কটি ইংরেজী উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা থেকে নেওয়া; দুঃসাহসে ভর ক'রে সেগুলির যতদূর সম্ভব মূলানুগ বাংলা তর্জমা করার চেষ্টা করেছি।

(৭) "মানুষের সঙ্গে মানুষে যে একত্র হয়েছে এই মহৎ ঘটনাকে আমরা আজও সত্য বলে অনুভব করতে পারছি নে। তাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষায় সেই প্রাচীন অভ্যাসটাকে মনের মধ্যে পাকা ক'রে তোলবার চেষ্টা এখনও চলেছে, তাই স্বাজাত্যের অভিমানকে অতিশয় ক'রে তোলাকেই আমরা কর্তব্য বলে স্থির করেছি। এমন অবস্থায় কোনো এক জায়গায় আজ সেই বাণী-ঘোষণার কেন্দ্র থাকা চাই, যে-বাণী অতীত কালের বাণী নয়, যে-বাণী ভবিষ্যতের বিরাট মুক্তিক্ষেত্রের বাণী।" বিশ্বভারতী উদ্বোধনের আগের দিন পৌষ উৎসবের ভাষণ।

"কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে, তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না।... আমরা কি এ কথাই বলব যে মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই। তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সব চেয়ে বড়ো গৌরব? এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও এ'কে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।" বিশ্বভারতীর উদ্বোধন ভাষণ।

(৮) ১৯৪৯ সালের একটি ঘটনা মনে পড়ে। একটি ছাত্র-সভায় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আমি আহূত হয়ে যাই। তরুণ মনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আবেদন সম্পর্কে আমি কিছু বলি; প্রতিবাদে হীরেন বাবু ঘোষণা করেন রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ "bastard culture"-এর প্রতিভূ (তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন)। তৎকালে এটিই ছিল কম্যুনিষ্টদের সরকারী মত। পরে কম্যুনিষ্টদের এই সিদ্ধান্ত বদলায়, হীরেন বাবুরও দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে। সম্প্রতিকালে ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের মধ্যে নক্সালপন্থীরা এই মত অবলম্বন করেছেন।

(৯) এ প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করতে অনুরোধ করি যে কবি যখন ১৯২৬ সালে মুসোলিনীর অতিথি হয়ে ইতালি যান, তখন সেখানেও এই একই কারণে মুসোলিনীর প্রভূত প্রশস্তিবাচন করেছিলেন। ইতালিতে তিনি ছিলেন সপ্তাহ তিনেকের মত (৩০ মে—২২ শে জুন) এবং শুধু রোমে আটকা না থেকে অনেকগুলি শহর ঘুরেছিলেন। তা সত্ত্বেও ফাসিজ্‌ম্‌-এর বীভৎস স্বরূপ গোড়াতে তাঁর চোখে পড়ে নি। পরে ইতালি থেকে ফেরার পথে র‍্যলাঁ, সালভাদোরির স্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে আলাপের ফলে বুঝতে পারেন, কি আদর্শে কি ক্রিয়াকর্মে ফাসিজ্‌ম্‌ মানবতার আমূল বিরোধী। তখন তিনি ফাসিজ্‌ম্‌-এর তীব্র সমালোচনা করে এণ্ড্রুজ সাহেবকে এক চিঠি লেখেন

এবং সে চিঠি ১৯২৬এর ৪ আগস্ট বিলেতের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত হয়। কম্যুনিজ্‌ম এবং রাশিয়া সম্বন্ধে ঐ ধরনের খাঁটি খবর দেনেওয়ালা কোনো লোকের সঙ্গে কবির আলোচনা হয়েছিল বলে জানা নেই।

(১০) অবশ্য নানা সূত্র থেকে স্পষ্ট তাঁর জীবনে অন্তত দুবার প্রবলভাবে প্রেমের আবির্ভাব ঘটেছিল। একবার তরুণ বয়সে যার ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তি ঘটে যাঁকে ভালবেসেছিলেন তাঁর আত্মহত্যার মধ্যে: দ্বিতীয়বার প্রৌঢ় বয়সে আর্জেন্টিনায় প্রবাসকালে। প্রথম অভিজ্ঞতাটি নিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর "কবিমানসী" গ্রন্থে।

(১১) 'যোগাযোগ" সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গোক্তি শুধু ঈর্ষাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। "যোগাযোগ বইখানা যখন 'বিচিত্রা'য় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবল-পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ-অব-ওয়ারের শেষ হবে কি করে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্তে এসে।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত "শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী" পৃঃ ১৪৯)। শরৎচন্দ্র "যোগাযোগে"র মত কোনো উপন্যাস লিখতে পারেন নি বলে "যোগাযোগ" সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ অযৌক্তিক বলা চলে না।

(১২) *Quest* পত্রিকায় (এপ্রিল-জুন, ১৯৬০) লেখকের প্রবন্ধ Albert Camus দ্রষ্টব্য।

(১৩) রবীন্দ্রনাথ সতের বছর বয়সে "ভারতী" পত্রিকায় (কার্তিক, ১২৮৫) 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। অল্পবয়সে লেখা হলেও প্রবন্ধটি তাৎপর্যপূর্ণ। গোয়েটেকে তাঁর পছন্দ হয়নি তার কারণ গোয়েটের "প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ।" গোয়েটে "তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভালবাসিয়া আসিয়াছেন, অথচ বিয়াত্রীচে বা লরার ন্যায় তাঁহার একটি প্রণয়িনীর নাম করিতে পারিলাম না।" "অর্থাৎ প্রেমিক হিসেবে গোয়েটে না আদর্শবাদী না একনিষ্ঠ।" "প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই।" তরুণ সমালোচকের মতে গোয়েটে তাঁর জীবনে এক একটি প্রেম-আখ্যান শেষ হইলে অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা পিত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না। বাস্তব ঘটনাই নাটকের প্রাণ, আদর্শ জগৎই কবিতার বিলাসভূমি।" প্রেম এবং কবিতা সম্পর্কে এই প্রতিন্যাস রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালেও ছাড়তে পারেন নি।

(১৪) গোয়েটে জন্মেছিলেন শিক্ষিত অবস্থাপন্ন পরিবারে, লেখাপড়া শিখেছিলেন লাইপ্‌ট্‌সীগ্‌ এবং স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অল্প কিছুকাল আইনজীবীর কাজ করার পর ভাইমার সরকারের একজন মন্ত্রী হন। সুতরাং জনসাধারণের জীবন এবং ভাষা থেকে তাঁর বিচ্ছিন্ন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হতে পারে খ্যাতিপ্রতিপত্তি অর্জনের পর তিনি সর্বসাধারণ থেকে সরে এসেছেন। কিন্তু আসলে মনের দিক থেকে তিনি যে মোটেই বিচ্ছিন্ন হননি শুধু "ফাউস্ট" নাটকের ভাষা থেকেই তার বহু উদাহরণ দেখানো যায়। ইতর জনের ভাষা যে সাহিত্যে মোটেই অপাংক্তেয় নয়, সাহিত্য চর্চার প্রথম যুগেই একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। "হানস্ ব্রুর্স্ট্‌স্ হখ্‌ৎসাইট্‌" নামে তাঁর প্রথম যৌবনের রচনা অসমাপ্ত ব্যঙ্গকাব্যটি প্রায় আগাগোড়াই খিস্তির ভাষায় লেখা। এটির সাহিত্যগুণ খুব বেশী নয় সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে

রাখা দরকার যে গোয়েটে যখন এটি লিখছেন ঠিক তখনি তার পাশাপাশি শুরু করেছেন "ফাউস্ট" প্রথম খণ্ডের খসড়া। টমাস মান দেখিয়েছেন, পরিণত অবস্থাতেও "ফাউস্টের" ভাষার মধ্যে বহু বারবার "হান্‌স্‌"-এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। "হান্‌সের বিয়ে" কাঁচা লেখা কিন্তু তার কাহিনী এবং তাহার মধ্যে কবি যে সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন সেটিকে বাঁচিয়ে না রাখতে পারলে "ফাউস্ট" কোনো দিনই লেখা সম্ভব হতনা। এই সংস্কারমুক্ত মনোভাব গোয়েটে শেষদিন পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন। প্রমাণ "ভাল্‌ফারভান্ট্‌শাফ্‌টেন"-এর কাহিনী, চুয়াত্তর বছর বয়সে উলরিকার প্রেমে পড়ে লেখা "মারীনবাড" গাথা; তাঁর জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত "রোজনামচা" নামে দীর্ঘ কবিতা। শেষোক্ত রচনাটিতে ঋতুসংহার এবং মোহমুদ্গর যেন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে। "বুড়ো শেয়াল"ই বটে। অথবা মেকিয়াভেলির অনুকরণ করে বলা যায়, শৃগাল এবং সিংহের সমন্বয়। কারণ ইতরকে আত্মস্থ করার ফলে তাঁর আভিজাত্য মোটেই হ্রাস পায়নি।

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করার পথে দুটি মস্ত বাধা আছে। প্রথমত, সাধারণ রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে খুব কম লোক তাঁর ছবির সঙ্গে পরিচিত।[১] ফলে তাঁর বিশেষ বিশেষ ছবি নিয়ে আলোচনা করলে অনেকের কাছেই তা আবোধ্য ঠেকবে। দ্বিতীয়ত, এই কর্তাভজার দেশে তাঁর সম্বন্ধে এমন একটি বিচারবিমুখ ভক্তিগদগদ ভাব গড়ে উঠেছে যেটি অন্তত তাঁর আঁকা ছবিগুলি নিয়ে আলোচনা করার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। কেননা, ছবি-আঁকিয়ে রবিঠাকুর আমাদের চোখে যতই চমক লাগান না কেন, স্বীকার না করে উপায় নেই তাঁর আঁকা ছবি কারো মনে ভক্তিভাবের উদ্রেক করে না। ছবি-আঁকিয়ে রবিঠাকুর আর যা-ই হোন ঋষি নন। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে ঋষি দেশীবিদেশী পণ্ডিতদের মুখে বারবার একথা শুনে এ বিষয়ে আমাদের মনে একটা অন্ধ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে তাঁর ছবি সম্বন্ধে কোনো যথার্থ আলোচনা করতে হলে প্রথমেই এই অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আঘাত হানতে হয়। আর অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধিতা করা যে কি সাংঘাতিক কাজ সোক্রেটিস থেকে রামমোহন রায় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রেখে গেছেন।

তবু সেই কারণেই আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলি বিষয়ে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ আলোচনা থেকে চিত্রকর বা চিত্রানুরাগীরা কতটা লাভবান হবেন বলা শক্ত, কিন্তু এর ফলে রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের বোধ যে আরো গভীর এবং যথার্থ হয়ে উঠবে তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। কেননা এ ছবিগুলি থেকে শুধু একথাই জানা যায় না যে লেওনার্দো কি মিকেলাঞ্জেলোর মত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও বহুমুখী ছিল; এরা এ সংবাদও বহন করে যে রবীন্দ্র-মানস আমাদের মুগ্ধ কল্পনায় যতখানি নিটোল, দ্বন্দ্ববিহীন, সম্পূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়ে এসেছে ঠিক ততখানি তা ছিল না। লেওনার্দোর মত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও যে বহুমুখী ছিল, একথা সবারই জানা। কিন্তু সে প্রতিভাও যে পুরোপুরি অন্তর্বিরোধের হাত এড়াতে পারে নি এ সত্য খুব কম রবীন্দ্রানুরাগীরই নজরে পড়েছে। অথচ

১। প্রবন্ধের শেষে প্রথম টীকা।

রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা নির্ভেজাল ব্রহ্মজ্ঞানী বানিয়ে আমাদের জীবন থেকে বিদায় দিতে না চাই, অন্তরঙ্গতাহীন অমরত্বকেই যদি আমরা শিল্পপ্রতিভার চরম পুরস্কার মনে না করি, রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক মনের মধ্যে যোগসাধন যদি আমাদের নিষ্প্রয়োজন না মনে হয়, তবে রবীন্দ্রপ্রাতভার মধ্যে অন্তর্বিরোধের যে আভাস এই ছবিগুলির মধ্যে পাওয়া যায় তার প্রতি উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে ঘোরতর নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। স্বীকার করি এই বিরোধ রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। এই দিক থেকে তিনি শেক্‌স্‌পীয়র, গোয়েটে বা ডস্টয়েভ্‌স্কির উত্তরসাধক নন। তিনি মূলত শান্তির, প্রেমের, প্রত্যয়ের কবি। তবু তাঁর জীবনে এবং শিল্প সাধনায় অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা যে একেবারে অবর্তমান ছিল না, জীবনের কোনো একটি অধ্যায়ে তাঁর চেতনা সমসাময়িক অন্যান্য বাঙালী শিল্পী-সাহিত্যিকদের তুলনায় আধুনিক মনের অনেক বেশী নিকটবর্তী হয়েছিল, ছবিগুলির আলোয় তাঁর রচনাবলী ফিরে পড়লে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই অবহেলিত দিকটি সম্ভবত ধরা পড়বে। সুতরাং চিত্রজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে আলোচনা করুন বা নাই করুন সৎ রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেরই এদিকে অবহিত হবার প্রয়োজন আছে।[২]

॥ দুই ॥

তাঁর মৃত্যুর পরে আবিষ্কৃত "স্টেলার জন্য জর্ণালে" ডীন সুইফ্‌টের যে চেহারাটি ধরা পড়েছিল তা যেমন অপরিচিত তেমনি অপ্রত্যাশিত। তাঁর জীবিতকালে সমসাময়িক ইয়াহু-রা তাঁর শাণিত বিদ্রূপকেই চিরদিন ভয় করে এসেছে। কে জান্‌ত এই মানুষই সসঙ্কোচ জর্নালের পাতায় পাতায় এত মমতা আর অনুরাগ, এত স্বপ্ন আর বেদনা সংগোপনে সঞ্চিত করে রেখেছিল। তাঁর শিল্প যেন কোন জিঘাংসু মনের উদ্যত খড়্গ। আর জর্নালের পাতায় লুকিয়ে আছে এক আর্ত আহত শিশুমুখ—একান্তভাবে সে ভালবাসতে চায়, চায় ভালবাসা পেতে।

সংসারে যারা সুইফ্‌টের মত তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল মানুষ—আর কি সে সংসার! সন্দেহ, ভয় আর নিষেধকে দেবতা বলে পূজা করাই যার ধর্ম।—

২। প্রবন্ধের শেষে দ্বিতীয় টীকা।

অনেক সময়েই তারা তাদের জীবনকে এক অবোধ্য, অস্বচ্ছ, স্वবিরোধী উপাখ্যান করে তোলে। যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরাই শুধু নিজেদের ভিতরকার পরস্পরবিরোধী বৃত্তিকে চিনতে পারেন, জানতে পারেন, জটিল এবং অন্দর সমগ্রতায় মেলাবার সাধনা করতে পারেন। শ্রেয়-র নামে প্রেয়-কে বলি দেবার বিবেকী প্রলোভনে তাঁরা ধরা দেন না। গোয়েটের জীবন সত্তার এই সমগ্রতা অর্জনের এক আশ্চর্য সাধনা : ফাউস্টের মত মেফিস্টোফেলিস্-ও তাঁরই সত্তার অপর রূপ। টল্‌স্টয়ও একদিন এ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে এক-মনের অসহিষ্ণু দাবি মেটাতে গিয়ে তাঁকে নির্মম অধ্যবসায়ে অপর-মনকে মুছে ফেলতে হয়েছিল।

আমাদের যুগের সার্থকতম জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যে এমনিতর প্রচ্ছন্ন তবু গভীর আত্মবিরোধ নিহিত ছিল, তাঁর অনুরাগীবৃন্দ সাধারণত তা স্বীকার করেন না। তিনি নিজেও সে বিষয়ে সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। অন্তত তাঁর প্রকাশ্য জীবনে—আর সাধারণ স্বীকৃতি লাভের পর থেকে তাঁর জীবনের বেশীটাই ত প্রকাশ্য—এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে এ ধরনের আভ্যন্তরীণ বিরোধবোধের চিহ্ন আপাতদৃষ্টিতে বড় একটা চোখে পড়ে না। তবু তাঁর বিচিত্রমুখী প্রয়াসের বিশেষ একটি ক্ষেত্রে এই বিরোধের উপস্থিতি প্রবলভাবেই স্পষ্ট—আমি তাঁর আঁকা চিত্র এবং স্কেচ্‌গুলির কথা বলছি। এদের মধ্যে যে মুখের আদল ধরা পড়েছে, আমাদের সকলের বিস্মিত বিমুগ্ধ চেনাজানার আপোলোনিয়ান মুখশ্রীর সঙ্গে তার সুদূরতম সাদৃশ্যও আবিষ্কার করা কঠিন। তাঁর পরিণত জীবন এবং শিল্পসৃষ্টিকে আমরা সত্যশিবসুন্দর বা হেলেনিক "টো-আগাথন"-এর নিকটতম রূপায়ণ বলেই জেনে এসেছি। কিন্তু এই ছবিগুলির মধ্যে যাঁকে দেখা গেল তাঁর মেজাজ নিতান্তই ডায়োনিসিয়ান—আদিম এবং গ্রোটেস্ক্—সে মুখের রেখাকৃতি জ্যামিতিক সুষমার প্রতিবাদী, তা স্থূল, গুরুভার, অস্বচ্ছ, জান্তব আবেগে থরথর।

এই ছবিগুলির আড়ালে কোনো এক প্রবল এবং প্রাক্‌চেতন অস্বস্তি যেন ওৎ পেতে আছে। প্লেটো দেখলে বলতেন এদের প্রগল্‌ভিত সংসর্গ অস্বাস্থ্যকর, বুদ্ধির গোড়ায় পচ ধরতে পারে। সময়ের যে নগণ্য খণ্ডের নাম সভ্যতার ইতিহাস, এদের জগৎ তা থেকে প্রাচীন, এদের উদ্ভব মানবসত্তার প্রাক্-সাংস্কৃতিক স্তরের গভীরে। চৈতন্যের সাধনা হল এই গভীরকে আলোকিত করা, আমাদের অন্ধ জৈব বৃত্তিগুলিকে সুষমিত করে সত্তার সামগ্রিক বিকাশের

মধ্যে মুক্তি দেওয়া। এ ছবিগুলিতে সে সাধনা শুধু অনুপস্থিত নয়, অস্বীকৃত। এদের আবহাওয়া ভিজে, ভয় দেখানো, বদ্ধ বললেও বুঝি ভুল হয় না,—শ্বাসরোধী, সূর্যবিহীন। দালি কিম্বা আর্নস্ট কিম্বা মাঝ-বয়েসী পিকাসোর সচেতন (আর সেই কারণে স্ব-বিরোধী) ছবিগুলির চাইতেও এরা একান্ত এবং মারাত্মকভাবে স্যুররেয়ালিস্ত্।

আমি জানি আমার এ প্রস্তাব রবীন্দ্রভক্তেরা উস্মিত উপেক্ষায় নাকচ করতে চাইবেন। এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব খর্বিত করার অভিপ্রায় আমার নেই, এ জাতীয় ভাবাবেগকে তাই আমি অশ্রদ্ধেয় ভাবতে পারি নে। কিন্তু ভক্তিতে যদি বা কৃষ্ণ মেলেন, প্রত্যক্ষের অস্বীকারে জ্ঞান মেলে না। আর দার্শনিক ও শব্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ এবং ছবি আঁকিয়ে রবিঠাকুরের মাঝখানে একটা মস্ত চওড়া খাদের উপস্থিতি বেখাপ্পা চমক্‌লাগানো ভাবেই প্রত্যক্ষ। শুধু চোখ ঠেরে সে খাদের ওপরে সেতু গড়বার ভরসা সামান্য। খাদটা যে অন্তত প্রত্যক্ষ, এটা না মানলে সেতু গড়ার কথাই উঠতে পারে না। সেটা আসলে বাহ্য, না, তাঁর পরিণত সত্তার অনপনেয় চারিত্রিক, তাঁর অন্তর্জীবনের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় সত্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের সার্থক বিচার সম্ভবপর নয়। সে কাজ এখনো শুরু পর্যন্ত হয় নি। জীবনী এবং স্মৃতিকথা নামে যেসব মালমশলা বই অথবা প্রবন্ধ আকারে উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে প্রধানতঃ কিছু ঘটনার বহিরঙ্গ সম্বন্ধে খোঁজ মেলে। আমাদের সমসাময়িক বা ভবিষ্যৎকালের যে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তার এই অন্তরকাহিনী লিখবেন, মহৎসৃষ্টির অমরতা যে তাঁর প্রাপ্য পুরস্কার কোন সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে যতদিন না সে তথ্যাবলীর সংগ্রহ, বিচার এবং সুষমিত বিন্যাস ঘটছে ততদিন এই প্রত্যক্ষ স্ববিরোধ সম্বন্ধে নানা রকম আন্দাজ পেশ করবার হয়ত কিছু সার্থকতা আছে। এটা মোটামুটি জানা যে অঙ্কন শিল্পরীতিতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন শিক্ষালাভ করেন নি। যদি বা মাঝ বয়সে শখ করে দু-দশখানা ছবি আঁকার জন্যে অধ্যবসায় করেও থাকেন, সে চেষ্টা মূলত অপরের চিত্রকে মক্‌শ করে ব্যর্থ অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর বৃদ্ধবয়সের স্বকীয় অঙ্কনরীতির উদ্ভব বাহ্যত এক ধরনের খেয়াল-খেলার মধ্য থেকে। নিজের নানা রচনার প্রথম খসড়া লেখার সময়ে পাণ্ডুলিপিতে যখনি কিছু কাটাকুটি মার্জনার দরকার পড়ত, তখন এই শৌখীন মানুষটি অনেক

সময়ে অনবগত মনে সেই কাটাকুটিগুলিকে মোটা রেখায় একত্র সমন্বয় করে দিতেন, আর তারই ভিতর থেকে কখনো কখনো বা নানা অদ্ভুত আকার গড়ে উঠত। এর উদ্দেশ্য আর যাই হোক ছবি আঁকা ছিল না। কাটাকুটির এই ডিজাইনগুলি ছিল শব্দশিল্পীর প্রকাশ সাধনার মাঝে মাঝে ফাঁকভরানোর চিহ্নমাত্র।

কিন্তু গোড়াতে যা ছিল অবসর বিনোদন, ক্রমেই তার সম্ভাবনা-সম্পদ প্রবল প্রলোভনের বিষয় হয়ে উঠল; অবশেষে ভালো লাগার খেলা হল ভালবাসার আসক্তি।[৩] প্রথম প্রথম প্রবীণ শব্দশিল্পী তাঁর এই নিতান্ত অপরিণত প্রণয় নিয়ে বিশেষ বিব্রত বোধ করতেন—এমন কি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছেও এই নতুন মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল উপস্থিত করতে তাঁর রীতিমত উদ্বেগ ও সংকোচ লাগত। পরে অবশ্য, অন্তত কয়েক বছরের মত, এই নতুন প্রণয়ের হাতে নিজেকে তিনি বেপরোয়াভাবে ছেড়ে দেন—আর এই সময়টায় তাঁর নানা উদ্ভট কাহিনী ও ছড়ার সঙ্গে অজস্র এলোমেলো স্কেচ আঁকা ছাড়াও বিশেষ অভিনিবেশের সঙ্গে নিয়মিতভাবে বহুসংখ্যক রঙীন ছবিও তিনি আঁকেন।[৪] শেষ পর্যন্ত বোধহয় এই বেয়াড়া আসক্তিতে তাঁর ক্লান্তি এসেছিল। সে কি এই অপরিচিত মাধ্যমের অন্তর্লোকে কোনোদিনই প্রবেশ করতে পারলেন না, সে কারণে? অথবা যে সব প্রাক্‌চেতনিক তাগিদ তাঁকে ভাষার সচেতন জগৎ থেকে চিত্র পটের অর্ধচেতন জগতের দিকে ঠেলেছে, তারা শেষ পর্যন্ত দুর্বল, অবসিত হয়ে গিয়েছিল?

॥ তিন ॥

নৃতাত্ত্বিকদের অসীম অধ্যবসায়ী গবেষণার ফলে এটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে আজ হতে তিরিশ হাজার বছর আগেও মানুষ ছবি আঁকত। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রায় প্রথম থেকেই মানুষ অন্য জীবদের মত শুধু টিঁকে থাকার লড়াইকে নিজের নিয়তি বলে মেনে নিতে পারে নি, সে লড়াইকে আত্মপ্রকাশের সাধনায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছে। এই সাধনারই অন্যতম ফল শিল্প। প্রতি শিল্পেরই নিজস্ব মাধ্যম এবং রীতি-

৩। প্রবন্ধের শেষে তৃতীয় টীকা।

৪। প্রবন্ধের শেষে চতুর্থ টীকা।

প্রক্রিয়া আছে। যেমন সুরের মাধ্যম ধ্বনি, চিত্রের মাধ্যম রং এবং রেখা, সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা। এর মধ্যে সুরের ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং মাধ্যমের সম্পর্ক সব চাইতে অপরোক্ষ এবং সে কারণে সঙ্গীতে স্ববিরোধ এবং আত্ম-সচেতনতা সবচাইতে কম। অপর পক্ষে যেহেতু ভাষা সমাজ-নির্ভর, সে কারণে সাহিত্যে, বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যে, শিল্পী এবং মাধ্যমের সম্বন্ধ স্পষ্টত পরোক্ষ এবং ফলে সাহিত্য কল্পনায় স্ব-বিরোধ এবং আত্মসচেতনতা এক রকম অনিবার্য। চিত্র শিল্পের প্রকৃতি সম্ভবত এ দু'এর মধ্যবর্তী।

আলতামিরার গুহায় আঁকা জীবজন্তুর যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের মার্ক শাগাল্ কি যামিনী রায় পর্যন্ত নানা দেশের চিত্রশিল্পীরা যে নানা মেজাজে নানা রীতিতে ছবি এঁকেছেন, মোটমুটি তা থেকে চিত্রশিল্পের তিনটি মূল ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম ধারাটি ছন্দপ্রধান, দ্বিতীয়টি রূপপ্রধান এবং তৃতীয়টি সাদৃশ্যপ্রধান। অবশ্য অধিকাংশ সৎ ছবিতেই ছন্দ, রূপ এবং সাদৃশ্য তিনটি লক্ষণই মিলেমিশে কমবেশী উপস্থিত থাকে। তবে কারো সমগ্রতা ছন্দের উপরে বিশেষভাবে নির্ভর করে, কারো-বা রূপের উপরে, কারো-বা সাদৃশ্যের। কথার সাহায্যে এ পার্থক্য ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবে উদাহরণ দিলে হয়ত প্রভেদটা স্পষ্টতর হবে। চীনে-ছবি বিশেষ করে ছন্দ-প্রধান, ভারতীয় ছবি অজন্তা বাঘ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত রূপ-প্রধান এবং রনেসাঁস থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিম ইয়োরোপের চিত্রকলা মুখ্যত সাদৃশ্য প্রধান। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবশ্য উপরোক্ত বিবরণের ব্যতিক্রম আছে। তবে ব্যতিক্রমের দ্বারা সাধারণ প্রস্তাব বাতিল হয় না, মার্জিত হয় মাত্র।

প্রাচীন চীনদেশের শিল্প-শাস্ত্রে ছন্দকে শিল্পের প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিয়েহ্ হো একেই বলেছেন চি-ইয়ুন্ শেঙ্-টুঙ্। পেত্রুচ্চি একে অনুবাদ করেছেন la consonance de l'esprit engendre le mouvement বলে। ওকাকুরা আরো স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় একে বলেছেন rhythmic vitality. অপর পক্ষে ভারতীয় বৌদ্ধ এবং হিন্দু শিল্পী ও শিল্পাচার্যদের আলেখ্যে এবং শিল্পালোচনায় রূপের দিকটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। হিন্দু শিল্প-শাস্ত্রে বিশদ বর্ণনা আছে কি ভাবে শিল্পী আকাশ থেকে বস্তুসম্পর্কহীন বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট রূপকে ধ্যানযোগে আকৃষ্ট করে বাহ্য মাধ্যমে আকার দান করেন।[৫] এ কল্পনার সঙ্গে পিথাগোরাস এবং

৫। প্রবন্ধের শেষে পঞ্চম টীকা।

প্লেটোর দর্শনের মিল সহজেই চোখে পড়ে। পরবর্তী কালে যশোধর পণ্ডিত কামসূত্রের টীকা করতে যেয়ে চিত্রের যে বড়ঙ্গের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্তত চারটি অঙ্গ মুখ্যত রূপ সংক্রান্ত: রূপভেদ, প্রমাণ, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ। এ দেশের ছবিতেও অবশ্যই ছন্দ আছে—ছন্দ ছাড়া কোন শিল্পই সম্ভব নয়—কিন্তু তার ঝোঁকটা রূপের উপরে। অপর পক্ষে পশ্চিম ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় চারশ' বছর ধরে যে শিল্পরীতি বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তার সবচাইতে বিশিষ্ট লক্ষণ হোল verisimilitude বা সাদৃশ্যসত্য গুণ; উচ্চেলোর আলেখ্যে কি পিসানেলোর রেখাঙ্কনে ছন্দ এবং রূপ দুইই আছে। কিন্তু যে গুণটি বিশেষ করে এঁদের আঁকাকে সজীব করেছে সেটি সাদৃশ্যের যাথার্থ্য। পরবর্তী কালে এই সাদৃশ্য সাধনা বিভিন্ন ধারায় আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে ডুয়েরার, রুবেন্‌স্‌, রেমব্রান্ট ইত্যাদির ছবিতে।

এখন রবীন্দ্রনাথের ছবি এই তিনটি মূল ধারার কোনটির মধ্যেই পড়ে না। তাঁর বহু ছবিতেই প্রাণ আছে, কিন্তু অধিকাংশ ছবিতেই প্রচলিত অর্থে ছন্দ অবর্তমান। যাঁর ব্যক্তিত্বের আর সব রকম প্রকাশের মধ্যে ছন্দ ছিল, তাঁর ছবিতে ছন্দ নেই, একথা বললে ভক্তরা নিশ্চয়ই আমার বক্তব্যকে সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে দেবেন। তবু যদি কেউ খোলা চোখে তাঁর ছবির পাশে সুঙ্গ যুগের যে কোনো চীনা চিত্রকরের ছবি দেখেন তা হলে আমার কথাটি হয়ত একেবারে নিরর্থক ঠেকবে না। এ তুলনা যদি অসঙ্গত ঠেকে তবে তাঁর প্রায় সমসাময়িক শিল্পী মার্ক শাগালের ছবির সঙ্গে তাঁর ছবি মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। দুজনেরই চিত্রকল্পনায় পুতুল, পাখী, পশু, স্বপ্নলোকের কিম্ভূতকিমাকারেরা আসর জমিয়েছে; কিন্তু শাগালের হাতে তারা হয়ে উঠেছে ছন্দময়। শাগালের ছবির যেটি বিশেষ লক্ষণ, রেনি শব্‌ যাকে বলেছেন, "ভালবাসা", হর্বর্ট রীড যাকে বলেছেন গীতধর্ম, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তার বিশেষ আভাস মেলে না।

ছন্দ নেই, কিন্তু রূপ? না, রং এবং রেখার উপাদানে রূপের সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করতে পারেন নি। রূপের সাধনায় রেখাই প্রধান, রং দ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথের রেখার হাত কাঁচা। কত কাঁচা পাকা শিল্পীদের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রিমিটিভ্‌ শিল্পের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। আমাদের শিল্পাচার্যরা যাকে বলেছেন রূপভেদ, রবীন্দ্রনাথ তাকে

কোনদিনই আয়ত্তে আনতে পারেন নি। অপর পক্ষে দু' একটি ছবি বাদ দিলে তাঁর অধিকাংশ ছবির বর্ণিকাভঙ্গ স্থূল এবং সীমাবদ্ধ। তাতে না আছে মাতিসের বিশুদ্ধ বর্ণ-প্রয়োগ সঞ্জাত উজ্জ্বলতা, না আছে অবনীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম রং-মেশানোর ব্যঞ্জনা। ফলে রং এবং রেখাকে আশ্রয় করে যে লাবণ্য দেখা দেয় রবীন্দ্রনাথের পটে তার কচিৎ সঞ্চার ঘটেছে।

আর সাদৃশ্য সত্যের অনুসন্ধান এবং চর্চা যে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সাধনার বিষয় ছিল না, তাঁর কিছু ছবিও যিনি একবার দেখেছেন তিনিই জানেন। এদিক থেকে তাঁর ছবির মেজাজ নিতান্ত আধুনিক। তবে আধুনিকদের সঙ্গে তফাৎটা শুধু এই যে আধুনিকেরা বস্তুরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমা অর্জন করে স্বেচ্ছায় সাদৃশ্য চিত্রণের পথ ত্যাগ করেছেন—আর তার জায়গায় ঝোঁক দিয়েছেন ছন্দ এবং রূপের উপরে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রমা এবং পরিপ্রেক্ষিতের একান্ত অভাব; কিন্তু ছন্দ অথবা রূপের দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হয় নি।

। চার ।

সুতরাং একথা এক রকম নিশ্চিত করেই বলা যায় যে চিত্রশিল্পের স্বকীয় সাধনা রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম ছিল না। তবে তাঁর এই ছবি এবং স্কেচগুলিতে এত গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন কি? মহৎ প্রতিভার সাময়িক অবসর বিনোদন বলে তাদের বরখাস্ত করলেই ত হয়।

না, তা হয় না। হাজার অস্পষ্টতা সত্ত্বেও এই ছবি এবং স্কেচগুলির মধ্যে এক প্রবল দুর্বোধ্য শক্তির উপস্থিতি আমাদের সত্তাকে আলোড়িত করে। যদি নাও জানা থাকত যে এদের স্রষ্টা একজন মহাকবি, তবু এরা নিজেরাই এদের বোবা বিক্ষোভের জোরে আমাদের আকৃষ্ট করত। রবীন্দ্রনাথের যৌবন এবং প্রথম প্রৌঢ় বয়সের বহু গদ্য-পদ্য রচনায় যার আভাস পাই সে এই ছবিগুলিতে সেই ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। এরা বোবা তবু জীবন্ত। আর যাই সম্ভব হোক এদের নিরর্থ বলে অবহেলা করা কঠিন।

যে ঐতিহ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে, তার নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা জায়গায় মস্ত দুর্বলতা ছিল। মানুষের কতকগুলি মৌল বৃত্তি, তাগিদ এবং জৈব ক্রিয়াকে পরম যত্নে অবদমিত করাকেই সে

ঐতিহ্য আত্মসংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলে বিশ্বাস করত। অথচ আমাদের মননশক্তি কিম্বা প্রতীকী সাধনার তুলনায় এই জৈব বৃত্তিগুলি কিছু আর ব্যক্তি-সত্তার কম গভীরে ওতপ্রোত নয়। ফলে কোন সংস্কৃতিই এদের উচ্ছেদ করতে পারে না, কিন্তু চেতনার স্তরে এদের প্রতি সংকোচ সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণ ক্ষেত্রে জৈব বৃত্তির এই অবদমন, নীতি এবং কর্তব্যের নামে সমর্থিত হয়ে থাকে। আর এই অবদমনকে মেনে নেওয়ার নামকরণ হয় বিবেক। সূক্ষ্মবোধ সম্পন্ন মানুষেরা অনেক সময় নীতি বিবেকের বদলে সৌন্দর্য এবং পরিমিতি বোধের তাগিদে এই অবদমনকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে স্বদেশী আত্মনিগ্রহাশ্রয়ী ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ভিক্টোরিয় শ্লীলতা ব্যাধি, ব্রাহ্ম পিউরিট্যানিজ্‌ম্ এবং উপনিষদী ব্রহ্মতত্ত্ব, শিল্পের ধ্রুপদী আদর্শ আর বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টির রোমান্টিক অভীপ্সা। এই সমবেত ধারাগুলির রসে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র পুষ্টি লাভ করেছে। তাঁর জীবনশিল্পে বাস্তবের অসুন্দর দিকগুলি ক্রমশই সযত্ন-বর্জিত। যে ধ্বনি সুরের সঙ্গতিতে বিঘ্ন ঘটায়, যে আবেগ ব্যঞ্জনার সুমিতিতে রসবস্তু হয়ে ওঠে না, যে বিক্ষোভ কল্পনার কাঠামোয় ভাঙন আনে—তাঁর রূপসাধনায় তারা অপাংক্তেয়। বাইরে থেকে তাদের তিনি সংযত করতে চেয়েছেন, ভিতর থেকে তাদের তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন নি।

কিন্তু সব জৈবরূপের মতই ব্যক্তি-অস্তিত্বেরও একটা সামগ্রিক সত্তা আছে। এই সমগ্রতায় যা ওতঃপ্রোত কোনো উপায়েই তাকে সম্পূর্ণভাবে উৎপাটিত করা যায় না। সে উৎপাটনের চেষ্টায় সমগ্রতারই বিনাশ ঘটে। আর যেহেতু মানুষের ক্ষেত্রে এই সমগ্রতাকে প্রতিষ্ঠিত, পুষ্ট এবং বিকাশের দিকে পরিচালিত করার বিশেষ মাধ্যম তার চৈতন্য, সে কারণে তার জৈব সত্তার সবকটি মূল ধারাই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তার চৈতন্যের উপরে নিয়ত ক্রিয়াশীল। সে ক্ষেত্রে হয় ব্যক্তিমানুষ এই সব ধারাকে চেতনার স্তরে স্বীকার করে নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে নিজের সামগ্রিক বিকাশে তাদের স্ফূর্তির ব্যবস্থা করে, নয়ত চেতনার স্তরে অস্বীকৃত ধারাগুলি প্রাক্‌চেতনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির সচেতন বিকাশ-সাধনাকে পদে পদে ব্যাহত করতে থাকে। বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের রুচি জৈব সত্তার এই সামগ্রিক সত্যকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারে নি। এ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা গোয়েটের তুলনায় অসম্পূর্ণ। তাঁর জীবন-শিল্পে

মেফিস্টোফেলিস ফাউস্টের মত স্বীকৃত আত্মীয় নয়। গোয়েটে যে "অন্ধকার আকুতি"কে (ডুঙ্কলেন ড্রাঙ্গে) বোঝবার জন্ত সারাজীবন সাধনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তা আমাদের মনুষ্যত্বের সাময়িক স্খলন মাত্র।

কিন্তু চেতনার স্তর থেকে নির্বাসন দিলেই কিছু এই সব প্রাক্‌চেতন জৈব বৃত্তি নিষ্ক্রিয় বা প্রশমিত হয়ে যায় না। তারা নানাভাবে নিজেদের প্রকাশ দাবি করে, ব্যবহারে কল্পনায় ক্রমাগতই অন্তর্বিরোধ আনে, আদর্শ বোধে একটু শিথিলসমাধিত্ব ঘটলেই চৈতন্যের ডিজাইনে ওলটপালট ঘটায়। আমার সন্দেহ হয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার মধ্যে তাঁর সযত্ন নিরুদ্ধ প্রাকচেতনিক সত্তা এমনিতর কোন অপ্রস্তুত প্রকাশ লাভ করেছে। তাঁর জীবনের ঐ বিশেষ অধ্যায়ে কেন এই বিস্ফোরণ ঘটল, যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তা বলা কঠিন। হয়ত ঐ বিশেষ বয়সে তাঁর অপ্রকাশ্য জীবনে এমন কোনো প্রবল আলোড়ন সংঘাত উপস্থিত হয়েছিল যাকে তিনি গোয়েটের মত করে ভাষাশ্রয়ী চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন। হয়ত বা যুদ্ধ, বিপ্লব এবং মানব সভ্যতার বিশ্বব্যাপী আত্যন্তিক সঙ্কটের শুভনাস্তিক সান্নিধ্যে সাময়িকভাবে তাঁর শ্রেয় বোধে শৈথিল্য এসেছিল। ছবির ভিতর দিয়ে তিনি কি সেই দুঃসহ বিক্ষোভের হাত থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন? তাঁর ছবির মধ্যে যে প্রবল প্রাণশক্তি আমাদের মনে আলোড়ন আনে, এই অন্ধ বিক্ষোভই কি তার উৎস? চৈতন্যের স্বীকারে আলোকিত নয় বলেই কি সে ছবির জগতে এত গুমোট অন্ধকার?

এ চিত্রচর্চার উৎস যে প্রাক্‌চেতনিক শুধু বাইরের লক্ষণগুলি থেকে তা অনুমান করা যায়। তাঁর রঙে আলোর আভাস কচিৎ। অনেক ক্ষেত্রেই তা এক ধরনের আঁধার সবুজের কাছ ঘেঁষা, যেন গভীর অরণ্যের নিভৃতে সূর্যস্পর্শ-হীন গুল্মের মত। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে স্যাভিস্ত্ বর্ণপ্রয়োগরীতির সঙ্গে বুঝি বা কিছু আত্মীয়তা আছে। কিন্তু এখানে রঙের মধ্যে মুগ্ধ বিস্ময়ের কোন আভাস নেই। বরং গুমোট অস্বস্তির ভাবটাই প্রবল। তাঁর ছবির রঙে বৈচিত্র্য সামান্য, বিন্যাসে পরিচ্ছন্নতার অভাব। পশু পাখীর প্রতীকী নক্সা একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। যেখানে মানুষের মুখাকৃতি আঁকার চেষ্টা করেছেন সেখানেও মনে হয় সে মানুষেরা যেন আলো-হাওয়া-আকাশের খবর রাখে না। তাদের বাইরের রেখাবিন্যাসে ছন্দ সঞ্চার কচিৎ, তাদের অন্তর্লোকে আনন্দের স্বাদ নেই। তাঁর কালিতে আঁকা রেখাচিত্রগুলিতে

প্রায়শই রেখার বাহুল্য আছে, বিন্যাস নেই; তাদের অধিকাংশেরই পশ্চাৎপটে রেখার অরণ্য, কখনো বা তা এগিয়ে এসে ছবিকেই গ্রাস করেছে। তাঁর অধিকাংশ ছবিই প্রাণশক্তিতে প্রবল; কিন্তু সে প্রাবল্য মননের দ্বারা সংস্কৃত নয়। তাই তার প্রকাশ শুধু অন্ধ বিক্ষোভে।

কল্পনা করতে কৌতূহল হয়, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর প্রাক্‌চেতনিক সত্তাকে অবদমিত না করে চৈতন্যের স্তরে তাকে শিল্পধ্যানের উপজীব্য করতে পারতেন, তাহলে তাঁর শিল্প সাধনা কোন ধারায় বিকশিত হোত। সে ক্ষেত্রে সম্ভবত চিত্রের মাধ্যমে নিস্ফল অধ্যবসায়ে অবক্তব্যকে আকার দেবার প্রয়োজন ঘটত না। হয়ত শব্দশিল্পে তাঁর দুর্লভ ক্ষমতার ফলে তিনি প্রাক্‌চেতনকে প্রতীকী প্রকাশ দেবার উপযোগী কোন অভিনব রচনারীতির উদ্ভব করতেন। ইংরেজী সাহিত্যে জয়েস তাঁর অসমাপ্ত এপিক উপন্যাস "ফিনেগানস ওয়েক-এ" যে অকল্পিতপূর্ব সাহিত্য রূপের অস্পষ্ট সূচনা করেছিলেন, বাংলা ভাষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সমৃদ্ধতর কল্পনায় তা কি কোন সার্থকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রকাশ পেত? হয়ত এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। মোটের উপর চেতনার স্তরে স্বীকৃত ধ্রুপদী বিবেকের নির্দেশ লঙ্ঘন করায় তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। চিত্রচর্চার ভিতর দিয়ে তিনি শুধু সাময়িকভাবে সে নির্দেশকে সসঙ্কোচে এড়িয়ে গিয়েছিলেন।[৬]

৬। প্রবন্ধের শেষ ষষ্ঠ টীকা।

১। এই প্রবন্ধটির প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। সে সময়ে অ্যালবাম আকারে পাওয়া যেত রবীন্দ্রনাথের "চিত্রলিপি"। তাছাড়া ১৯৩২ সালে রবীন্দ্র-চিত্রপ্রদর্শনীর একটি ক্যাটালগ বার করেছিলেন কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুল। ১৯৪৯ সালে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্তের "রবীন্দ্রচিত্রকলা" প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দিল্লীর ললিত কলা আকাদেমি *Drawings and Painting of Rabindranath Tagore* বার করেন। এসবথেকে তাঁর চিত্রকর্মের অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশের পরিচয় মেলে। আমি তাঁর মূল ছবির আংশিক সংগ্রহ দেখেছিলাম রবীন্দ্রভবনে।

২। পারীতে রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শনীর রিভিয়্যু লেখেন আঁরি বিদ্রু; সেটি প্রকাশিত হয় "রূপম্" পত্রিকায় ১৯৩০ সালে। তারপর থেকে তাঁর ছবি সম্পর্কে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়েছে। তাদের ভিতরে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য: স্টেলা ক্রামরিশ (বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি, ১৯৪১, এবং ললিতকলা কন্টেম্পোরারি, ১৯৬৪), বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (রূপলেখা, ১৯৫২), বিষ্ণু দে (বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি, ১৯৫৮), উইলিয়ম আর্চার, ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড মডার্ণ আর্ট (১৯৫৯) এবং মুল্ক্ রাজ আনন্দ (মার্গ, ১৯৬১)

৩। "তোমাদের বলি, কেমন করে আমি আঁকা শুরু করলুম। কবিতা লিখতে কাটাকুটি করতুম, সেই কাটাকুটিগুলো যেন রূপ নিতে চাইতো, তারা হতে চাইতো, জন্ম নিতে চাইতো। তাদের সে দাবী আমি অগ্রাহ্য করতে পারতুম না। প'ড়ে থাকত লেখা, সেই কাটাকুটিগুলোকে রূপ দিতুম, পারতুম না তাদের ফেলে দিতে, রাখতে। এই ভাবে আমার ছবি শুরু।"

৪। ১৯২৫-২৬ থেকে ১৯৩৭-৩৮ এই বছর বারোর মধ্যে তিনি তাঁর বেশীর ভাগ ছবি আঁকেন। নেহাৎ কম ছবি আঁকেননি, প্রায় হাজার তিনেক হবে। নন্দলাল বসু লিখেছেন: "প্রায় দশ-বারো বছরের মধ্যেই যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন, তার সংখ্যা গত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলাদেশের সমস্ত নামকরা চিত্রশিল্পীরা মিলে যত ছবি এঁকেছেন তার চেয়ে বেশী।" তাঁর বহুসংখ্যক ছবির মধ্যে ১৫০০ এর বেশী ছবি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে] (প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।)

৫। দ্রষ্টব্য: **A. K. Coomaraswamy, The transformation of Nature in Art.** সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের **Fundamentals of Indian Art** প্রবন্ধাবলীতেও এসম্পর্কে মূল্যবান বিচার আছে।

৬। আমার অনুমান রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা এবং তাঁর ছবির যে বিশিষ্টতার উল্লেখ করেছি তার সঙ্গে তাঁর জীবনের দুটি প্রধান অভিজ্ঞতার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। তাঁর যখন তেইশ বছর বয়স তখন কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন (১৮৮৪); এবং এই মৃত্যু ভালবাসা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার উপরে গভীর প্রভাব ফেলে। চৈতন্যের স্তরে কামনার সুচেষ্টিত অবদমন সম্ভবত এই ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু নতুন বৌঠানকে তিনি কোনোদিনই ভুলতে পারেন নি। ১৯২৪ সালে আর্জেন্টিনাতে অসুস্থ অবস্থায় ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে—তাঁর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন "অনুরাগের আগুন"। এই আগুনেই কি দীর্ঘদিনের টাবু কিছুটা পুড়েছিল? প্রাণের যে "মূক ডাক" ভাষায় এবং ব্যবহারে তবুও প্রকাশ করা গেল না তারি তাড়না থেকেই কি ছবিদের জন্ম? তাঁর ছবির জগতের এক অংশ কি নতুন বৌঠানের আত্মহত্যা-জাত অন্ধকার পাপবোধ, এবং অন্য অংশ বিজয়ার ভাষাহীন ভালবাসা?

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক মন

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর গত তিন দশকের মধ্যে বাংলাদেশে পঁচিশে বৈশাখের পূজা-অনুষ্ঠান আড়ম্বরে এবং সংখ্যাধিক্যে দুর্গাপূজাকেও প্রায় হার মানাতে বসেছে। কলকাতায় তো কথাই নেই—এখানে পার্কে, মাঠে, অলিগলিতে "সর্বজনীন" রবীন্দ্রোৎসবের ঘটা। সম্প্রতি মফস্বলেও এই রৌদ্রদগ্ধ এবং লবণাক্ত মাসের বিরূপতাকে অগ্রাহ্য করে উৎসাহী নাগরিকরা নাচগান-থিয়েটারের মারফত কবির জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে অতিশয় ব্যস্ত। প্রাচীন অথবা অর্বাচীন কোনও পত্র-পত্রিকার পক্ষেই এ উপলক্ষে বিশেষ রবীন্দ্রসংখ্যা বার না করে উপায় নেই। ফলে রবীন্দ্রপূজায় যাঁরা সনদপ্রাপ্ত পুরোহিত (তাঁদের মধ্যে কেউ-বা বক্তা, কেউ-বা লেখক, কেউ হয়তো অভিনেতা কি গাইয়ে, অর্থাৎ উদ্যোক্তাদের ভাষায় "আর্টিস্ট"), তাঁদের বাজার সম্প্রতি সরগরম।

এ থেকে মনে হতে পারে যে বাংলাদেশের "জনগণ"-এর উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গত তিন দশক ধরে বুঝি-বা বেড়ে চলেছে। কিন্তু শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে কোনও ব্যক্তির প্রতিকৃতিতে মালা ঝোলানো আর তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার উত্তরাধিকারে নিজেকে সমৃদ্ধ করা ঠিক এক ব্যাপার নয়। বুদ্ধদেব তাঁর মৃত্যুকালে সমাগত বিমর্ষ শিষ্য-প্রশিষ্যদের শেষবারের মত স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রকৃত বৌদ্ধ তাঁকেই বলা যায় যিনি নিজের অন্তর্নিহিত অগ্নিশিখার আলোকে পথ চলতে সক্ষম, তিনি পথনির্দেশের জন্য অন্যের উপরে নির্ভর করেন না।[১] প্রকৃত বৌদ্ধের পক্ষে বুদ্ধকে উপাসনা করা শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, তার দ্বারা বুদ্ধের আজীবন প্রয়াসকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করা হয়। এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও বুদ্ধভক্তদের একটি প্রধান অংশ উক্ত নির্বাণসাধক জ্ঞানীপুরুষকে দেবতায় পর্যবসিত করতে দ্বিধা বোধ করেননি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের দেশে এই একই ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে।

আমার এই অভিযোগের মধ্যে যে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই, রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে রবীন্দ্রজন্মোৎসব অনুষ্ঠানগুলির একটু তুলনা করলেই সে

১। প্রবন্ধের শেষে প্রথম টীকা।

বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। যিনি সারাজীবন সৌন্দর্য এবং শুচিতার সাধনা করে গেলেন, তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা নিজেদের যে রুচিকে প্রকটিত করেন তাতে সুষমা দূরের কথা, পরিচ্ছন্নতাবোধের আভাস পর্যন্ত দুর্লভ। বিরাট প্যাণ্ডালের নীচে হৈহল্লোড়লোভী জনতার ঘর্মাক্ত সমাবেশ; "তারকাদের" ভাড়া করার জন্য বেহায়া প্রতিযোগিতা; লাউডস্পীকারের প্রচণ্ড উচ্চনাদ; মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, নিদেনপক্ষে লক্ষ্মীমন্ত ব্যবসায়ী অথবা শক্তিমান দলীয় মাতব্বরদের (যাঁরা জীবনেও 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র পাতা উলটে দেখেছেন কিনা সন্দেহ) পৃষ্ঠপোষণা পাবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম; অনুষ্ঠানের বিবরণ (সম্ভব হলে ছবিসমেত) কাগজে বার করার জন্য দৈনিক সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের পায়ে অপর্যাপ্ত তৈলনিষেক—রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে অপমান করার জন্য এর চাইতে বেশী আর কি ব্যবস্থা করা চলত, তা তো আমি জানি নে। যে মহাশিল্পীর অমিত কল্পনা প্রায় দীর্ঘ ত্রিপাদশতাব্দী কাল ধরে নিত্য নূতন রূপের জন্ম দিয়েছিল, তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে ভক্তরা বছরের পর বছর গতানুগতিক একই কর্মসূচী অনুসরণ করা ছাড়া উপায় খুঁজে পান না। যিনি সত্যনিষ্ঠার প্রয়োজনে গান্ধীজির বিজ্ঞানবিমুখ আদর্শবাদের প্রখর সমালোচনা করে একদা এদেশে প্রচুর অপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে অথবা লিখতে গেলে এখনকার ব্যাখ্যাতারা শুরু থেকেই ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠেন। যিনি এদেশে বিশ্ব-নাগরিকতার প্রধান প্রবর্তা এবং প্রতিভূ, তাঁকে আমরা হ্রস্বকায়, স্বাজাত্যভিমানী, কর্তাভজা, উচ্ছ্বাসপ্রবণ বাঙালীর ছাঁচে ফেলে নিজেদের বাঙালীত্ব নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। "স্ত্রীর পত্র" থেকে "নামঞ্জুর গল্প" এবং "ল্যাবরেটরী"র প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লেখককে আমরা ঘষেমেজে মসৃণ ডিম্বাকৃতি শালগ্রামশিলায় রূপান্তরিত করে নিয়েছি। এখন বুঝি-বা চরণামৃত পানে মোক্ষপ্রাপ্তিই আমাদের একমাত্র কাম্য।

॥ দুই ॥

ফলত বাঙালী জনসাধারণের উপরে গত তিন দশকে রাবীন্দ্রিক সাধনার বিশেষ প্রভাব পড়েছে, এ কথা কোন ক্রমেই মানা চলে না। বরং উলটে বলা যায় যে তাঁকে নিয়ে বুথবদ্ধ অনুষ্ঠানের ঘটা যত বাড়ছে, বাঙালী ততই তাঁর

মানসলোকের সান্নিধ্য থেকে চ্যুত হচ্ছে। এতে রবীন্দ্রনাথের অবশ্য কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবার আশঙ্কা নেই। অতীতের আরও অনেক মহাপ্রতিভার মত তাঁকেও হয়তো অন্যদেশ এবং অন্যকালের অম্বিষ্ট পাঠকপাঠিকারা নতুন করে আবিষ্কার করবেন।[২] লোকসান একান্তভাবেই আমাদের। জার্মানী যেমন গোয়েটের উত্তরাধিকারকে বিসর্জন দিয়ে শেষ পর্যন্ত হিট্‌লার নামে এক অর্ধোন্মাদের প্ররোচনায় সার্বিক বিনাশের পথ অবলম্বন করেছিল, আমাদের ক্ষেত্রেও তেমন আশঙ্কা হয়তো একেবারে কষ্ট-কল্পনা নয়। অন্তত সম্প্রতি কালে আমাদের যে রেকর্ড, তা তো এই ধরণের ভয়াবহ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত করে।

যা-ই হোক বাংলার জনগণের উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ব্যর্থতা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আমার ধারণা যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রোত্তর যুগের যাঁরা প্রধান মনীষী এবং শিল্পী, তাঁদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান গত ত্রিংশ বছরে অনেক বেশী বিস্তৃত এবং সে কারণে প্রকট হয়ে উঠেছে। হুজুগবাজ রবীন্দ্রপূজারীদের বিরুদ্ধে যে তামসিক স্থুলতা এবং মূঢ়তার অভিযোগ আমি করেছি, এঁদের সম্পর্কে তেমন কোন অভিযোগ অকল্পনীয়। এঁদের মধ্যে অনেকে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রতিভার দিক থেকে অবশ্য এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা চলে না। তা সত্ত্বেও এঁরা প্রত্যেকেই শক্তিমান এবং স্বাতন্ত্র্য সমন্বিত লেখক ও ভাবুক। এঁদের রচনায় মধ্যে যে মনোজগৎ প্রকাশ লাভ করেছে তা একান্তভাবে আধুনিক, এবং সে-মনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। সত্য বটে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব উদ্ভাবনা এবং জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের দ্বারা বাংলা ভাষায় যে সমৃদ্ধি-সাধন করে গেছেন, তার উপস্থিতি ব্যতিরেকে এঁদের পক্ষে আত্মপ্রকাশ অসম্ভব হত। কিন্তু সেই ভাষার মাধ্যমে এঁরা যে ভাব এবং ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র মধ্যে তার সূত্র মেলে না।

রবীন্দ্রনাথ দুটি সম্পন্ন ঐতিহ্যের ভিতরে মিলন ঘটিয়েছিলেন। তার প্রথমটি হল ভারতবর্ষের ঔপনিষদিক ঐতিহ্য। ঋষিদের মত তিনিও অনুভব করেছিলেন যে এই বিশ্বজগৎ কোন কল্যাণময় উপস্থিতির বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যে সংসারের সমস্ত দুঃখ, সংঘাত, ভাঙাচোরার অন্তরালে এমন কোন

২। প্রবন্ধের শেষে দ্বিতীয় টীকা।

চৈতন্যময় পুরুষ বর্তমান যিনি সব কিছুতেই নিয়ত সুষমা এবং সংগতি দান করছেন। সুতরাং যে ফুল না ফুটে ঝরে যায় সে-ও নাকি ব্যর্থ নয়; যে মানুষ অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে অকালে মারা গেল, তার জীবনেও নাকি কোন মহৎ উদ্দেশ্য গোপনে সার্থকতা লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় বিশ্বাসের যাথার্থ্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। তবে যাঁরা আন্তরিকভাবে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে একদিকে যেমন জগৎকে মধুময় বলে কল্পনা করা সহজ, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধর্মরূপে কল্পিত এই সুমিতি এবং কল্যাণবোধকে ব্যক্তির জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলায় চেষ্টা স্বাভাবিক। তাঁদের এই বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি বিশেষ মজবুত নয় বটে; তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে এই বিশ্বাস অনেকের মনে প্রকৃতি-প্রেম, করুণা, ধৈর্য, প্রীতি, সৌন্দর্যচেতনা, নির্ভীকতা ইত্যাদি নানা মানবীয় সদ্গুণের বিকাশে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের গান এবং কবিতার একটা বড় অংশ সুস্পষ্টভাবে এই বিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং বহু প্রবন্ধের মধ্যেও এই ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের ফলপ্রসূ প্রভাব লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রপ্রতিভার ভিতরে অপর যে মহৎ ঐতিহ্যের স্বীকরণ ঘটেছিল সেটি হ'ল রনেসাঁস-উত্তর পশ্চিমের মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য। মানবতন্ত্রীরা জড়জগতের পিছনে কোন ঐশ্বরিক অস্তিত্বের কল্পনা ছাড়াই একদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরভাবে কৌতূহলী, এবং অপরদিকে মনুষ্যত্বের বিচিত্র সম্ভাবনা আবিষ্কার করে উৎফুল্ল। এঁরা প্রতিটি মানুষের অনন্যতা এবং স্বতঃসিদ্ধ মূল্যে বিশ্বাসী। এঁদের উপলব্ধিতে মানুষমাত্রেই সৃজনক্ষম এবং সেকারণে আপন ভাগ্যবিধাতা; এবং মানুষের মধ্যে যে বিচারশক্তি বর্তমান তারই বিকাশের দ্বারা সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর, উচিত-অনুচিতের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এঁদের কাম্য; এবং তার জন্য এঁরা যেমন একদিকে ব্যক্তির চরিত্রে নানা পরস্পরবিরোধী বৃত্তির মধ্যে সৌষম্য অর্জনে উদ্যোগী, অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তির ভাবনা, কামনা এবং ব্যবহারের মধ্যে সহযোগিতা এবং সহনশীলতার ভিত্তিতে বহুবাচনিক ঐক্য রচনায় সচেষ্ট। এই ব্যক্তিজীবনের সুষমা এবং সর্বমানবীয় সঙ্গতি গড়ে তোলার জন্য এঁদের প্রধান নির্ভর হল শিক্ষা। শিক্ষার ফলে মানুষের যুক্তি-সামর্থ্য বিকশিত হয়, সৃষ্টির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, অনুভূতি সূক্ষ্মতা লাভ করে, বিবেকবোধ বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, হৃদয়বৃত্তি পরিপুষ্ট এবং মার্জিত হয়। এই

মানবতন্ত্রী জীবনদর্শন রনেসাঁসের সময়ে পশ্চিম ইয়োরোপের বহু মনীষীর জীবনে, চিন্তায় এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে, এবং পরবর্তীকালে মুখ্যত এরই প্রেরণায় প্রথমে ইয়োরোপে এবং পরে অন্যান্য দেশেও উদারতন্ত্রী সমাজসংস্কৃতি বিকশিত হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষার মারফত এই জীবনদর্শনের সঙ্গে বাঙ্গালী-ভাবুকদের পরিচয় ঘটে এবং তার ফলে এদেশে মনস্বিতা, কল্পনা এবং বিবেকবোধের নৈসর্গিক পুনরুন্মেষ দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এই দুই ধারা পরস্পরে যুক্ত হয়েছিল। তাঁর অধিকাংশ গানে এবং দার্শনিক রচনার মধ্যে ঔপনিষদিক ধারার প্রভাব বেশী স্পষ্ট। তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক, সামাজিক প্রবন্ধাদিতে রনেসাঁসী মানবতন্ত্রের বীজ আশ্চর্য ফসলে সার্থকতা লাভ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনকালের শেষ পঁচিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানব ইতিহাসে এক নৈসর্গিক বিপর্যয় ঘটে। একদিকে দুই মহাযুদ্ধ এবং বিভিন্ন দেশে সার্বিক ডিক্টেটরশিপের অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে মানবচরিত্রের আত্মঘাতী-প্রবণতা বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান চিন্তাশীল মানুষদের মনেও শুভনাস্তিক্যের ভাবকে প্রবল করে তোলে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর নানা দেশে শিল্প, সাহিত্য অথবা দর্শনের ক্ষেত্রে যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের লেখায় এই বিপর্যয়ের চেতনা প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বজগৎ কোন মঙ্গলময় ঈশ্বরের দ্বারা সৃজিত এবং পরিচালিত, এ কথায় বিশ্বাস রাখেন এমন ভাবুক অথবা লেখক আজকের দিনে নিতান্ত দুর্লভ। অপরপক্ষে সুষমার সাধনা যে মানবপ্রকৃতির সামান্য লক্ষণ, নিজের চেষ্টায় নিজেকে গড়ে তোলা যে প্রতিটি মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত, লুবিয়াঙ্কা, বেল্‌সেন কিংবা হিরোশিমার অভিজ্ঞতার পর এবংবিধ মানবতন্ত্রী প্রত্যয়ে অবিচলিত থাকা আজ সুকঠিন। ফলত আধুনিক মন উপনিষদ এবং রনেসাঁসী মানবতন্ত্র—উভয় ঐতিহ্য থেকেই বিযুক্ত। এবং এই আর্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, নৈরাশ্যবাদী মনের প্রভাব আজ শুধু পশ্চিমে আবদ্ধ নেই, বাংলা দেশের নব্য ভাবুক এবং লেখকদের উপরেও তার প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

॥ তিন ॥

ফলে যদিও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এখনও পুরো পঁয়ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয় নি, তবু তাঁর মানসলোকের সঙ্গে আমাদের যোগ আজ অত্যন্ত দুর্বল। আমরা যারা দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে বড় হয়েছি, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ

গোয়েটের মতই দূরলোকের অনাত্মীয় নক্ষত্র। বলতে কি, গোয়েটের চাইতেও তিনি দূরবর্তী। কারণ আউফ্ ক্লেরুঙ্-এর ওই মহাকবির কল্পনায় আমাদের আর্তির কিছুটা অন্তত আভাস দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বোদ্‌লেয়র এবং ডস্টয়েভস্কি থেকে শুরু করে বর্তমান কালে কাফ্‌কা, এলিয়ট, সার্ত্‌র্ প্রমুখ ভাবুক সাহিত্যিকদের রচনায় রনেসাঁসী সংস্কৃতির যে আত্মক্ষয়-চেতনা ক্রমে প্রখর হয়ে উঠেছে, "ফাউস্ট" মহাকাব্যে তার নিগূঢ় ইঙ্গিত চোখে পড়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গোয়েটের মেফিস্টোফেলিস-তত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন না। তাঁর শেষ বয়সের কোন কোন সমসাময়িক লেখককে তিনি সকৌতুক স্নেহে স্বাগত জানিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের অন্তর্মুখী সাধনার স্বরূপটি তিনি অনুমান করতে পারেন নি। আসলে আন্তঃসামরিক আধুনিকদের সঙ্গে তাঁর শুধু বয়সের নয়, মেজাজেরও অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল। এঁদের মধ্যে যাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচয়-সম্বন্ধের সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরাও এ ব্যবধান পেরিয়ে তাঁর ঐতিহ্যের অংশভাক্ হতে পারেন নি। আধুনিকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তাই মহাকাব্যের নায়কের মতই অনাত্মীয়, প্রায় গৌরীশঙ্কর চূড়ার মতই অনারোহ। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মাথা নত হয়, কিন্তু মন সঙ্গ পায় না।

শুধু একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সে হল চিত্রকলার মাধ্যমে তাঁর শেষ বয়সের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। সত্তার অস্বীকৃত অন্ধকারলোক থেকে এ ছবিগুলির জন্ম। এদের জগতের সঙ্গে আধুনিক মেজাজের যে আত্মীয়তা আছে, রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন রচনার সঙ্গেই সে আত্মীয়তা নেই। এখানে মহাকবি অজ্ঞাতে স্বধর্মদ্রোহিতা করেছেন। ফলে এখানে শুধু যে তাঁর শিল্পের হাতই অপটু তা নয়, তাঁর কল্পনায় ধ্যানের ঐকান্তিকতাও অবর্তমান। অথচ এদের মধ্যে এমন একটা বিক্ষুব্ধ প্রাণ-শক্তি আছে যে এদের কিছুতেই অবহেলা করা যায় না। কিন্তু কবি তাঁর এই বিক্ষোভকে ভাষার আত্মচেতন স্তরে পরিণতি পেতে দিলেন না। যদি দিতেন, অন্তত যদি চেষ্টাও করতেন, তবে হয়তো তাঁর পরিপূর্ণতা আর আমাদের আর্তির মাঝখানে মনজানাজানির এক সেতুবন্ধ গড়ে উঠত। মধ্যযুগ আর রনেসাঁসের মাঝখানে সেই সেতুবন্ধ গড়েছিলেন দান্তে, রনেসাঁস আর আমাদের কালের মাঝখানে সেতুর কিছুটা গড়ে গেছেন গোয়েটে। তাঁরা শুধু আপনকালের কবি নন, এমন কি শুধু নিত্যকালের কবি নন—তাঁরা যুগান্তরের কবি। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহাপ্রতিভাবান কবি হয়েও "ডিভাইন কমেডি" বা "ফাউস্ট"-এর মত

কোন মহাকাব্য রচনা করেন নি। সব সৎকাব্যের মত তাঁর কাব্যেও নিত্যকালের আবেদন আছে। কিন্তু আমাদের এই বিশেষকালের রূপটি তাঁর সৃষ্টিতে ধরা পড়ল না।

। চার ।

আর ঠিক এই কারণেই এমন অতুল ঐশ্বর্য, অমিত উদ্ভাবনাশক্তি, দুর্লভ চিৎপ্রকর্ষ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আজ অগমদেশের বার্তাবহ আগন্তুক। তাঁর সৃষ্টিকে আমরা জানি, কিন্তু স্রষ্টা শেষ পর্যন্ত রয়ে গেলেন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। জীবনের যে-সব অন্ধকার রাতে আত্মোদঘাটনের আতঙ্কিত নীল বিদ্যুতে মুখশ্রীর অন্তরালকায় সযত্ন-আচ্ছাদিত আত্মা আর্ত বিস্ফোরণে প্রকাশিত হয়, তাঁর জীবনে তেমনতর রাত কি কখনো আসে নি? নিটোল, নিটোল, আশ্চর্য অক্ষত তাঁর কল্পনার কৌমার্য, হাইনের ভাষায় বলতে হয়: So hold und schoen und rein (এত মধুর আর সুন্দর আর নিষ্কলঙ্ক)। হয়তো সব সময়েই মধুর নয়, কিন্তু সব সময়েই সুন্দর, সব সময়েই নিষ্কলঙ্ক। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁকে জীবনশিল্পী বলেছেন। আমরাও সেকথা মানি। ধ্রুপদী, প্রায় নৈর্ব্যক্তিক সে শিল্প, কোথাও সুমিতির সীমা লঙ্ঘন করে না। অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে ব্রহ্মাস্বাদ বলেছে, এ শতাব্দীর কোনও কবির সৃষ্টিতে যদি তার সন্ধান করতে হয় তবে সে কবি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু আজকের দিনের যাঁরা অনুভূতিশীল লেখক এবং পাঠক, যাঁদের মন দুই যুদ্ধের মাঝখানে গড়ে উঠেছে, তাঁদের জীবনে ব্রহ্মের কি আর কোন অর্থ আছে? আমি শুধু ধর্মে অবিশ্বাসের কথা বলছি না—এ নাস্তিক্য সর্বগ্রাসী। এ-যুগের পরিণত মনে ব্রহ্মপ্রত্যয় নিতান্তই প্রাক্তন স্মৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের যাঁরা নব্য ভাবুক তাঁরা শুধু স্বর্গ-সান্ত্বনা থেকেই বঞ্চিত নন; কোন মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে শাশ্বত, চিরন্তন, সর্বমানবীয় এসব বিশেষণ প্রয়োগে পর্যন্ত তাঁদের অনীহা আত্যন্তিক। এক কথায় এ যুগের বিদগ্ধ-সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী আপেক্ষিকতানির্ভর। অভ্যাসাশ্রয়ী মনের পক্ষে এই অনতিক্রম্য আপেক্ষিকতা-বোধ যে কী দুঃসহ যন্ত্রণা তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। যে সব নৈতিক নির্দেশকে বিনা বিতর্কে শ্রেয় বলে জেনে মানুষের বিবেক এতকাল আশ্রয় পেয়ে এসেছে, আজ নৃতত্ত্ব, তুলনা-মূলক সমাজতত্ত্ব

এবং সব থেকে বেশী মনোবিকলনতত্ত্বের আঘাতে শিক্ষিত জীবনে তারা শিথিলমূল। ফলে এ যুগের চিন্তায়, ব্যবহারে, শিল্পকল্পনায় যে ব্যাপক শুভনাস্তিক্য দেখা দিয়েছে, তাতে দুঃখ পেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে কার্তেসীয় আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তির উপরে উদারতন্ত্রের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, আজ সেখানে পর্যন্ত ভাঙন প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা আতঙ্কে নিজেদের প্রশ্ন করছি, আত্মার ঐক্যও কি ব্রহ্মকল্পনার মত একটা ব্যবহারিক অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়? নবলব্ধ জ্ঞানের আগুনে পুড়ে আমাদের আর কী অবশিষ্ট রইল? একরাশ প্রাণহীন যন্ত্রের স্তূপ, নির্বোধদের জন্য দীর্ঘদিনের সঞ্চিত মিথ্যা সংস্কার আর অভ্যাস, সকলের জন্য কতকগুলি আদিম অন্ধ বৃত্তি—আর প্রাজ্ঞজনের জন্য নিশ্চিতির স্বর্গ থেকে নির্বাসনের নিষ্ঠুর চেতনা?

এই-যে বিশিষ্টভাবে সমকালীন মেজাজ, এরই প্রতিনিধি এলিয়টের সুইনি আর টাইরেসিয়াস, হাক্সলির থিয়োডোর গম্বিল আর সার্ত্র্-এর অধ্যাপক ম্যাথিউ। এরই পূর্বাভাস বোদলেয়ারের কাব্যে ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে। রিল্কের পুতুলেরা এরই অন্ধকার গর্ভের ভ্রূণ। প্রুস্ত কাফ্কা এবং জয়েসের উপন্যাস বিভিন্ন দিক থেকে এই মেজাজেরই কাহিনী। প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক উপলব্ধি অথবা পশ্চিম ইয়োরোপের রনেসাঁস কিংবা আউফ্ক্লেরুঙের ঐতিহ্যে একে বোঝা যাবে না। এখানে এক আশ্চর্য যুগের সমাপ্তি। হয়তো-বা (তার বেশী কি বলতে পারি!) অভিনব কোন ভবিষ্যৎ যুগের ভূমিকা।

। পাঁচ ।

এই রূপান্তরের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে আলোড়িত করে নি। তার মানে অবশ্য এ নয় যে তাঁর মনে কখনও সন্দেহ আসে নি অথবা অনিশ্চিতি কখনও তাঁর চেতনায় ছায়া ফেলে নি। কিন্তু তাঁর মনের প্রত্যয়ী সমগ্রতাকে তিনি সব সংশয় শঙ্কার ঊর্ধ্বে রাখতে পেরেছিলেন। শ্রীমতী বোভোয়া যাকে বলেছেন "অস্তিত্বের মৌলিক অস্পষ্টতা",[৩] যার ফলে নাকি আমাদের কোনও জ্ঞান, বিচার, সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক যাথার্থ্যের বেশী কিছু দাবি করতে পারে না, তার খবর তিনি রাখতেন না। ব্রহ্মসত্য এবং বিশ্বমানবিকতায় তাঁর অটুট আস্থা ছিল। সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-কুৎসিতের

৩। প্রবন্ধের শেষে তৃতীয় টীকা।

সুস্পষ্ট পার্থক্যে তিনি বিশ্বাস করতেন। এ পার্থক্যবোধ তাঁর কাব্যের আলো-আঁধারিতেও এতটুকু শিথিলমূল হয় নি। এই নিঃসঙ্কোচ আত্মপ্রত্যয় ছিল বলেই তাঁর প্রকাশ প্রচারের মাত্রাচ্যুতি থেকে মুক্ত, তাঁর লিরিক-প্রেরণা বিতর্কবিড়ম্বিত নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ড্যানিশ দার্শনিক কীর্কেগার্ড্ যে অসমাধেয় বিকল্প-সমস্যাকে সব দর্শনের মূল উপজীব্য বলে উপস্থিত করেছিলেন, যার সুকঠিন চেতনার পীড়াতে তাঁর জন্মের প্রায় একশো বছর পরে আন্তঃসাময়িক মনের বয়ঃসন্ধি ঘটেছে, যার ছাপ বিশিষ্টভাবে এ যুগের সমস্ত চিন্তায়, শিল্পে, সমাজ-জীবনে—রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের সব রচনায় আঁতিপাঁতি করে খুঁজলেও তার আভাস মিলবে না। রিল্কের জর্নালের পাতায় পাতায় যে গ্লানির স্বাক্ষর, কাফ্কার উপন্যাসে যে নিরাশ্বাস আতঙ্কের কাহিনী, জয়েস্-হাক্স্লীর নায়কদের যে অনতিক্রম্য নৈঃসঙ্গ্য—আশ্চর্য, এঁদের সমসাময়িক মহাকবির কল্পনাতে তার সামান্যতম ছায়াটুকুও পড়ে নি।

এ রূপান্তর ইয়োরোপের সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে এর সূচনা ঘটেছে আরও বছর দশেক পরে—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতির কবিতায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় এঁদের শিল্পপ্রতিভা অনেক সীমাবদ্ধ; তবু নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন যে এঁদের জগৎ তাঁর জগৎ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকদের মধ্যে অনেকের প্রেরণা এখন অবসিত—হয়তো বা যুগান্তরের মনকে শিল্পে প্রকাশ করার সামর্থ্য তাঁদের ছিল না বলেই এত দ্রুত তাঁরা ফুরিয়ে গেলেন। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল আমরা খেয়েছি, প্রাক্তনস্বর্গের নিষ্পাপ স্থিতিতে আর আমাদের ফেরার উপায় নেই। যাঁরা বুদ্ধিমান এবং নিজেদের অসামর্থ্য বিষয়ে সচেতন, তাঁরা অনেকে মৌন অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউবা মার্ক্সবাদের আস্তিক্য আঁকড়ে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সে আস্তিক্যে আস্ফালন বেশী, প্রত্যয়ের সুমিতি এবং লাবণ্য ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

হয়তো তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথও এই রূপান্তরকে অস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর এই যুগের কবিতায় মাঝে মাঝে একটা নিরাভরণ কাঠিন্য অপ্রত্যাশিতভাবে মনে ঘা মারে। কখন কখন কোন কোন গল্পে এবং প্রবন্ধেও একটা অনভ্যস্ত সংশয়ের ছায়া পড়েছে। আমার বিশ্বাস, এই অস্পষ্ট অনুভূতির সঙ্গে তাঁর কিম্ভূতকিমাকার স্কেচ এবং ছবিগুলির যোগ

আছে। কিন্তু কবি তাঁর এই অনুভূতিকে কখনও সুস্পষ্ট চেতনার স্তরে তুলে তার মুখোমুখি হলেন না। হয়তো সেটা তাঁর প্রাজ্ঞতারই পরিচয়। অনভ্যস্ত অনুভূতির অনুসরণ করে সাধ্যের সীমানা তিনি লঙ্ঘন করেন নি। উত্তর-পুরুষের দুঃসহ আত্মগ্লানির হাত থেকে তিনি তাঁর কল্পনাকে মুক্ত রেখেছিলেন। আর নিজের সামর্থ্যের সুমিতি মেনে যে চলতে পারে, সেই তো প্রাজ্ঞ।

॥ ছয় ॥

প্রশ্ন ওঠে, তবে কি আধুনিক পাঠকপাঠিকার কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদন ক্রমে আরও ক্ষীণ হয়ে আসবে? বঙ্গদেশীয় স্থূলবুদ্ধি উপাসকগোষ্ঠী তাঁর লেখা না পড়ে, অথবা না বুঝে, দলবেঁধে হৈচৈ করার প্রয়োজনে তাঁর স্মৃতিকে কাজে লাগাতে থাকবে? আর অনুভূতিশীল নব্য লেখক এবং পাঠক তাঁর রচনাবলীর মধ্যে নিজেদের সুগভীর নৈরাশ্যের আভাসমাত্র না খুঁজে পেয়ে অন্যত্র সংবেদনার সন্ধান করবে? আমার অন্তত তা মনে হয় না। কেন মনে হয় না, তার দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ করে এই আলোচনায় আপাতত যতি টানব।

প্রথমত, প্রত্যয়গত মিল ছাড়াও সাহিত্যের আবেদনের আরও অনেকগুলি সূত্র আছে। টমাস আক্যীনাসের দর্শন আমার বিচারে গ্রহণযোগ্য না ঠেকলেও দান্তের মহাকাব্য আমার বিশেষ প্রিয়। বৈষ্ণবসাধনা আমাকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট করে না, কিন্তু চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর আমি গভীর অনুরাগী। কম্যুনিজ্‌মে্‌ আত্যন্তিক অনাস্থা সত্ত্বেও ব্রেথ্‌ট্‌-এর নাটক[৪] এবং এলুয়ার্‌-এর কবিতা আমার বিশেষ ভাল লাগে। ছন্দ, শব্দচিত্র, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা, এমন কি কাহিনী এবং কল্পিত পাত্রপাত্রীর যে আবেদন, তা তো লেখক এবং পাঠকের মধ্যে প্রত্যয়গত ঐক্যের ওপরে নির্ভর করে না। তা ছাড়া বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারীভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে সমস্ত স্থায়ীভাব রস উৎপন্ন করে তারা সর্বপ্রাণিসাধারণ। জগতের কেন্দ্রে কোন কল্যাণময় পুরুষের অস্তিত্ব থাক্‌ বা না থাক্‌, সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায়ের কোন স্থায়ী মানদণ্ড আবিষ্কৃত হোক বা না হোক, ভালবাসা, করুণা, ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, বিস্ময় ইত্যাদি চিত্তবৃত্তি আমাদের সকলের মনেই আবেগ সঞ্চার করে থাকে। এদের

৪। প্রবন্ধের শেষে চতুর্থ টীকা।

অবলম্বন করে সাহিত্যে রসের সঞ্চার হয়। এখন সাহিত্যের এইসব সম্পদে রবীন্দ্র-রচনাবলী অসামান্য রকমে সমৃদ্ধ; শুধু বাংলায় কেন অন্য ভাষাতেও তাঁর তুল্য সম্পদ কল্পনা দুর্লভ। ফলে যে কারণে আমরা অন্য দেশ-কালের ভিন্ন ঐতিহ্যাবলম্বী শক্তিমান সাহিত্যিকের রচনা উপভোগ করি, সেই কারণেই রাবীন্দ্রিক জীবন-দর্শনে অংশভাক্ না হয়েও তাঁর শিল্পসৃষ্টি থেকে আনন্দের স্বাদ পাওয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত। সাহিত্যের বোধ যদি পৃথিবী থেকে লোপ না পায়, তা হলে মেজাজের গভীর পার্থক্য সত্বেও রবীন্দ্রনাথের বিদগ্ধ সম্ভোক্তা এদেশে এবং অন্য দেশে চিরদিন জুটবে।

দ্বিতীয়ত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে-শূন্যতাকে মানুষ শেষ কথা বলে বেশীদিন মেনে নিতে পারে না। আমাদের যুগের নিরাশ্বাস, দ্বন্দ্ব বা গ্লানিকে পাশ কাটিয়ে নয়, তারই অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে আমরা অথবা আমাদের পরবর্তী কালের মানুষ নতুন করে আবার নিজের সৃজনসামর্থ্য আবিষ্কার করবে। বিশ্বজগতে অন্য কোথাও যদি অর্থের সন্ধান না মেলে, তবু মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং ব্যক্তির অপরোক্ষানুভূতির মধ্যে সেই সন্ধানের সমর্থন পাওয়া যাবে। এবং এ আশা যদি অসঙ্গত না হয়, তবে মানবীয় মূল্যবোধের সেই পুনরুজ্জীবনের কালে রবীন্দ্রনাথকে শুধু শিল্পীরূপে নয়, ভাবুক রূপেও আমরা আবার নতুন করে আবিষ্কার করব। তাঁর জীবনদর্শনের অনেকটাই হয়তো টিঁকবে না; কিন্তু যেটুকু টিঁকবে, আমার ধারণা, তার মূল্যও নিতান্ত অল্প নয়।

১। দ্রষ্টব্য: T. W. Rhys Davids, *Dialogues of the Buddha*, III, পৃ: ১০৮

২। আমার একটি ছাত্রী, এলিজাবেথ বাচ্‌কোভস্কি, কিছুকাল যাবৎ রবীন্দ্রনাথের উপরে গবেষণা করছেন। জন্মসূত্রে ইনি হাঙ্গেরিয়ান। বিভিন্ন সেমিনারে রবীন্দ্রনাথের কল্পজগৎ সম্পর্কে এঁর আলোচনা শুনে বিস্মিত হয়েছি। ইনি বিশেষ যত্ন-সহকারে বাংলা শিখেছেন। এঁর গবেষণার ফল প্রকাশিত হলে আমরা সকলেই লাভবান হব। এই ধরনের কাজ অন্যান্য দেশেও হচ্ছে।

৩। Simone de Beauvoir, *The Ethics of Ambiguity* (tr by Bernard Frechtman)।

৪। আমার "নায়কের মৃত্যু" গ্রন্থে ব্রেখট্‌-এর উপর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বাঙালি শিক্ষিত হিন্দু ও আধুনিকতা

। এক ।

যেহেতু রামমোহন রায় ভারতবর্ষে নব্যচিন্তার প্রথম প্রবক্তা, রবীন্দ্রনাথ এদেশের সবেধন নীলমণি নোবেল পুরস্কার-পাওয়া কবি, এবং রবিশঙ্কর ও সত্যজিৎ রায় বিদেশে সমকালীন ভারতীয় সংস্কৃতির সবচাইতে পরিচিত প্রতিনিধি, সেহেতু আধুনিকতার বঙ্গভূমির নির্ব্যূঢ় স্বত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত, মায় অর্ধশিক্ষিত, বাঙালি হিন্দুর মনে সন্দেহের ছায়ামাত্রও অবর্তমান। বিহারিরা নির্বোধ, পঞ্জাবিরা স্থূলবুদ্ধি, মরাঠিরা কর্কশ, মারওয়াড়ি ও গুজরাতিরা বানিয়া, এবং তামিলরা অতিনৈষ্ঠিক,—ফলত এই জম্বুদ্বীপে বাঙালিরাই একমাত্র প্রকৃত প্রগতির প্রবর্তক এবং পরিচালক।

শহুরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর এই নৈসর্গিক স্বকামের তুলনা সম্ভবত শুধু ফরাশিদের মধ্যেই মেলে। যদিও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি এবং সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালির জ্ঞান এমনকি কৌতূহলের চিহ্ন বড়ো একটা চোখে পড়ে না (বাঙালি হিন্দু ঐতিহাসিকদের লেখা পড়লে মনে হয় ভারতীয় রেনেসাঁসের অর্থ রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের কাহিনী[১]), তবু বাঙালির দৃঢ় বিশ্বাস, আধুনিকতার চর্চায় বাঙলাদেশ বাকি ভারতবর্ষের তুলনায় অন্তত পঞ্চাশ বছর এগিয়ে আছে। প্রমাণ বাঙলা কবিতা, বাঙলা রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্র, কলকাতার কফি হাউস এবং বামপন্থী রাজনীতি।

অথচ এই রঙিন অধ্যাস যে নিতান্তই সযত্নলালিত আত্মপ্রতারণার উপরে নির্ভরশীল, বিষয়মুখী প্রতিন্যাস নিয়ে বিচার করলে তা সহজেই ধরা পড়ে। তুরীয়ের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে ঐহিককে মুক্ত ক'রে তার স্বয়ংতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকার আধুনিকতার অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। শিক্ষিত বাঙালি নিজেকে আধুনিক ব'লে দাবি করলেও তার জীবনে এবং ইতিহাসে এই স্বীকৃতির চিহ্ন দুর্লভ। বাঙালি তার হিন্দুত্ব অথবা মুসলমানত্ব অতিক্রম ক'রে আজো মনুষ্যত্বের পরিজ্ঞান অর্জন করেনি। ফলে বাঙলাদেশ আজ হিন্দুপ্রধান

১। প্রবন্ধের শেষে প্রথম টীকা।

পশ্চিমবঙ্গ এবং মুসলমানপ্রধান পূর্ব পাকিস্তানে বিভক্ত।* শিক্ষিত বাঙালির লোকায়তিক সম্প্রচার যে নিতান্তই বাকছল মাত্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে তার ক্রিয়াকলাপে সেটি বারবার প্রমাণিত।

অথচ যেহেতু শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু যুক্তাভ্যাসের চর্চায় পারংগম, দেশবিভাগ এবং পৌনঃপুনিক দাঙ্গার দায়িত্ব নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে ইংরেজের উপরে আরোপ করতে তার সজ্ঞানে অতীতেও বাধেনি, এবং আজো বাধে না। যদিও ইংরেজ বণিকের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেওয়ার ব্যাপারে মুসলমানবিদ্বেষী বাঙালি হিন্দুর উদ্যোগ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ; যদিও প্রথমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে এবং তারপর ইংরেজি শিক্ষার সুযোগে বাঙালি হিন্দু প্রায় সোয়াশো বছর ধ'রে পরমানন্দে নিজেদের বিত্ত, প্রতিপত্তি বাড়িয়েছে; যদিও বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' এবং বিবেকানন্দ-অরবিন্দের কালী সাধনাই বাঙালি হিন্দুর জাতীয়তাবাদের মুখ্য প্রেরণা এবং প্রকাশ; যদিও তার সাহিত্যকল্পনায় বাঙালি মুসলমান এতাবৎ প্রায় আপাঙক্তেয়—তবু শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর ধারণায় এদেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য ইংরেজের ভেদনীতি এবং মুসলমানের দেশাত্মবোধহীন উৎকাঙ্ক্ষা ও উগ্র পৈশুন্যই আসলে দায়ী।[২] এদেশের রাজনৈতিক দেবীপূজায় বাঙালি হিন্দু কম্যুনিস্টরা পর্যন্ত প্রয়োগবাদের অজুহাতে উদ্যোক্তার অংশ নিয়ে থাকেন।

অবশ্য ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রবল। যেখানে শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে চাষবাসের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং শতকরা পঁচাত্তর ভাগ স্ত্রী-পুরুষ অক্ষর-পরিচয়হীন, সেখানে এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বুদ্ধিজীবীরা ব্যাপারটাকে বাস্তব ব'লে মেনে থাকেন, কিন্তু বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা অবস্থার কোনো পরিবর্তন না-ঘটিয়েই নিজেদের মুক্তবুদ্ধিকে বাহবা দিতে উৎসুক। অথচ তাঁদের আচার-আচরণে মুক্তবুদ্ধির চিহ্ন অনেক গবেষণা করেও বার করা কঠিন। একশো বছরের উপর হ'য়ে গেল বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়েছে, কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু বাঙালির ঘরে বিধবাবিবাহ এখনো কদাচিৎ ঘ'টে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল এবং চাকরি-বাকরির সূত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে

---

* এই প্রবন্ধটি যখন লেখা হয়েছিল তৎকালে পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র "বাংলাদেশ" রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

২। প্রবন্ধের শেষে দ্বিতীয় টীকা।

প্রেমে পড়ার সুযোগ সম্ভাবনা কিছুটা বেড়েছে বটে, কিন্তু বিয়ে ক'রে সংসার পাতবার সময়ে তারা প্রায় সকলেই জাতি গোত্র, ঠিকুজি কোষ্ঠী, পুরোহিত প্রকরণ মেনে নিতে প্রস্তুত। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বিয়ে দূরের কথা, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের সঙ্গে তথাকথিত অস্পৃশ্যের বৈবাহিক সম্বন্ধ এখনো খাশ কলকাতা শহরে প্রায় অকল্পনীয়। যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা রক্ষণশীল গুজরাতে শুনেছি, কিন্তু ডিগ্রিধারী বিলেতফেরত বাঙালি যুবক যৌতুক গ্রহণে অনিচ্ছুক এটা বিশেষ চোখে পড়েনি। কয়েক বছর পূর্বে মালাবারে সেখানকার বৈষ্ণবসমাজ ঘোষণা ক'রে কয়েক হাজার নিমন্ত্রিতকে গোমাংসের ভোজে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। বাঙলাদেশে আজকাল ডিরোজিওর শিষ্যদের নিয়ে গবেষণা হচ্ছে শুনতে পাই, কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর ঘরে গোমাংসের প্রকাশ্য প্রবেশ আজো পুরোপুরি নিষিদ্ধ। মহারাষ্ট্রে এবং পঞ্জাবে বিবর্ধমান স্ত্রী-স্বাধীনতার যতটা প্রকাশ দেখা যায়, পশ্চিম বাঙলায় তার ভগ্নাংশও অপরিস্ফুট।

॥ দুই ॥

ইয়োরোপে আধুনিকতার সঙ্গে উদ্যোগী বণিক ব্যবসায়ীদের সম্পর্কের কথা সকলে জানেন।[৩] উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনা, সঞ্চয় এবং সংগঠন, বিজ্ঞানচর্চা এবং ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ—আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশে এসব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইংরেজের ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ভারতীয়দের এ-ব্যাপারে সাহায্য না ক'রে দীর্ঘকাল নানা প্রতিবন্ধক খাড়া করে ছিল। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের কোনো-কোনো অঞ্চলের কিছু মানুষ সীমাবদ্ধ সম্ভাবনার সুযোগ নিয়ে দেশেবিদেশে ব্যবসাবাণিজ্য কলকারখানা গড়ার প্রয়াস পেয়েছে। আফ্রিকাতে গুজরাতিরা, মালয় দ্বীপপুঞ্জে তামিলরা, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে সিন্ধি এবং পাঞ্জাবিরা এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ভারতবর্ষের মধ্যেও যে-সব বেসরকারি ছোটো-বড়ো শিল্প এবং ব্যবসা গ'ড়ে উঠেছে তাতে এদের এবং পারশি ও মারওয়াড়িদের প্রাধান্য অজ্ঞাত নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম দু-চারজনকে বাদ দিলে চাকুরিই শহরে বাঙালির প্রধান সম্বল; কিছু ডাক্তার উকিল ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি কোনো-না-কোনো সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বেতনে নিযুক্ত।

৩। প্রবন্ধের শেষে তৃতীয় টীকা।

ফলে বাঙালিদের মধ্যে আধুনিকতার অনেকগুলি প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ এতাবৎ গ'ড়ে ওঠেনি। যেহেতু অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালিই অপজাত জমিদার বংশোদ্ভূত, উৎপাদনের চাইতে ব্যয়ে, সঞ্চয়ের চাইতে সম্ভোগে তাদের আগ্রহ সমধিক। বিজ্ঞানের চর্চা তাদের সম্প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট করলেও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তারা সাধারণত হয় অনিচ্ছুক, নয় অপারগ। শব্দের খেলায় তাদের জুড়ি হয়তো এখনো ভারতবর্ষের অন্যত্র মেলে না, কিন্তু কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য, অথবা বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে বাঙালির অযোগ্যতা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। বাঙালি সময়নিষ্ঠাকে ব্যঙ্গ করতে ভালোবাসে; সাধ্যের অতিরিক্ত অপচয়ে তার সমধিক উল্লাস; যে-উদ্যোগ সঞ্চয়, আকলন বিকলন, এবং অবিচ্ছিন্ন ধৈর্য ও প্রযত্ন দাবি করে তাতে তার আন্তরিক অনীহা। সবচাইতে মুশকিলের কথা, সহযোগ এবং সংগঠনমূলক প্রচেষ্টা শিক্ষিত বাঙালির ধাতে সয় না। বাঙালির উৎকাঙ্ক্ষা নিতান্তই উদ্‌বায়ী; তার প্রতিন্যাস অসহিষ্ণু, অপরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে ছোটোখাটো কাজের মধ্যে সার্থকতা খোঁজার চাইতে নির্দায়িত্ব বিক্ষোভ এবং অতিনৈতিক অসহযোগে তার আত্মম্ভরী আদর্শবাদ আরাম পায়।

শিক্ষিত বাঙালি চরিত্রের এই দুর্বলতা শুধু যে আর্থিক উন্নয়নকে দুঃসাধ্য ক'রে তুলেছে তা ই নয়, বাঙলার নাগরিক এবং রাজনৈতিক প্রশাসনও এরই ফলে নিতান্ত দূষিত। দায়িত্বশীল গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে আধুনিকতার অনুষঙ্গ ঐতিহাসিক। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি ক্রমবিকাশধর্মী গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী। অভিজ্ঞতা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা ধীরে ধীরে সামর্থ্য এবং দায়িত্বের সীমা যে বাড়ানো যায়—এ সত্য তাঁরা স্বীকার করেন না। এদেশেও যে পৌরনিগম ব্যবস্থা সুপরিচালিত এবং ফলপ্রদ হ'তে পারে মাদ্রাজ অথবা বম্বেতে কিছুদিন বাস করলেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। অথচ কলকাতা কর্পোরেশনের মতো নিষ্ক্রিয়, নিরুপস্থ এবং আত্মবিনাশে উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর অন্য কোথাও মিলবে কিনা সন্দেহ। আমাদের সাধের সঙ্গে সাধ্যের কোন সম্পর্ক নেই; আমাদের ক্ষমতাস্পৃহা দায়িত্বের অস্বীকারের দ্বারা পুষ্ট; আমরা গড়ার চাইতে ভাঙাতে বেশি দড়ো, এবং ফলে আমরা সংশোধনের জায়গায় সংপ্লবকে আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি।

। তিন ।

বস্তুত বাঙলাদেশে নব্য রাজনীতির প্রায় আদিযুগেই আমাদের নেতারা ক্রমিক উৎকর্ষ সাধনের পন্থা ত্যাগ ক'রে উগ্র রোম্যান্টিক বিপ্লববাদের দিকে ঝোঁকেন। ভারতবর্ষে এই মতবাদের প্রথম মনস্বী প্রবক্তা বোধহয় অরবিন্দ ঘোষ। চোদ্দ বছর বিলেতে কাটানোর পর একুশ বছরের এই যুবক যখন গাইকোয়াড়ের সেক্রেটারি হ'য়ে বরোদায় আসেন তখন দেশের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন জ্ঞান না-থাকলেও তৎকালীন কংগ্রেসের মডারেট নেতৃত্বকে তুলো ধুনতে তাঁর বাধেনি। *New Lamps for Old* নামে ধারাবাহিক যে-এগারোটি প্রবন্ধ (১৮৯৩-৯৪) তিনি বম্বের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় লেখেন তাতে মডারেটদের সমালোচনা প্রসঙ্গে নানা বক্তব্যের মধ্যে দু'টি পরস্পরনির্ভর যুক্তিকে তিনি বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন।[৪] প্রথমত, তাঁর মতে ক্রমিক সংস্কারপন্থী রাজনৈতিক বিবর্তনের চাইতে বিস্ফোরণধর্মী সমাজবিপ্লব প্রগতির দিক থেকে অধিকতর কাম্য; ভারতীয় মডারেটরা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার সঙ্গে তুলনায় ফ্রান্সের ইতিহাসের শিক্ষা এ-দেশের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রযোজ্য এবং সম্ভাবনাপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, এই বিপ্লব মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাধ্যাতীত; সভ্যতার পাতলা আবরণের নীচে যে-প্রচণ্ড আদিম শক্তি অতিপ্রজ প্রলেটারিয়েটের মধ্যে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে তারই অগ্নিময় বিস্ফোরণ ছাড়া সমাজের আমূল রূপান্তর অসম্ভব। '('প্রলেটারিয়েট' শব্দটি অরবিন্দ নিজেই বারবার ব্যবহার করেছেন)। ইংল্যাণ্ডে সাতশো বছর ধ'রে যে সামাজিক রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ ঘটেছে তা হিমবাহের গতির সঙ্গে তুলনীয়; অপরপক্ষে "সৌভাগ্যশালী" ফরাশি দেশে অজ্ঞ এবং মহাকায় প্রলেটারিয়েট রক্ত আর আগুনের প্রায়শ্চিত্তে তেরো শতকের সঞ্চিত অত্যাচার ভয়ংকর পাঁচ বছরের মধ্যে মুছে দিয়েছে। ("... the first step of that fortunate country towards progress was ... through a purification by blood and fire. ... the vast and ignorant proletariate that emerged from a prolonged and almost coeval apathy and blotted out in five terrible years the accumulated oppression of thirteen centuries.")[৫]।

যদিও এই প্রবন্ধগুলি লেখার পর সাত বছরের মধ্যে অরবিন্দ রাজনীতিতে

৪ ও ৫। প্রবন্ধের শেষে টীকা।

কোনো অংশ গ্রহণ করেননি, এবং যদিও আলিপুর জেলে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ফলে জেল থেকে ছাড়া পাবার দশ মাস পরেই রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে তিনি ধর্মসাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করেন, তবু তাঁর বিপ্লববাদী প্রস্তাবের মধ্যে এই শতকের শিক্ষিত হিন্দু বাঙালির রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের প্রধান সূত্রটি লক্ষ না-করা কঠিন। এই শতকের সূচনা থেকেই তাঁরা উগ্র রাজনীতির প্রধান সমর্থক ; ধৈর্যশীল সংস্কার এবং সংগঠনের বদলে নাটকীয় সন্ত্রাসবাদ ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ সমধিক। গান্ধির অহিংস রাজনীতি এবং গ্রামোদ্যোগ পরিকল্পনা এই কারণেই তাঁদের বিশেষ আকৃষ্ট করেনি।[৬] অপরপক্ষে একদিকে কম্যুনিজমের কূটাঘাতী কর্মপন্থা এবং অন্যদিকে ফাসিজমের হিংস্র ভাবোচ্ছ্বাস তাঁদের কাণ্ডজ্ঞানকে বারবার আচ্ছন্ন করেছে। অরবিন্দের ঐতিহাসিক আদর্শ ফরাশিদের মতো তাঁদের রাজনীতিও নৈরাজ্যবাদ এবং একনায়কত্বের মধ্যে দোদুল্যমান।

অরবিন্দ প্রলেটারিয়েটকে বিপ্লবের নায়ক হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। যেহেতু যন্ত্রসভ্যতা এদেশে এখনো ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পায়নি, মার্ক্সীয় অর্থে প্রলেটারিয়েট ভারতীয় সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। (অবশ্য পশ্চিমের যে-সব দেশে মজুরশ্রেণী সংখ্যাগুরু সেখানে তাঁরা সংপ্লবের চাইতে সংরক্ষণকেই বেশি সমর্থন করেন)। অরবিন্দের প্রলেটারিয়েট আসলে সমাজের দরিদ্র-সাধারণ, এবং যেহেতু বাংলাদেশে তারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রায় সমবিভক্ত, হিন্দু উগ্র বিপ্লববাদীরা যতই তাঁদের নিজ সম্প্রদায়ের প্রলেটারিয়েটকে দলে টানার চেষ্টা পেয়েছেন ততই মুসলমান প্রলেটারিয়েটের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ প্রকট হ'য়ে উঠেছে। লোকায়তিক শিক্ষার প্রসার এবং গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা ও সহযোগের ক্রমিক বিবর্তনের পথে হয়তো এই বিরোধের একদিন শান্তিপূর্ণ সমাধান ঘটতে পারতো। কিন্তু অরবিন্দ থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বাঙলার স্বদেশী নেতারা প্রায় সকলেই কালীভক্ত ; এবং তাঁদের উগ্র রোম্যান্টিকতা বাঙালির কুশিত কাণ্ডজ্ঞানকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তার অসহিষ্ণু উৎকাঙ্ক্ষায় ইন্ধন জুগিয়েছে। দেশ দু-ভাগ হ'য়ে যাওয়ার পরও যে বাঙালি তার ইতিহাস থেকে বিশেষ কিছুই শেখেনি, ষাট দশকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি তারই প্রমাণ।

৬। প্রবন্ধের শেষে ষষ্ঠ টীকা।

॥ চার ॥

শিক্ষিত হিন্দু বাঙালির চরিত্রগত দুর্বলতার পিছনে ভূগোলের হাত কতখানি বলা শক্ত, কিন্তু ইতিহাসের প্রভাব অনস্বীকার্য। পালরাজাদের আমলে বাঙালি কিছুটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে; বাঙলা ভাষার উদ্ভবের মধ্যে তার প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদল তৈরি হয় পরবর্তী সেন-বর্মন পর্বে। বাঙলাদেশে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নেই; ব্রাহ্মণ ছাড়া আর যতো বর্ণ আছে সকলেই সংকর এবং শূদ্র। এদের মধ্যে সবচাইতে উঁচুতে আসন পেয়েছেন করণ বা কায়স্থ এবং অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য—এঁরা উত্তম-সংকর বা সৎশূদ্রদের মধ্যে প্রধান। অপরপক্ষে সমাজে যাঁরা উৎপাদন করেন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত তাঁদের অনেককেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে মধ্যম-সংকর বা অসৎ শূদ্রের পর্যায়ে। বাকিরা অধম-সংকর বা অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত। বাঙলাদেশে সেন-বর্মন আমলে যে-সমাজব্যবস্থা চালু হয় তার ফলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী এবং মসিজীবীরা হন কর্তা; স্বর্ণকার এবং অন্যান্য কারিগর ও বণিকরা তাঁদের সামাজিক মর্যাদা হারান; এবং ব্রাহ্মণেতর শূদ্রদের এমন ক'রে ছত্রিশ জাতে বিভক্ত করা হয় যার তুলনা সম্ভবত ভারতবর্ষের আর কোথাও মেলে না।[৭] তারই সঙ্গে অতিপ্রজ বিধিনিষেধ, পূজানুষ্ঠান, দশকর্মপদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ ইত্যাদির ঘুণ ধরানোর ফলে বাঙালি হিন্দু প্রায় তার ইতিহাসের আদিযুগেই উদ্যোগ এবং বিকাশের ক্ষমতা হারাতে শুরু করে।

ইসলাম বাঙলাকে হয়তো এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারতো, কিন্তু তা ঘটেনি। হিন্দু সমাজ যাঁদের সবচাইতে নিচুতে নামিয়ে দিয়েছিলো প্রধানত তাঁদেরই একটা বড়ো অংশ বাঙলাদেশে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু রাজা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এঁরা না পেরেছেন তারই সুযোগ নিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে, না পেরেছেন বদলাতে সমাজের কাঠামো। স্বর্ণকার এবং বণিক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন; কিন্তু যে-ধর্মের মূল সাধনা ঘাসের মতো নম্র এবং সর্বংসহ হওয়া সমাজ-সংস্কার তার কাজ নয়।[৮] অপরপক্ষে বাঙলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা মুসলমান রাজার সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে নিজেদের আর্থিক সামাজিক প্রাধান্য বজায় রেখেছেন

৭। প্রবন্ধের শেষে সপ্তম টীকা।
৮। প্রবন্ধের শেষে অষ্টম টীকা।

কিন্তু ইসলাম ধর্ম থেকে তাঁরা বিশেষ কিছু গ্রহণ করেননি ; বরং নিত্যনূতন নিষেধ এবং বিভেদ রচনা ক'রে সমাজের জড়িমা বাড়িয়েছেন।

আঠারো শতকে মুসলমান নবাবকে হটিয়ে ইংরেজ যখন বাঙলাদেশে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে তখন তার প্রধান সহযোগী হন উচ্চবর্ণের কিছু বাঙালি হিন্দু। তাঁদের মধ্যে অনেকে কোম্পানির দালালি ক'রে রাতারাতি বড়লোক হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের না ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে আগ্রহ, না ছিল খুব বেশি সুযোগ, জমিদারির মধ্যেই তাঁরা নিজেদের সার্থকতা খোঁজেন।[৯] ক্রমে ইংরেজের সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সুরাট (১৬১৩), মাদ্রাজ (১৬৩৯) এবং বম্বেতে (১৬৬৮) কোম্পানি অনেক আগে ফ্যাক্টরি পত্তন করা সত্ত্বেও যেহেতু বাঙলাদেশেই ইংরেজ সাম্রাজ্যের সূচনা এবং প্রথম ভিত্তি, সেই কারণে কলকাতা হয় এই সাম্রাজ্যের রাজধানী। সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। উপরের পদগুলি নিজেদের একচেটিয়া দখলে রেখে ইংরেজ সরকার নিচের পদগুলিতে এদেশি লোক নিয়োগের নীতি নেয়।[১০] বাঙলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের মধ্যে তখন ইংরেজি শেখার আগ্রহ খুব বেড়ে ওঠে, কারণ সরকারি চাকুরি এবং আর্থিক উন্নতির জন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত স্পষ্ট। বাঙালি মুসলমানসমাজ কিন্তু দীর্ঘকাল এ-ব্যাপারে লাভবান হননি। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রামবাসী, এবং নবাবের আমলে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বিত্তবান বা প্রতিপত্তিশালী তাঁদের বংশধরেরা স্বাভাবিক আত্মাভিমানবশত ইংরেজর প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত করতে পারেননি।[১১]

উৎকাঙ্ক্ষী বাঙালি হিন্দুর ইংরেজি চর্চা এবং ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের পিছনে স্বার্থচিন্তার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রকট। ইংরেজদের তল্পি ব'য়ে তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন ; উনিশ শতক ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাঙালি হিন্দুর মুরুব্বিয়ানার এটাই অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু ইংরেজ এদেশে শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেনি ; তারা ভারতবর্ষে আধুনিকতারও প্রবর্তক। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর থেকে পশ্চিমের নব্যভাবধারা এদেশে ছড়াতে শুরু করে, এবং ইংরেজি শিক্ষার সূত্রে সেই ভাবধারা'র সঙ্গে শহরবাসী

৯। প্রবন্ধের শেষে নবম টীকা

১০। প্রবন্ধের শেষে দশম টীকা

১১। প্রবন্ধের শেষে একাদশ টীকা

বাঙালি হিন্দুর ক্রমে পরিচয় ঘটে। যুক্তিবাদ এবং উপযোগবাদ, আরোহী বিচার এবং ঐতিহাসিক গবেষণা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং মানবীয় অধিকারতন্ত্র এঁদের অনেকের মনে গভীর আলোড়ন আনে, এবং ফলে এঁদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি নিজেদের সমাজ, ধর্ম এবং শিক্ষার সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। এই উদ্যোগের প্রথম প্রতিভাবান নেতা এবং প্রবক্তা হচ্ছেন রামমোহন রায়; তাঁর পরে বাঙলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত, মহারাষ্ট্রে গঙ্গাধর শাস্ত্রী জাম্বেকর (১৮১২-৪৬), গোপালহরি দেশমুখ 'লোকহিতবাদী' (১৮২৩-৯২), এবং যতিবা গোবিন্দ ফুলে (১৮২৭-৯০); গুজরাতে দুর্গারাম মঞ্চরাম (১৮০৯-৭৬) ও নর্মদাশঙ্কর (১৮৩৩-৮৬), মাদ্রাজে বীরেশলিঙ্গম পণ্টুলু (১৮৪৮-১৯১৯) প্রভৃতি ভাবুক এবং সংস্কারক এই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।[১২] নূতন চিন্তা, জ্ঞান, অনুভব এবং উদ্যোগের চাপে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় গদ্য-সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে, এবং ক্রমে তার প্রভাবে কবিতার মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যেও ভাঙন ধরে। যেহেতু ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লিতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কলকাতা ছিল ইংরেজ-শাসিত ভারতের প্রধান শহর, সেহেতু ইংরেজ-প্রবর্তিত আধুনিক ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু অন্য ভারতীয়দের তুলনায় বেশী দীর্ঘ এবং ব্যাপক পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন, এবং তার ফলে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য কিছুটা আগেই বিকাশলাভ করেছে।

কিন্তু সমাজের বিকাশ ভাষা বা সাহিত্যের সঙ্গে তাল রেখে চলেনি। বাঙলাদেশে যাঁরা রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো আধুনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের নির্ভরযোগ্য সহকর্মী জুটেছিল অত্যন্ত অল্প। বিদ্যাসাগর তো প্রায় সারা জীবনই নিঃসঙ্গ পুরুষ; বিধবাবিবাহের জন্য তাঁকে বলতে গেলে ঘুষ দিয়ে পাত্র সংগ্রহ করতে হয়েছে; শেষ-জীবনে বাঙালির ওপরে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে তিনি প্রায় সমস্ত উদ্যোগ থেকে স'রে যান। এতবড়ো প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের এমন ব্যর্থতা ইতিহাসে খুব বেশি চোখে পড়ে না; একমাত্র বাঙলা গদ্যের বিকাশে তাঁর দান কিছুটা সার্থকতা পেয়েছে। রামমোহনের সহকর্মীরা যে কী দরের মানুষ ছিলেন তিনি বিলেত যাবার পরই ব্রাহ্মসমাজের দুরবস্থা থেকে তা বোঝা যায়। পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মীয় আন্দোলনকে আবার শক্তিশালী করেন, কিন্তু সমাজসংস্কারে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। বরং এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু নেতা রাধাকান্ত দেবের মিল বেশি

১২। প্রবন্ধের শেষে দ্বাদশ টীকা

স্পষ্ট। হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু এবং ছাত্র গুরুচরণ সিংহ যখন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁদের বিতাড়নের প্রচেষ্টায় দেবেন্দ্রনাথ রাধাকান্তের সহযোগী। পরে যাঁরা বুলবুল নামে একজন বাইজির ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করার প্রতিবাদে রক্ষণশীল হিন্দু মুরুব্বিরা যখন হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৫৩) তখন তাতেও দেবেন্দ্রনাথ একজন প্রধান উদ্যোক্তা।[১৩] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালকদের মধ্যে লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পেয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভা তুলে দেন (১৮৫৯);[১৪] এবং পরে জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলন ইত্যাদি ব্যাপারে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতভেদের ফলে ব্রাহ্মসমাজ যখন দু-টুকরো হ'য়ে যায় তখন দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতা পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে।[১৫]

ফলত বাঙলাদেশে সমাজসংস্কার আন্দোলন কোনোদিনই ব্যাপক সমর্থন পায়নি। আধুনিক শিক্ষার প্রসার শহরে হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং এঁদের মধ্যেও খুব বেশি লোক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। একদিকে সংস্কারকরা নিজেদের বিভিন্ন প্রস্তাবকে গ্রহণীয় করার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় অথরিটির আশ্রয় নিয়েছেন; মহারাষ্ট্রের অন্ত্যজ ভাবুক যতিবা ফুলের মতো হিন্দু ঐতিহ্য এবং লোকাচারকে পুরোপুরি বাতিল ক'রে যুক্তিবাদ এবং লোকায়তিক শুভবুদ্ধির ভিত্তিতে সমাজসংস্কারের প্রস্তাব বাঙলাদেশে কেউ কখনো করেছেন ব'লে মনে পড়ে না।[১৬] অন্যদিকে ব্যাপক জনসমর্থনের অভাবে সংস্কারকদের বারবার ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করতে হয়েছে যাতে তাঁরা আইন ক'রে সমাজসংস্কারের পথ সরল ক'রে দেন। ফলে পরিবর্তন সাধারণ মানুষের মনে কোনো গভীর প্রভাব ফেলেনি, এবং যেহেতু সিদ্ধান্তের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বিদেশি সরকারের ওপরে বর্তিয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজসংগঠনের উদ্যোগ আগাগোড়াই দুর্বল থেকে গেছে।

১৩। প্রবন্ধের শেষে ত্রয়োদশ টীকা

১৪। প্রবন্ধের শেষে চতুর্দশ টীকা

১৫। প্রবন্ধের শেষে পঞ্চদশ টীকা

১৬। প্রবন্ধের শেষে ষোড়শ টীকা

। পাঁচ ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের দিকে ঝোঁকেন। ইংরেজ তাঁদের কিছু-কিছু দাবিদাওয়া মানলেও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তাঁদের বর্ধমান উৎকাঙ্ক্ষা মেটানো সম্ভবপর ছিল না। হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা তখন আবিষ্কার করেন যে জনসমর্থন ছাড়া রাজনৈতিক দাবি নিতান্তই অশক্ত, এবং আধুনিকতা তাঁদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। নব্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের দ্বারা সমাজকে আধুনিক জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে-অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং সাংগঠনিক সামর্থ্য প্রয়োজন, তা তাঁদের ছিল না। সুতরাং আধুনিকতার পারক্য পরিত্যাগ ক'রে এবং সমাজসংস্কারের কর্মসূচীকে ধামাচাপা দিয়ে তাঁদের মধ্যে অনেকেই জনসংযোগের প্রত্যাশায় ধর্মধ্বজী এবং স্বাজাত্যাভিমানী হ'য়ে উঠলেন। যেহেতু এঁরা সকলেই হিন্দু, বাঙলাদেশের অর্ধেক অধিবাসী মুসলমানদের সমর্থন পাবার কথা এঁদের মনে আসেনি। নবগোপাল মিত্র শুরু করলেন হিন্দুমেলা (১৮৬৭), যদিও তার নাম হ'ল জাতীয় মেলা।[১৭] ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু, 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭২), প্রতিপন্ন ক'রে জাতীয়তাবাদীদের গুরু হ'য়ে উঠলেন। হিন্দুজাতির এক মহাসমিতি গ'ড়ে তোলা হয়ে উঠলো তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) বাঙালি হিন্দুকে শেখালো দশভুজা দেবীমূর্তিরূপে স্বদেশকে পূজা করতে; তার মন্ত্র হ'লো বন্দে মাতরম্। দলে-দলে শিক্ষিত হিন্দু যুক্তিবাদ, আরোহী বিচার এবং সমাজসংস্কারের দুঃসহ দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দীক্ষা নিতে ছুটলেন দক্ষিণেশ্বরের স্বেচ্ছা-সংবেশিত মহাত্মার কাছে। রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ বাঙালি হিন্দুর মনে স্বাজাতিকতা, গণপূজা এবং কালীসাধনার মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রবল উদ্দাপনার সঞ্চার করলেন। ত্রিধাবিভক্ত ব্রাহ্ম আন্দোলন তারই ধাক্কায় মোহমান; বাঙালির আপতিক আধুনিকতা চাপা পড়লো ধর্মীয় রাজনীতির নিচে।

ইত্যবসরে মুসলমানদের মধ্যেও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জাগরণ শুরু হয়েছিল। হিন্দু স্বাজাতিকতার প্রতিক্রিয়ায় তাঁদের নেতারাও ধর্মের ভিত্তিতে জনসমর্থন খুঁজলেন, এবং তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে-

১৭। প্রবন্ধের শেষে সপ্তদশ টীকা

বিরোধ প্রবল হ'য়ে উঠলো ইংরেজ শাসক তার সুযোগ নিতে অবহেলা করলেন না। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি হিন্দু বাঙালি মুসলমানকে দেশদ্রোহী রূপে ভাবতে অভ্যস্ত হ'লো; তার উগ্র স্বাজাতিকতা রাজনৈতিক হঠযোগে সিদ্ধির সন্ধান করলো।[১৮] তারপর কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে উঠে যাওয়ার পর ভারতবর্ষে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর প্রাধান্যের যুগ শেষ হ'য়ে এলো।[১৯] তখন থেকে তার ব্যর্থ উচ্চাভিলাষ উত্তর ভারতকে বাঙলার শত্রু হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করেছে। তার উগ্র আত্মাভিমান তাকে ক্রমেই অন্য সব অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ধ্বংসাত্মক নির্দায়িত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ফলত যথার্থ আধুনিকতা শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর জীবনে, চরিত্রে অথবা সমাজে শিকড় ছড়াতে পারেনি। তার রাজনীতি তাই অপ্রতিষ্ঠ; তার আর্থিক অবস্থা প্রায় দেউলিয়া; তার মনের গঠনে এবং আচার-আচরণে কাণ্ডজ্ঞানের চাইতে প্রক্ষোভ অনেক বেশি প্রবল। একমাত্র তার ভাষা এবং সাহিত্যের মধ্যে আধুনিকতা কিছুটা প্রকাশ লাভ করেছে। হয়তো সেন-বর্মন যুগ থেকে মসিজীবীরা বাঙলা সমাজে প্রাধান্য পেয়ে এসেছেন ব'লেই বাঙালি ভাষার ব্যাপারে সুবেদী। তাছাড়া দেড়শো বছর ধ'রে ইংরেজি চর্চার ফলে শিক্ষিত বাঙালি তার নিজের ভাষায় আধুনিক ভাবনা-চিন্তার প্রকাশে অনেকটা দক্ষতা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে হয়তো কূটাভাস মনে হ'তে পারে, কিন্তু জীবনে যাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া গেল না, কথার জাদুতে সেই অমূলপ্রত্যক্ষকে মূর্ত করার প্রয়াস বুদ্ধিজীবীর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ·স্তত আমার সন্দেহ যে ফরাশি বুদ্ধিজীবীদের মত বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুও অস্তিত্বগত দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ খুঁজেছে সাহিত্যের কাল্পনিক জগতে।

১৮। প্রবন্ধের শেষে অষ্টাদশ টীকা

১৯। প্রবন্ধের শেষে উনবিংশ টীকা

(১) যেমন কে. কে. দত্তের *Dawn of Renascent India*, হরিদাস ও উমা মুখার্জির *The Growth of Nationalism in India*, অথবা নিমাইসাধন বসুর *The Indian Awakening and Bengal*।—এঁরা এমনভাবে ইতিহাস লিখেছেন যেন উনিশ শতকে ভারতবর্ষের সমস্ত উল্লেখ্য আন্দোলন বাংলাদেশেই ঘটেছিল। এঁদের সঙ্গে তুলনায় Charles H. Heimsath-এর *Indian Nationalism and Hindu Social Reform* গ্রন্থে ভারতীয় জাগরণের অনেক অনেক বেশি সুসমঞ্জস বিবরণ মেলে।

(২) রমেশচন্দ্র মজুমদার (*History of the Freedom Movement in India*), কে. কে. দত্ত (*Renaissance, Nationalism and Social Change in Modern India*), নিমাইসাধন বসু (*The Indian National Movement*) সকলেই ইংরেজ এবং মুসলমান নেতাদের দায়ী করেছেন। আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের এই দিকটি নিয়ে নিরপেক্ষ এবং তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা এখনো শুরু হয়নি। দ্রষ্টব্য এই লেখকের প্রবন্ধ *Journal of Contemporary History*, Vol. 2, No. 1 (January 1967)।

(৩) এ-সম্পর্কে প্রচুর বই এবং প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। বিশেষ ক'রে Alfred von Martin-এর *Sociology of the Renaissance* দ্রষ্টব্য।

(৪) অরবিন্দের এই প্রবন্ধগুলির প্রতি সম্প্রতিকালে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশী যুগ' (১৯৫৬) গ্রন্থে। পরে হরিদাস এবং উমা মুখার্জি এর মধ্যে ন-টি প্রবন্ধ সংগ্রহ ক'রে তাঁদের সম্পাদিত *Sri Aurobindo's Political Thought* পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অরবিন্দের জীবনের আদিপর্ব নিয়ে এ-পর্যন্ত যত বই বেরিয়েছে গিরিজাশঙ্করের বইটি তাদের মধ্যে সবচাইতে তথ্যসমৃদ্ধ এবং বিশ্লেষণাত্মক।

(৫) *Sri Aurobindo's Political Thought*, পৃ ৮৪। কিছুকাল আগে পেঙ্গুইন অনুবাদ প্রকাশিত Frantz Fanon-এর *The Wretched of the Earth*-এর বক্তব্যের সঙ্গে অরবিন্দের যুক্তির অনেক মিল আছে। যদিও আফ্রিকার সমকালীন বিপ্লবপ্রচেষ্টাই এই বইটির মুখ্য উপজীব্য, বাঙলার এখনকার রোম্যান্টিক বিপ্লববাদীদের মনে বইটি সাড়া জাগাবে।

(৬) রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গান্ধির বিজ্ঞানবিমুখতা এবং অসহযোগের সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর সেই সমালোচনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু শিক্ষিত বাঙালির উপরে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রভাব খুব কম। বাঙালি হিন্দু তরুণরা যে গান্ধিকে ছেড়ে হিটলার-মুসোলিনিভক্ত এবং বিবেকানন্দপন্থী সুভাষচন্দ্রকে নেতা করেছিলেন তার মধ্যেই তাঁদের উগ্র অসহিষ্ণু প্রতিন্যাসের নির্দেশ মেলে।

(৭) নীহাররঞ্জন রায় তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব', ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দুর্ভাগ্য, বাঙলার মুসলমান-যুগ সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্লেষণশীল ইতিহাস আজো লেখা হয়নি।

(৮) পঞ্জাবে শিখধর্মের বিবর্তন সেখানকার ইতিহাসকে অন্য পথে নিয়ে গেছে।

(৯) নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, *The Economic History of Bengal*, দ্বিতীয় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(১০) ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের ভারতীয় বেসামরিক কর্মচারী ছিল ১,১৯৭; বিশ বছর পরে হয় ২,৮১৩। ইংরেজ শাসনে ভারতীয় মধ্যবিত্তের বিকাশ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন বি বি মিশ্র তাঁর *The Indian Middle Class; Their Growth in Modern Times* এবং অনিল শীল তাঁর *The Emergence of Indian Nationalism* বই দুটিতে।

(১১) ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সরকারি অর্থে প্রতিপালিত বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রসংখ্যা ১৭,৩৬০; তার মধ্যে হিন্দু ১৩,৬৯৯; মুসলমান ১,৬০৬; খ্রীষ্টান ২৩৬।

(১২) অবাঙালি নব্যভাবুকদের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত Heimsath-এর বইটিতে অনেক তথ্য আছে। তাছাড়া দ্রষ্টব্য; *Memoirs and Writings of Acharya Bal Shastri Jambhekar* (পুনা, ৪ খণ্ড); A. K. Ghorpade, *Mahatma Phule* (মরাঠিতে লেখা); J. Gurunadham, *Vireesalingam; The Founder of Telegu Public Life*; S. Natarajan, *A Century of Social Reform in India*; N. R. Pahtak and others, *Rationalists of Maharashtra*, ইত্যাদি।

(১৩) যোগেশচন্দ্র বাগল, 'জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ', পৃ ৭১-৭২, ৮০-৮১; 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা), পৃ ৫০-৫১। বাগল মহাশয়ের ভাষায় 'খ্রীষ্টান মিশনারীদের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম ও সমাজ রক্ষা প্রচেষ্টায় দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসভার অধ্যক্ষ রাজা রাধাকান্ত দেবকে প্রধান সহায় রূপে পাইয়াছিলেন।' (ঐ, পৃ ১২)।

(১৪) 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।' রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র, মার্চ ১৮৫৪। এই গ্রন্থাধ্যক্ষদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিদ্যাসাগর।

(১৫) ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের যখন উপনয়ন হয় মহর্ষি সেখানে তাঁর ঘনিষ্ঠতম ব্রাহ্ম বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে বসতে দেননি—কারণ রাজনারায়ণ শূদ্র। (রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত', পৃ ১৯৯)।

(১৬) ফুলে তাঁর মহাগ্রন্থ 'গুলামগিরি'-তে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছিলেন যে হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিই ভারতবর্ষের সমস্ত সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক সমস্যার মূল কারণ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সত্যশোধক সমাজ'-এর উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম এবং শাস্ত্রের শাসন থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করা। 'গুলামগিরি (১৮৭২) বইটির বাংলা অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

(১৭) 'ন্যাশনাল নবগোপাল' এ-কে 'জাতীয়' নাম দিলেও এটি যে শুধু হিন্দুদেরই মিলনস্থান ছিল যোগেশচন্দ্র বাগলের 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'হিন্দুজাতির সর্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের বর্ধন'—মেলার এই মূল উদ্দেশ্য বারবা· ঘোষণা করা হয়। নবগোপাল তাঁর পত্রিকা *The National Paper*-এ লেখেন; "...the Hindoos... certainly form a nation by themselves, and as such a society established by them can very properly be called a National Society." (৪ ডিসেম্বর ১৮৭২)। ঐ পত্রিকার অন্য এক সংখ্যায়: "Let us hope that the Mela will be a binding power endearing the Hindu name to the Aryan people wherever scattered through India." শুধু হিন্দু নয়, একেবারে আর্য।

(১৮) রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে'-তে তার কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন; 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে ব্যাপারটা স্পষ্টতর করার ফলে তাঁকে কম আক্রমণ সহ্য করতে হয়নি।

(১৯) বাঙলার উগ্র রাজনীতির এই দিকটি সম্পর্কে 'সি৲শন কমিটির রিপোর্ট'-এ (১৯১৮) যে আলোচনা আছে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর পছন্দ না-হ'লেও তার অনেকটাই সত্য।

সত্য, শ্লীলতা ও আধুনিক বাংলাসাহিত্য

ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক প্রায় দেড়শ সোয়াশ বছর ইংরেজের সাগরেদী করেও বাংলা সাহিত্যের যে আজো সম্পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটল না, তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ইংরেজ আমাদের লিখিয়ে ভাবিয়েদের অনেক তত্ত্বে তালিম দিয়েও একটি মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ, বলতে কি অন্ধ করে রেখে গেছে। সত্য যে লজ্জার ঘাটে পা ধোয় না. একথা আমাদের ইংরেজ গুরুরা আমাদের শেখান নি। হয়ত একথা শেখাবার তাকত তাঁদের ছিল না। কেননা ইংরেজের কাছে যখন আমরা তালিম নিতে শুরু করলাম তখন আর ইংরেজ এলিজাবেথান-জেকোবিয়ান যুগের ইংরেজ নেই, তার মতি-পরিবর্তন ঘটেছে। রনেসাঁসের সত্যান্বেষণ ক্ষীণ হতে হতে রূপান্তরিত হয়েছে রোমান্টিক সত্যবিমুখতায় ; তার বীর্যান্বিত ভোগবুদ্ধি শীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত ভিক্টোরিয় বিবেকের মেদাতিশয্যের নীচে চাপা পড়েছে। ফলতঃ ডানের কবিতা, হব্‌স্‌-এর দর্শন, সুইফ্‌টের ব্যঙ্গ কিংবা স্টর্নের উপন্যাস বাঙালী শিক্ষিতমনের উজ্জীবনে বিশেষ কোন ছাপ ফেলেনি। এমন কি যদিও শেক্সপীয়রের নাম বলতে গদ গদ বোধ করেছি তবু কি উনিশ কি বিশ শতকে এমন বাঙালী লেখকের সন্ধান পাওয়া শক্ত যাঁর লেখায় শেক্সপীয়রী মেজাজের কিছুটা আভাস চোখে পড়ে। রোমান্টিক ভাবালুতার আওতায় আমরা জীবনের চাইতে কল্পনাকে বড় বলে ভাবতে শিখেছি ; ভিক্টোরিয় ঔচিত্যবোধে দীক্ষা নিয়ে আমাদের ধারণা হয়েছে সত্যের চাইতে শ্লীলতা বেশী মূল্যবান। আমাদের সাহিত্য-কল্পনা পুষ্ট হয়েছে স্কট-ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ-টেনিসন-ডিকেন্সের ঐতিহ্যে। ফলে আমাদের লেখকেরা মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের অনুধাবন না করে তার ভাবরূপটিকে নিয়ে মশগুল হয়েছিলেন। শুধু হয়েছিলেন না, বাংলার অধিকাংশ লেখক আজও সে মোহ কাটাতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু, এঁরা সকলেই কমবেশী এই রোমান্টিক-ভিক্টোরীয় ধারার সাধক। প্রসাদগুণের খাতিরে এঁরা জীবনের অনেকগুলো দিককেই সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। বাংলাভাষায় আজো যে যথার্থ প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস কি নাটক লেখা হল না, আমার বিশ্বাস বিচার করলে দেখা যাবে রোমান্টিক-ভিক্টোরিয় ঐতিহ্যের অনুসরণ তার জন্য অনেকখানি দায়ী।

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা হয়ত স্পষ্ট হবে। দেহকে বাদ দিয়ে মানুষের কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং মানুষ সম্বন্ধে সত্যকথা লিখতে হলে দেহের দিকে চোখ ঠারলে চলবে কেন? অথচ ইংরেজী সাহিত্যে পাঠ নিয়ে আমরা কি লেখক কি পাঠক সকলেই শরীরটাকে নিয়ে অদ্ভুত কুণ্ঠা বোধ করতে শিখেছি। ইংরেজি সাহিত্যে চিরকাল এ কুণ্ঠা ছিল না; ক্যান্টরবেরী টেলসের কবি থেকে ট্রিষ্ট্রাম শ্যাণ্ডীর ঔপন্যাসিক পর্যন্ত অনেক ইংরাজ লেখকই দেহ এবং মন সম্বন্ধে সমান কৌতূহলী ছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নানা কারণে শিক্ষিত ইংরেজের রুচিতে এক মস্ত পরিবর্তন শুরু হয় এবং ক্রমে ইংরেজি সাহিত্যে দেহ এবং বিশেষ করে দেহের আদিম প্রক্রিয়া প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কুণ্ঠা প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের শিক্ষিত জনের রুচি যে-ইংরেজের প্রভাবে গড়ে ওঠে, সে এই দেহ-কুণ্ঠিত ইংরেজ। ফলে গত দেড়শ বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিদ্যাসাগর[1] এবং দীনবন্ধু মিত্রের লেখায় ছাড়া অন্য প্রায় কোথাও দেহ সম্বন্ধে কুণ্ঠাহীন উল্লেখ চোখে পড়ে না।

এই কুণ্ঠা বোধহয় প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। একদিকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব এই কুণ্ঠাকে আমাদের শিক্ষিত মনে দৃঢ়মূল করে এবং পরে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যপ্রধান কল্পনায় এ কুণ্ঠা মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান লক্ষণরূপে প্রতিভাত হয়। নায়ক নায়িকারাও যে হাঁচেকাশে, খায়দায়, মলমূত্র ত্যাগ করে, সম্ভোগকামনার দ্বারা পীড়িত হয় এবং জ্ঞানান্বেষণ কি নীতিবোধের মত এগুলিও যে মনুষ্যত্বের সামান্য লক্ষণ—রোমান্টিক-ভিক্টোরীয় ইংরেজ-রুচির আওতায় পড়ে, মানুষ সম্বন্ধে এই নিতান্ত সাধারণ সত্যকথা আমাদের সাহিত্যিকেরা ভুলেছেন এবং পাঠকদের ভোলাবার চেষ্টা করেছেন। তার ফলে আমাদের সাহিত্যে মানুষের যে রূপটি প্রধান হয়ে উঠেছে, সেটিতে দরজির হাত যত স্পষ্ট, প্রকৃতির হাত ততটা নয়। ভাল দরজির কারিগরী নিশ্চয়ই তারিফ পাবার যোগ্য; তবু বণ্ড স্ট্রীটের দরজিরও সাধ্য নেই যে শুধু ছুঁচ সুতো আর কাঁচির জোরে একটি আস্ত জ্যান্ত মানুষ পয়দা করে। বাঙালী লেখক যতদিন এই সহজ কথাটি না হৃদয়ঙ্গম করছেন ততদিন

১। প্রবন্ধের শেষে প্রথম টীকা

তাঁর কলম আর যাই পারুক স্তাঁদালের মত উপন্যাস অথবা শেক্সপীয়র কি মোলিএরের মত নাটক রচনা করতে পারবে, এ আশা সুদূরপরাহত।

কুণ্ঠা যে সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক, আরেকদিক থেকেও একথাটি বিচার করা যেতে পারে। সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা এবং একথা সকলেই জানেন যে ভাষার বিকাশ ছাড়া সাহিত্যের বিকাশ অসম্ভব। অথচ রোমান্টিক-ভিক্টোরীয় সাহিত্য ভাষা সম্বন্ধে যে আদর্শ আমাদের লেখকদের দীক্ষিত করেছে, সে আদর্শ মেনে নিলে ভাষার বিকাশ কিছুদূর পৌঁছে স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। কেননা এই আদর্শ অনুসারে শুধু শ্লীলতার শীলমোহর দেওয়া ভাষাই সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। অথচ এই শীলমোহর দেবার যাঁরা অধিকারী তাঁরা সমাজের একটা ছোট অংশমাত্র। ফলে অধিকাংশ লোক যে ভাষায় ভাবে এবং কথা বলে তার অনেকখানিই সাহিত্যে অপাংক্তেয়। এ অবস্থায় ভাষার বিকাশ যে শুধু উপরতলার লোকেদের লেনদেনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে এ আর আশ্চর্য কি? ইংরেজের পরম সৌভাগ্য যে এ আদর্শ চালু হবার আগে শেক্সপীয়র, বেন জনসনের মত লেখক সে ভাষায় লিখে গেছেন। বাংলা গদ্যসাহিত্য সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রভাবে টেকচাঁদ, দীনবন্ধু[২] এবং হুতোমের মত স্বল্পসমর্থ লেখকেরা বাংলা গদ্যের ইতিহাস থেকে একরকম প্রায় মুছে গেছেন। পরবর্তী কালে বীরবলের চেষ্টায় বাংলা গদ্যে সাধুভাষা এবং চলতিভাষার মাঝখানের ব্যবধান কিছুটা কমল বটে, কিন্তু তিনিও শ্লীলতার মোহ কাটাতে পারেন নি।

বাংলা ভাষা নিয়ে যিনিই কারবার করেছেন তিনিই জানেন বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভাষা কত দুর্বল, কত দরিদ্র। এর অবশ্য বহু কারণ আছে; কিন্তু ভাষার শ্লীলতারক্ষা বিষয়ে আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মোহ যে তার একটা প্রধান কারণ, কজন লেখক এতাবৎ সে কথা নিজের কাছে স্বীকার করতে পেরেছেন। দেহাতীভাষা, বস্তির ভাষা, চায়ের দোকানে খেলার মাঠে হামেশাই যে ভাষা শোনা যায় সেই খিস্তির ভাষা বাংলা গদ্যসাহিত্যে আজও তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। অথচ অন্য কারো লেখার সঙ্গে যদি পরিচয় নাও থাকে এক শেক্সপীয়রের ভাষা থেকেই এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে কাব্যের এবং দর্শনের ভাষার সঙ্গে খিস্তির

২। প্রবন্ধের শেষে দ্বিতীয় টীকা

ভাষার ব্যবধান বড়জোর একচুল, এবং খিস্তির ভাষার মধ্যে কাব্য বা দর্শনের ভাষার চাইতে কম ব্যঞ্জনা লুকিয়ে নেই।[৩]

টেরেন্স বলেছিলেন, আমি মানুষ, সুতরাং মানুষের কোনকিছুই আমার অনাত্মীয় হতে পারে না। এ শুধু মানবতন্ত্রীর কথা নয়, এ খাশ সাহিত্যিকের কথা। আর মানুষ সম্বন্ধে সত্যকথা যে লিখতে চায়, ভাষার শুচিবাই তাকে ছাড়তেই হবে। ইংরেজের মারফৎ রনেসাঁসী জীবনদর্শনের সঙ্গে আংশিক পরিচয় ঘটার ফলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাঙালী গদ্যলেখকদের মধ্যে অনেকে অধ্যাত্মতত্ত্বের চর্বিত চর্বণ ছেড়ে মানুষের জাগতিক জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হতে শিখেছেন। কিন্তু এই একশ বছরেও এ কৌতূহল যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয় নি তার একটা প্রধান কারণ সে জীবনদর্শন ভিক্টোরীয় শুচিবাইয়ের প্রভাবে অনেকটা বিকৃত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছিল। ফাঁপা অভিজ্ঞতার উপরে কথার চেকনাই দিয়ে মহৎ সাহিত্য কোনদিন রচিত হয় নি। বিশ্বাসের চাইতে যুক্তি বড়, অভ্যস্ত পথে চলার চাইতে নিজের বিবেকবুদ্ধি খাটানোর দাম বেশী, মানুষ-মানুষীর সুখদুঃখ নিয়ে না লিখতে শিখলে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ইংরেজের কাছ থেকে এ তত্ত্ব শেখার ফলে বাংলা সাহিত্য-মানসের একদিন নতুন করে উজ্জীবন ঘটেছিল। কিন্তু তারপর আর আমরা খুব বেশী এগোতে পারি নি। আমরা এখনো এটা বুঝি নি যে মানুষের কথা যিনি লিখতে চান তাঁর কাছে কি ভাষা কি বিষয়বস্তু সবক্ষেত্রেই শ্লীলতার চাইতে সত্যের দাবী অনেক বেশী বড়। কুলের টান যত বড়ই হোক না কেন শ্যামের টানের কাছে তা তুচ্ছ। বাংলা ভাষায় যথার্থ মহৎ সাহিত্য তখনি সম্ভব হবে যখন রাধার মত বাঙালী লেখকেরাও ঠেকে বুঝবেন : লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।

। দুই ।

এবং আমার বিশ্বাস এই বোঝার ব্যাপারে বাঙালী লেখক ফরাসী লেখকের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারেন। কেননা রনেসাঁসের মানবতন্ত্রী সত্যসন্ধিৎসা ফরাসী সাহিত্যে যেমন পরিণত এবং প্রায় অব্যাহত প্রকাশ লাভ করেছে, তেমনটি বোধহয় আর কোন সাহিত্যে লাভ করে নি। শুরু থেকে

৩। প্রবন্ধের শেষে তৃতীয় টীকা

আজ পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্যের ঐতিহ্য এই সত্যসন্ধিৎসায় যার সমৃদ্ধ। সে সন্ধান মানুষের দেহমনের কোনো দিককেই লজ্জায় অন্ধকারে আত্মগোপন করতে দেয় নি। 'ছি ছি'র ভয়ে অন্বেষণের মুখে লাগাম টানা ফরাসী লেখকের ধাত নয়। রাবলে-মলিএরের রচনায় যে মানব-পরিক্রমা শুরু হয়েছিল কাম্যু, প্রুস্ত্, সার্ত্র্-এ পৌঁছে আজও তাতে ক্লান্তি এল না।

ফরাসী গদ্য সাহিত্যের পথকার রাবলের কথাই ধরা যাক। ১৪৯৪ সালে এঁর জন্ম—অর্থাৎ শেক্সপীয়রের সত্তর বছর আগে। মধ্যযুগের দীর্ঘ রাত সবে ফিকে হতে শুরু করেছে। কিন্তু ফরাসী চিন্তা তখনো জীবন-বিমুখ ধর্মতত্ত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন। পুরুত মোহান্তরাই তখন সমাজের সবচাইতে ক্ষমতাশালী পুরুষ। রাবলেও প্রথম যৌবনে ধর্মতত্ত্বের চর্চা করেছিলেন—কিন্তু তাঁর কুতূহলী মন মঠের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে মেনে নিতে পারল না। মঠে থাকা কালেই রনেসাঁসের নতুন যে মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছিল তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সযত্নে এবং সঙ্গোপনে তিনি গ্রীকভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করলেন; তাঁর চোখ থেকে খ্রীষ্টান আত্মনিগ্রহশীল নীতিতত্ত্বের আবরণ খসে পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন জীবনের অর্থ সম্ভোগের মধ্যে, নিগ্রহের মধ্যে নয়; সুস্থ মানুষের পক্ষে কল্পিত পাপের জন্যে কান্না হা-হুতাশ করার চাইতে তা নিয়ে কৌতুক করাটাই বেশী স্বাভাবিক। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে "ভাগ্যের অনিশ্চয়তার মুখে তুড়ি মেরে যে জন মনের ফূর্তি বজায় রাখতে পারে সে-ই যথার্থ দার্শনিক।" সেদিন একথা বলতে গেলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা ছিল। রাবলেকেও তাই রফা করে বাঁচতে হয়েছে, কিছুটা রেখে-ঢেকে বলতে হয়েছে।[৪] কিন্তু মুক্তবুদ্ধির জিজ্ঞাসাকে কে রুখতে পারে। রাবলের জিজ্ঞাসা তাঁকে মঠছাড়া করল, ঘোরাল পথে পথে, 'শহরে গ্রামে, কখনো পণ্ডিতদের জগতে, কখনো শুঁড়িখানায়। তিনি দর্শন পড়লেন, আইনকানুন পড়লেন, শেষ পর্যন্ত উত্তরতিরিশে পৌঁছে চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চা শুরু করলেন। ধর্মতত্ত্বের চাইতে শারীরতত্ত্বের মধ্যে মানুষের প্রকৃত খোঁজখবর মেলার সম্ভাবনা অনেক বেশী, সেই ধর্মান্ধতার যুগেও একথা বুঝতে তাঁর খুব বেগ পেতে হয় নি। আটত্রিশ বছর বয়সে রাবলেকে তাই আমরা দেখি লিয়ঁ শহরের হাসপাতালে প্রধান চিকিৎসকরূপে। একদিকে তিনি মধ্যযুগীয়

৪। প্রবন্ধের শেষে চতুর্থ টীকা।

টীকাভাষ্যের জঞ্জাল সরিয়ে হিপোক্রেটিস এবং গালেনের আয়ুর্বেদ বিষয়ক মূল রচনাবলীর সম্পাদনা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথার্থ ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন; অন্যদিকে রোগনির্ণয় এবং নিরাময়ের উদ্দেশ্যে নানা দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তিনি আধুনিক আয়ুর্বেদের গোড়াপত্তন করেছেন। শোনা যায় তিনি চিকিৎসক থাকা কালে লিয়ঁ শহরে মৃত্যুহার লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে যায়।

জীবন সম্বন্ধে এই অসীম কৌতূহল, জীবন সম্ভোগের এই অক্লান্ত ক্ষমতা, জীবন বিষয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অর্জিত এই বিচিত্র জ্ঞানসম্ভার নিয়ে রাবলে যখন সাহিত্যক্ষেত্রে নামলেন তখন দেখা গেল কি উপাদান সম্পদে, কি বাচনৈপুণ্যে রনেসাঁসের সেই অসামান্য সমৃদ্ধ যুগেও তাঁর জুড়ি মেলা দুষ্কর। গার্গাঁতুয়া-পাঁতাগ্রুয়েল মহা-কাহিনীর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৫৩২ সালে, চতুর্থ পর্ব ১৫৫২ সালে। সম্ভবত তার পরের বছরে রাবলের মৃত্যু ঘটে। (তাঁর মারা যাবার দশ-বারো বছর পরে এ কাহিনীর পঞ্চম পর্ব নামে যে বই বেরোয় পণ্ডিতদের মতে তার বেশীটা অনুকারকদের রচনা, রাবলের নয়।) প্রায় বিশ বছর ধরে ফাঁদা এই বিরাট গালগল্পের মধ্যে আর যাই থাক লজ্জাসঙ্কোচ কি দৈন্যকার্পণ্যের কোন চিহ্ন নেই। তাঁর কল্পনায় দুর্লভ প্রাণশক্তির সঙ্গে দুর্লভতর বৈদগ্ধ্যের মিলন ঘটেছে, ব্যাপক জ্ঞানের সঙ্গে সন্ধি ঘটেছে ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার, সুতীক্ষ্ণ দার্শনিকতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে তীক্ষ্ণতর কৌতুকবোধ। যেমন ভাব তেমনি ভাষার ব্যাপারে কোন উচিত অনুচিতের নিষেধ তিনি মানেন নি, তাঁর বিপুল অট্টহাস্যের ধাক্কায় সেসব নিষেধের গণ্ডী বুদ্বুদের মত নিমেষে ফেটে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।[৫] তত্ত্বকথাকে খিস্তির ময়ান দিয়ে সুস্বাদু এবং সুপাচ্য করতে যেমন তিনি এতটুকু ইতস্তত করেন নি, তেমনি শারীরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে দর্শন-প্রস্থানের অবতারণা করা তাঁর কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল। মোটকথা রনেসাঁসের এই মানবতন্ত্রী সত্যসন্ধিৎসাকে ঔচিত্যবোধের চাইতে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন এবং তা দিয়েছিলেন বলে বোকাচ্চিও, শেক্সপীয়র এবং সর্ভান্তিজের মতে রাবলেও দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে নিত্যতা এবং বিশ্বজনীনতা অর্জন করেছেন।

৫। প্রবন্ধের শেষে পঞ্চম টীকা।

ফরাসী সাহিত্যমানসে রাবলে যে মানবতন্ত্রী জীবনবোধের বীজ বপন করেন গত চারশ বছরে তা বিচিত্র শস্যসম্ভারে বিকাশ লাভ করেছে। তার মানে এ নয় যে রনেসাঁস-উত্তর সব ফরাসী লেখকই রাবলের প্রদর্শিত পথের যাত্রী অথবা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে অন্য কোন ধারা অবর্তমান। রাসিন, শাতোব্রিয়ঁ। কি রলাঁকে রাবলের উত্তর-সাধক বললে অবশ্যই ভুল করা হবে। মঁতাইয়ঁ-র স্মিতকৌতুকের সঙ্গে রাবলের অট্টহাস্যের যদি কোন সম্পর্ক থাকে তবে সেটি বৈপরীত্যের বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা বোধহয় একথা স্বীকার করবেন ফরাসী সাহিত্যের, বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের, যেটি মূল ধারা পাঁতাগ্রুয়েলী জীবনবোধ তার প্রধান্ উৎস। এ জীবনবোধে ভাবরূপের চাইতে অস্তিত্ব বেশী মূল্যবান, সিদ্ধান্তের চাইতে জিজ্ঞাসা বেশী প্রবল, বিচার করার চাইতে বোঝবার আগ্রহ বেশী সক্রিয়। এ জীবনবোধ সম্ভোগে সরস, কৌতুকে উজ্জ্বল, যুক্তিশীলতায় শাণিত, মুক্তির অভীপ্সায় বেগবান। মলিএরের কমেডিতে, লা-ফঁতেনের নীতিগল্পে (আসলে যেগুলো খোশ-গল্প, নীতিতত্ত্বের ছিটেফোঁটাও এদের মধ্যে বার করতে হলে অনুবীক্ষণ কষতে হয়), ভল্‌তেয়ারের ব্যঙ্গরচনা এবং দার্শনিক কাহিনীতে এবং তার চাইতেও বেশী দিদেরো-র বড়গল্পে, স্তাঁদাল বালজাক্, ক্লোদ্ তিলিএ (Mon Oncle Benjamin-এর অখ্যাত কিন্তু অসামান্য লেখক), আনাতোল ফ্রাঁস-এর উপন্যাসে এ জীবনবোধ বিচিত্ররূপে প্রস্ফুরিত হয়েছে। এঁদের প্রত্যেকেরই মেজাজ, উপজীব্য-বিষয়, রচনারীতি পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ; তবু জীবনবোধের নিগূঢ় ঐক্যে এঁরা পরস্পরের এবং রাবলের অতি নিকট-আত্মীয়। কৌতুকান্বিত সংশয়, সম্ভোগপুষ্ট বৈদগ্ধ্য, নিঃশঙ্ক জীবনজিজ্ঞাসা এবং ততোধিক নিঃসঙ্কোচ প্রকাশসামর্থ্য এঁদের প্রত্যেকের পরিণত রচনাকে সৎসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

এসব দুর্লভ গুণ শুধু যে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাবলের উত্তরসাধক তাঁদেরি রচনায় বর্তমান তা নয়। সাধারণভাবে ফরাসী সাহিত্যের প্রতি শাখা, প্রতি ধারায় যা কিছু সার্থক রচনা তার প্রায় অধিকাংশের মধ্যেই এসব গুণের একটি না একটি অথবা একত্রে সব কটির উপস্থিতি কমবেশী চোখে পড়ে। ইয়োরোপের অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ ; তবু যতদূর জানি তাদের কোনোটি সম্বন্ধেই এজাতীয় প্রস্তাব

সম্ভবত প্রমাণসহ নয়। ইংরেজী, জার্মান, নরওয়েজিয়ান কি রুশ সাহিত্যেও এসব গুণে গুণী লেখক অবশ্যই আছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সাহিত্য-ঐতিহ্যের প্রতিভূ কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। অপরপক্ষে পূর্বোক্ত গুণাবলী ফরাসী সাহিত্য-মানসের সামান্য লক্ষণ। তাই সুমিতিসাধক মঁতাইয়ঁ অত্যন্ত গুরু বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়েও হাটেবাটে চলতি নিতান্ত অসাধু, অশ্লীল অথবা গ্রাম্যভাষাকে প্রয়োজনমত কাজে লাগাতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি। তাই পাস্কালের চিন্তায় গভীর ধর্মবিশ্বাস গভীরতর সংশয়কে প্রশ্রয় দিয়েছে বিপ্লবী বিশ্বকোষ (Encyclopédie) আন্দোলনের অকুতোভয় দার্শনিক দিদেরোর সবচাইতে পরিণত রচনা "নিয়তিবাদী যাক্ এবং তার প্রভু"-র কাহিনীতে তাই অলজ্জ ইন্দ্রিয়সম্ভোগের কৌতুকদীপ্ত বিবরণ জীবন-দর্শনের আসর জুড়ে বসেছে।[৬] স্তাঁদাল তাঁর উপন্যাসে তাই গাণিতিক যুক্তিশীলতার সঙ্গে জৈববৃত্তির বেপরোয়া তাগিদকে মেলাতে পেরেছেন। এঁদের মধ্যে এক দিদেরো ছাড়া আর কাউকেই ঠিক রাবলেপন্থী বলা চলে না; তবু যে সত্যসন্ধ জীবনবোধের কথা পূর্বে বলেছি এঁদের সকলেরি রচনা সে বোধে সমৃদ্ধ। আর শুধু গদ্য নয়, ফরাসী কাব্য-ঐতিহ্যও তার বিশিষ্ট পরিণতির জন্য এই জীবনবোধের কাছে ঋণী। বোদলেয়ার, ভের্লেন, র‍্যাঁবো এবং লাফর্গ ত বটেই, এমনকি মালার্মে এবং ভালেরীও অনেকখানি এই জীবনবোধের দ্বারা প্রভাবান্বিত। শেষোক্ত দুজন সম্বন্ধে কেউ যদি আপত্তি করেন (ইংরেজ সমালোচকদের বক্তব্যের উপরে নির্ভর করলে সে আপত্তি স্বাভাবিক) তবে তাঁদের পুনরায় "ফনের অপরাহ্ণ" (L' Après-midi d'un Faune) এবং "সাপের স্কেচ" (Ébauche d'un Serpent) কবিতা দুটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।[৭]

ফরাসী সাহিত্যের মেজাজ সম্বন্ধে এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটুকু হয়ত স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে ফরাসী লেখকদের আর যে দোষই থাক ভাষা কি ভাব সম্বন্ধে শুচিবাই-এর ব্যামোতে তাঁরা ভোগেন নি। ইংরেজী-শিক্ষিত পাঠক তাতে তাঁদের বেহায়া বলতে চান বলুন; ফরাসী সাহিত্যে 'ছি-ছি সম্বল' নীতিবাগীশ এবং পেটরোগা নাবালকের পথ্য মেলা সত্যই শক্ত।

৬। প্রবন্ধের শেষে ষষ্ঠ টীকা

৭। প্রবন্ধের শেষে সপ্তম টীকা

কিন্তু ব্যাস-কালিদাস, হোমার-শেক্সপীয়রেই কি এদের পথ্য মেলা এত সহজ? মোটকথা ফরাসী লেখক জীবনের উপরে শ্লীলতার বোরখা চাপাতে নিতান্তই গররাজী; মূঢ় লজ্জার আবরণ ঘুচিয়ে অস্তিত্বকে মুক্তি দেওয়াতেই তাঁর আনন্দ। এই আনন্দ ঘোর দুঃখবাদী ফরাসী লেখকের রচনাতেও ফূর্তির স্বাদ এনেছে। গোমড়ামুখো হওয়াকেই যাঁরা দার্শনিকতার লক্ষণ মনে করেন সুকুমার রায় বর্ণিত সেই রামগরুড়সন্তানদের কাছে এ ফূর্তি অন্তঃসারহীনতার লক্ষণ বলে প্রতিভাত হবে সন্দেহ নেই; কিন্তু জীবনের কাছে পাঠ নিয়ে যাঁরা প্রকৃত বৈদগ্ধ্য অর্জন করেছেন তাঁদের কাছে একথা স্পষ্ট যে ফরাসী লেখকের কৌতুকলঘু কল্পনা আসলে তাঁর নির্ভীক জীবন-জিজ্ঞাসার একটি লক্ষণমাত্র। গত চারশ বছরে ফরাসী সাহিত্যের, বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের, যে অতুলনীয় বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই নির্ভীক, কৌতুকসরস জীবন-জিজ্ঞাসাই তার প্রধান এবং অক্ষয় উৎস।

॥ তিন ॥

বাংলাভাষাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান ব্যক্তিরা লেখা সত্ত্বেও বাংলাসাহিত্য আজো যে প্রকৃত প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করতে পারে নি, আমার বিবেচনায় শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই নিঃসঙ্কোচ জীবনজিজ্ঞাসার অভাব তার অন্যতম প্রধান কারণ। বাঙালী লেখকের ভাষা এবং ভাবনা এখনো সত্যের টানে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় জয় করতে শেখে নি। আমাদের মধ্যে যাঁরা নামজাদা লেখক তাঁদের অধিকাংশই মিহিবুলিতে মোলায়েম ভাব পরিবেশন করে খুশী। ফলে বাংলা ভাষায় 'মিষ্টি লেখা'র খুব ছড়াছড়ি—এবং যেহেতু সব দেশের মত আমাদের দেশেও পাঠকপাঠিকাদের মন লেখকদের চাইতেও অপরিণত, সেকারণে আমাদের সাহিত্যে এই মিষ্টি লেখকদের রাজত্ব এখনও অপ্রতিহত।

অবশ্য এ ধারার বিরুদ্ধে কোন বাঙালী লেখকই যে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন নি তা নয়। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা এতাবৎ প্রকৃষ্টতর ঐতিহ্যে ফলপ্রসূ হয় নি। আমাদের দেশে পাঠক, সমালোচক, এবং লেখক প্রায় সকলেই ইংরেজীশিক্ষায় শিক্ষিত এবং সে শিক্ষা যে আমাদের অনেক কিছু দেওয়া সত্ত্বেও জীবনের কোন কোন প্রধান দিক সম্বন্ধে ভীত সঙ্কুচিত করে রেখেছে—একথা পূর্বেই বলেছি। আমাদের লেখকরা বিদ্রোহ করতে যেয়েও

এই অর্জিত সঙ্কোচকে পুরোপুরি জয় করতে পারেন নি; ফলে তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত বিদ্রোহ-প্রয়াস কালক্রমে সঙ্কোচের কাছে হার মেনেছে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' এই ব্যর্থতার একটি প্রধান উদাহরণ। তাঁর পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে তিনি ক্রমেই অস্তিত্বকে খাটো করে ভাবরূপকে প্রধান করে করে তুলেছেন। 'চতুরঙ্গে' বিদ্রোহের কিছু যদি-বা আভাস আছে, 'ঘরে বাইরে' এবং 'শেষের কবিতা'য় বিশুদ্ধ ভাবরূপের একেবারে জয়জয়কার। তাছাড়া বিদ্রোহীরা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন নি এ বিদ্রোহের নির্দেশ কোন পথে, এর উৎস কোন জীবন-দর্শনে। যে পাঁতাগ্রুয়েলী জীবনবোধ ফরাসী সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে, এঁরা প্রায় কেউই সে জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হন নি। 'শেষপ্রশ্নে' তাই কথার ফেনা বিস্তর, জীবনের স্বাদ আছে কি নেই। শরৎচন্দ্রের বেশ্যারা প্রত্যেকেই এক একটি সতীলক্ষ্মী, তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতম নায়কও শুধু যে সাধুভাষায় কথা বলে তা নয়, সাধুভাষায় ভাবে, সাধু রীতিতে উচ্ছৃঙ্খল হয়। তব্ যদিবা বিদ্রোহীদের মধ্যে দু একজন যথার্থ সৎসাহসী দেখা গিয়েছিল তাঁদের অনেকেই আবার সাহিত্যকর্মে তেমন বিশেষ দড় ছিলেন না। মনের যে পরিণতির ফলে অস্তিত্বের জটিলতম অভিজ্ঞতাকে সহজে সহৃদয়-হৃদয়সম্বাদী করে তোলা যায়—জীবনের রূঢ়তম উপাদানকেও সরস করে তোলবার সেই সামর্থ্য—এঁরা অর্জন করতে পারেন নি। ফলে এঁদের রচনায় সাহিত্যের মূল্যবান উপাদান থাকা সত্ত্বেও সে রচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে নি। এঁদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। নরেশচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে দুর্লভ বলিষ্ঠতা চোখে পড়ে; কিন্তু সে বলিষ্ঠতার প্রকাশ বড় কাঁচা, বড় অমার্জিত। তাঁর ভাষায় ব্যঞ্জনা সামান্য, তাঁর ভাবনা কৌতুকরসে জারিত নয়। ফলে যদিচ এককালে তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলা লেখক-পাঠকমহলে প্রচুর আন্দোলন হয়েছিল, পরবর্তীদের মনে তিনি বিশেষ দাগ রাখতে পারেন নি।

তবে সত্যসন্ধিৎসা এবং ব্যঞ্জনানৈপুণ্যের সমন্বয় ঘটলে যে কত উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনা সম্ভব, আধুনিক কালে বাংলা ভাষায় তার যে একেবারে কোনো উদাহরণ নেই একথা বলতে পারি না। অন্তত এমন দু'জন লেখকের কথা মনে পড়ে ত্রিশের দশকে এবং চল্লিশের দশকে যাঁদের রচনায় বাংলা কথা-সাহিত্যে এক অদৃষ্টপূর্ব মহৎ সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্নদাশঙ্কর রায় কেউই ভাষার ক্ষেত্রে রবিঠাকুরী শুচিবাইএর প্রভাব

পুরোপুরি এড়াতে পারেননি ; কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী এবং উপজীব্যনির্বাচনের বৈশিষ্ট্যে অন্ততঃ তাঁদের প্রথমযুগের রচনায় তাঁরা উভয়েই দেখা দিয়েছিলেন ফরাসী কথাসাহিত্যিকদের সুযোগ্য বাঙালী উত্তরসাধক রূপে। এঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্টতা এবং প্রতীতি দুই-ই বেশী ছিল ; আর তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসামান্য কৌতুকবোধ। "প্রকৃতির পরিহাস" এবং "পুতুল নিয়ে খেলার" মধ্যে তিনি যে দুঃসাহসিক সত্যাগ্রহ, কৌতুক-প্রোজ্জ্বল শুভবুদ্ধি এবং গল্পফাঁদার অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, বাংলা গদ্যসাহিত্যে আজো তার তুলনা আমার চোখে ত' পড়ে নি। তাঁর পরবর্তীকালের রচনায় কৌতুকরস ক্রমেই ফিকে হয়ে এসেছে, তবু এখনো এই ভাঁটার সময়েও তাঁর ছোট-বড় গল্পগুলির মধ্যে এমন একটি সংস্কারমুক্ত দুঃসাহসী মনের সন্ধান পাওয়া যায় বাংলা গদ্যসাহিত্যে আজো যা নিতান্ত দুর্লভ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও অসামান্য সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন। জীবনের যে সব দিক নিয়ে ইতিপূর্বে বাঙালী লেখকেরা লেখেন নি, লিখতে চান নি, লিখতে গিয়ে হয় পিছিয়ে এসেছেন আর না হয় সে লেখাকে সাহিত্যের স্তরে ওঠাতে পারেন নি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গোড়াতেই সেই দিকগুলিকে তাঁর লেখার মূল উপজীব্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, তাদের রূপান্তরিত করেছিলেন কথাসাহিত্যের সার্থক উপাদানে। শুধু সততার সামর্থ্যে নরেশ সেনগুপ্ত যা পারেন নি, বৈদগ্ধ্যের সম্পদে তিনি তা পারলেন। মনোবিকলনের জ্ঞান জীবন সম্বন্ধে বাঙালী সাহিত্যিকের তৃতীয় দৃষ্টি খুলে দিল। কিন্তু মাণিকের জীবনজিজ্ঞাসার মধ্যে আস্তিক্য বড় কম ছিল। সম্ভবত সে কারণেই যে সত্যাগ্রহ নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাকে তিনি টিঁকিয়ে রাখতে পারলেন না। তাঁর শেষ সার্থক রচনা বোধহয় "অহিংসা"। মনের মধ্যে প্রত্যয় না থাকায় অবশেষে বাইরের প্রত্যয়ে তাঁকে আশ্রয় খুঁজতে হল ; মতবাদের মারাত্মক ব্যাধি শেষ পর্যন্ত তাঁর মুক্তবুদ্ধিকে জীর্ণ করে ফেলল। লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফুরিয়ে গেলেন। শেষের দিকে তিনি যা লিখেছেন তার অধিকাংশই অবিশ্বাস্য রকমের কাঁচা। একটি মহৎ প্রতিভার এজাতীয় আত্মহত্যার তুলনা শুধু বাংলা ভাষায় নয়, অন্য কোনো ভাষাতেও সচরাচর চোখে পড়ে না।

আশ্চর্য এই যে তাঁদের প্রতিভার বলিষ্ঠতম প্রকাশের কালেও অন্নদাশঙ্কর

এবং মানিক কি বাঙালী লেখক কী বাঙালী পাঠক কারো উপরে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেন নি। সুধীমহলে বাহবা কিছুটা পেয়েছেন, কিন্তু সাধারণ মহলে স্বীকৃতি পান নি। ফলে তাঁদের লেখা বাংলা সাহিত্যের মেজাজ কোনো লক্ষণীয় রূপান্তর আনতে পারল না। হয়ত যতটা প্রতিভা থাকলে একটি ঐতিহ্যের ধারা পালটে নতুন ঐতিহ্যের প্রবর্তন করা যায় তা তাঁদের ছিল না; তাঁরা নিজেরা অবসিত হলেন, কিন্তু আমদের জীবনবোধ জাগ্রত হল না। আমাদের জীবনবিমুখ ভাবাবিষ্ট মনোভাবের প্রশ্রয়ে যেসব লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের মাতব্বর হয়ে উঠলেন তাঁদের লেখায় না রইল নির্মোহ যুক্তির দীপ্তি না নির্ভীক মুক্তির অভীপ্সা। আজকের বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের রুচি এবং বাঙালী লেখক লেখিকাদের মেজাজের হদিশ অন্নদাশঙ্কর রায় কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতে মিলবে না। তার হদিশ মিলবে যাঁদের লেখায় তাঁদের প্রতিন্যাস জীবনবিমুখ এবং ন্যাকামি, বোকামিঠাসা গল্প উপন্যাস রচনায় তাঁরা সিদ্ধহস্ত।

ফলত যে অকুণ্ঠ জীবনবোধ ফরাসী সাহিত্যের অতুল বৈভবের উৎস, বাংলা সাহিত্যে আজো তা ভালো করে শেকড় গাড়তে পারেনি। অথচ বাংলা সাহিত্যকে যদি পরিণত সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে হয়, তবে বাঙালী লেখককে এ বোধ অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আমার ধারণা ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় এই আত্মপ্রস্তুতির ব্যাপারে বাঙালী লেখককে সাহায্য করতে পারে। বহুকাল আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা যে তেমন ফলবতী হয় নি তার একটা প্রধান কারণ বোধহয় এই যে কি তাঁর বাছাইএ, কি তাঁর অনুবাদে ফরাসীর বিশিষ্ট মেজাজটি ঠিক ধরা দেয় নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত ফরাসী কবিতায় ভাবানুবাদ বিষয়েও সেই একই অভিযোগ আরো বেশী যথার্থতার সঙ্গে করা চলে। তবে প্রমথ চৌধুরী ফরাসীর অনেকখানি অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্য যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে শুধু "চারইয়ারি কথা" কি বীরবলের প্রবন্ধাবলী নয়, পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যের বিকাশ তার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু চৌধুরীমশাইএর অন্তরঙ্গতাও ফরাসী সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার মধ্যে আবদ্ধ ছিল; মঁতাইয়্‌-কে পেরিয়ে রাবলের জগতে তিনিও প্রবেশ করতে

পারেন নি। ঠাকুরবাড়ির শ্লীলতাবোধ সম্ভবতঃ সে প্রবেশের পথে বাধা হয়েছিল।

ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী লেখক এবং পাঠকের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটাতে হলে সে সাহিত্য সম্বন্ধে বাংলায় বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার— এবং তার চাইতেও বেশী দরকার সে সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ মূল থেকে বাংলায় তার তর্জমা করা। তার দ্বারা শুধু পাঠকসম্প্রদায় নয়, লেখকসম্প্রদায়ও প্রভূত উপকৃত হবেন। তবে একটা কথা কোন রকমেই ভুললে চলবে না। জীবনবোধের আদি এবং অক্ষয় উৎস বই নয়, জীবন নিজে। সাহিত্য চোখের ঠুলি খসাতে পারে, কিন্তু চোখে দৃষ্টি দিতে পারে না। আমাদের লেখকরা যতদিন না জীবনের বিদ্যালয়ে পাঠ নিতে শিখছেন ততদিন তাঁদের বিদগ্ধ লেখকে পরিণত করে এ সাধ্য কারো নেই—না সে শেক্সপীয়রের না রাবলের।[৮]

৮। প্রবন্ধের শেষে অষ্টম টীকা

---

(১) বাঙলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথার্থ স্থান নিরূপণের এখন পর্যন্ত চেষ্টা হয়নি। তাঁর সম্বন্ধে অধিকাংশ আলোচনায় ভক্তির ভার যতবেশী, বিশ্লেষণের চেষ্টা তত কম। ফলে তাঁকে "অশ্লীল লেখক" বলে অভিহিত করলে অনেক পাঠকই চটে উঠে প্রতিবাদ করবেন। আমাদের সৌভাগ্যবশত তাঁর বিদ্যা আধুনিক কালের শিক্ষিতদের মত শুধু ইংরেজির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; তাঁর রুচি মুখ্যত সংস্কৃত সাহিত্য থেকে পুষ্টি আহরণ করেছিল। এবং সংস্কৃত লেখকদের আর যে ত্রুটিই থাক দেহ সম্বন্ধে কোন শুচিবাই ছিল না। বিদ্যাসাগর মশায়ের সমাজ-সংস্কার বিষয়ক রচনাবলী যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরাই লক্ষ্য করে থাকবেন যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এই সত্যসন্ধ মানুষটি কোন রকম ভদ্রতার আব্রু রাখেননি। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ সম্পর্কে আলোচনায় একথাটি স্পষ্ট যে শাস্ত্র অথবা দেশাচারের ধর্মকে শরীরের ধর্ম পালটায় না শুধু প্রবৃত্তির সুড়ঙ্গের অন্ধকারে চরিতার্থতা হাতড়ে বেড়ায়। হিন্দুসমাজে ব্যাভিচার এবং ভ্রূণহত্যার প্রাবল্য যে আসলে নৈতিক ভণ্ডামীর ফল, এ সত্য তাঁর মত নিঃসংকোচে আজ পর্যন্ত আর কেউ আলোচনা করেনি।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত আছে। তাঁর ভাষা নাকি "একান্তভাবেই সংস্কৃতঘেঁষা এবং সে কারণে গতিহীনা"। বাংলা সাহিত্যে কথ্য-ভাষার আমদানী করে সে ভাষার গতি যাঁরা বাড়াবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে টেকচাঁদ, হুতোম, বীরবলের নাম সকলেই জানেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাইও যে তাঁর লেখায় প্রচুর আরবী ফারসী এবং দেশজ কথা ব্যবহার করেছেন এটা অতি অল্প লোকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। আসলে বিদ্যাসাগরের

খোশমেজাজী লেখার সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় অল্প। "অতি অল্প হইল" এবং "আবার অতি অল্প হইল" থেকে দুচারটে নমুনা দিলে পাঠকেরা হয়ত আন্দাজ করতে পারবেন ভাষার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর কত মুক্তবুদ্ধি ছিলেন। বেহদ্দা পণ্ডিত, 'দেদার ভুল', 'ছরকট করিয়াছেন,' 'সংস্কৃত বিদ্যায় কাজিল', গোমুখ্যু বুদ্ধি' 'বেয়াড়া খ্যাতি,' 'রঙ্‌দার', 'বিদকুটে', 'ভুয়াক্কা' 'দিলদরিয়া', 'তুখড় ইয়ার' 'ঝকমারি', 'কেঁসেড়া', 'কসরতা', 'জালসাজী', 'খোজাখৎ বুদ্ধি', 'চলাইয়াছেন'—এসব বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত শব্দ। তিনি নিজেই লিখেছেন "লোকে জানে আমার চালাকি ও ফচকিয়ামি আসে না। "তিনি প্রচুর প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন; এই শব্দ-সংগ্রহ তাঁর মৃত্যুর পরে "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়।

(২) বাংলা গদ্যের আলোচনায় টেকচাঁদ এবং হুতোমের তবু নাম করা হয়, কিন্তু দীনবন্ধু এখনো পর্যন্ত অবজ্ঞাত রয়ে গেছেন। অথচ কি ভাষা, কি উপজীব্য উভয় দিক থেকে বাংলা গদ্য সাহিত্যে দীনবন্ধুর দুঃসাহতিকতার তুলনা মেলা কঠিন। দীনবন্ধু প্রথম শ্রেণীর লেখক নন; যেখানে তিনি সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন সেখানে তিনি প্রায় অপাঠ্য; তাঁর কল্পনা সীমাবদ্ধ। তবু যেখানে তাঁর বিশিষ্টতা সেখানে তিনি আজো বাঙালী লেখকদের মধ্যে অদ্বিতীয়। শিক্ষিত সমাজ যাদের অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখেছে, গ্রামের সেই অশিক্ষিত মানুষদের তিনি যত সহজে সাহিত্যে স্বাগত করতে পেরেছেন, তাঁর পরে এই সত্তর-আশি বছরের মধ্যে আর কোনো লেখক তা পারলেন না,—না রবীন্দ্রনাথ, না শরৎচন্দ্র, না তারাশঙ্কর, না বিভূতিভূষণ, না মানিক বাঁড়ুয্যে। এবং যখনি তিনি সাধুভাষা ছেড়ে কথ্যভাষায় লিখেছেন তখনি তাঁর গদ্যে এমন এক বলিষ্ঠ গতিশীল, স্বতঃস্ফূর্ত সত্যবোধের স্বাদ এসেছে যার পাশে টেকচাঁদ ও হুতোমকে ম্লান এবং বীরবলকে কৃত্রিম ঠেকে। "নীল দর্পণ-এর তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কের ভাষা এরই প্রমাণিক উদাহরণ।

ক্ষেত্র—ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও, পদী পিসীর সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটিয়ে দাও; আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না। (হস্ত ধরিয়া টানিল) ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা: হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও, তুমি মোর বাবা।

রোগ—তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে; আমি কোন কথায় দিতে পারি না। বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র—মোর ছেলে মরে যাবে—দই সাহেব—মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতী।

রোগ—তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না। (বস্ত্র ধরিয়া টানিল)।

ক্ষেত্র—ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটা করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও।

স্বভাবতই এ ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হয়নি। দীনবন্ধুর জীবনী এবং কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে তিনি দীনবন্ধুর রুচির দোষের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে একথাও স্বীকার করেছেন যে এ দোষ ইচ্ছাকৃত নয়, তিনি তাঁর তীব্র সহানুভূতির অধীন ছিলেন বলেই এ দোষ ঘটেছে। বঙ্কিম 'সধবার একাদশীর' পাণ্ডুলিপি পড়ে দীনবন্ধুকে জানিয়েছিলেন যে ঐ প্রহসন "বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে" এবং সে কারণে অনুরোধ করেছিলেন যে, "ইহার বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয়।" বাংলা সাহিত্যের জোর বরাত দীনবন্ধু শেষ পর্যন্ত বন্ধুর সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি।

(৩) এ কথায় যদি কারো আপত্তি থাকে তবে তাঁকে "হ্যামলেট", তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য স্মরণ করতে বলি :

Queen ; Come hither, my good Hamlet, sit by me.
Hamlet : No, good mother, here's metal more attractive.
Polonius : O, ho, do you mark that ?
Hamlet : Lady, shall I lie in your lap ?
Ophelia : No, my lord.
Hamlet : I mean, my head upon your lap ?
Ophelia : Ay, my lord,
Hamlet : Do you think I meant country matters ?
Ophelia : I think nothing, my lord.
Hamlet : That's a fair thought to lie between maid's legs.

দার্শনিক যুবরাজের মুখে এ জাতীয় ভাষা দিতে শেক্সপীয়রের এতটুকু সঙ্কোচ হয়নি। ঐ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে "To be or not to be" বিখ্যাত স্বগতোক্তির ঠিক পরেই হ্যামলেট-ওফেলিয়ার কথোপকথন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ফলস্টাফ, ইয়াগো, উন্মাদ লীয়ার—এদের ভাষা কিম্বা ভাবনায় কি কোন শ্লীলতার আব্রু আছে? শুধু কি তাই। হ্যামলেট নাটকের করুণতম মুহূর্তে নিষ্পাপ কিশোরী ওফেলিয়াকে দিয়ে শেক্সপীয়র কি গান গাইয়েছেন (চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।) :

Quoth she, before you tumbled me,
You promis'd me to wed.
So would I ha' done, by yonder sun
An thou hadst not come to my bed.

"ওথেলো," চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে ডেসডিমোনার "Sing willow, willow, willow" গানের অসমাপ্ত শেষ চরণটি নাট্যকার অকারণে ও গানে বসান নি:, "If I court moe women, you'll couch with moe men". ইংরেজি শিক্ষিত কোনো বাঙালী নাট্যকার কি তরুণী নায়িকার মুখে "tumble" বা "couch with" জাতীয় ভাষা দিতে পারেন? তবু ত এ তরুণীর ভাষা। যেখানে সে বাধা নেই মহাকবি সেখানে আর কোনো রেয়াৎ করেননি :

Even now, now, very now, an old black ram
Is tupping your white ewe.

("ওথেলো," প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।)

এর বাংলা যদি কেউ করতে পারতেন, তবে সে এক দীনবন্ধু মিত্র।

(৪) রফা করেই কি সব সময়ে রেহাই মিলেছে। যৌবনে মঠে থাকা কালে কর্তৃপক্ষ টের পান যে তিনি গোপনে গ্রীকভাষা চর্চা করছেন, ফলে তাঁর নিজস্ব গ্রীক গ্রন্থসংগ্রহ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরবর্তীকালে গার্গাঁতুয়া-পাঁতাগ্রুয়া-পাঁতাগ্রুয়েল কাহিনীর এক এক খণ্ড যেমন যেমন বেরিয়েছে আর অমনি সর্বনর অসীম ক্ষমতাশালী কর্তারা তার প্রকাশ এবং প্রচার নিষিদ্ধ করেছেন। তবু যে তাঁকে খুব বেশী ভুগতে হয়নি তার কারণ পারীর বিশপ ছিলেন তাঁর একজন মস্ত সমঝদার পৃষ্ঠপোষক। এঁরি খাতিরে পোপ রাবলেকে ক্ষমা করেন এবং রাজা নিজে তাঁকে তাঁর বই ছাপানোর জন্যে বিশেষ অনুমতি দান করেন।

(৫) গার্গাঁতুয়া, প্রথম খণ্ড "পাঠকের প্রতি" :

One inch of joy surmounts of grief a span

Because to laugh is proper to the man

(Sir Thomas Urquhart-এর অনুবাদ ।)

(৬) *Jacques le fataliste et son maître* দিদেরের জীবিতকালে প্রকাশিত হয়নি। এবং একথা অবিশ্বাস্য ঠেকলেও যতদূর জানি বিশ্ব-সাহিত্যের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রথম ইংরেজী পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হতে দুশো বছর লেগেছে। অথচ এ বই গোয়েটে এবং শিলারকে মুগ্ধ করেছিল : এর অন্তর্নিহিত বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীকে মার্কস্ এবং এঙ্গেল্‌স্ সোচ্ছ্বাসে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন ; এবং ফরাসী-বিপ্লবের জীবন দর্শন যে এই আপাতদৃষ্টিতে অতি অশ্লীল উপন্যাসটিতে কত পরিণত প্রকাশ লাভ করেছে তা বর্তমান শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতন্ত্রী দার্শনিক কাসিরের সাহেবের নজর এড়ায়নি।

(৭) বাংলাভাষায় দুটি কবিতারই সার্থক কাব্যানুবাদ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'কনের দিবাস্বপ্ন ও "আদিনাগ"।

(৮) এই প্রবন্ধটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় আমার গুরুস্থানীয় দুই সাহিত্যিক এ সম্পর্কে আমাকে দুটি পত্র লেখেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণ করিয়ে দেন সাহিত্যের ভাষা ব্যঞ্জনাময় এবং সেকারণে পড়ে পাওয়া ইতরজনের ভাষায় সাহিত্যের কাজ চলেনা। একথা আমি মানি, কিন্তু প্রচলিত ভাষা থেকেই যখন সাহিত্যিক উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন তখন তাঁর আহরণ শুধু সংস্কৃতের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং প্রাকৃতকে পরিহার করবে, এ নীতি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ঠেকেনা। উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে নয়, সংগৃহীত উপাদানের বিশিষ্ট এবং ব্যঞ্জিত প্রয়োগ ঘটিয়েই সাহিত্যিক তাঁর কারিগরির যথার্থ প্রমাণ দিতে পারেন।

দ্বিতীয় পত্রটি লেখেন রাজশেখর বসু এবং এটি তাঁর অনুমতি ক্রমে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল। শ্লীলতার ধারণা বিভিন্ন দেশেকালে পালটালেও শ্লীলতাবোধ সভ্যসমাজের পক্ষে অপরিহার্য, এবং সৎসাহিত্য সে কারণে শ্লীলতার নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারেনা। আমি সাহিত্যকে স্রেফ সামাজিক ক্রিয়া রূপে দেখিনা। ব্যক্তি সমাজের চাইতে মূল্যবান এবং ব্যক্তির অন্তর্লোক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। সমাজের চাপে ব্যক্তি তার জীবনের অনেকখানিই ঢাকা দিয়ে রাখতে বাধ্য হয়—শুধু অপরের দৃষ্টি থেকে নয়, নিজের দৃষ্টি থেকেও। সাহিত্য এই আবরণ মোচন করে। শ্লীলতার নির্দেশ তাই সাহিত্যিকের কাছে অগ্রাহ্য। সাহিত্য শুধু ফুল-ফলের বেসাতি করেনা, মাটির নীচে শিকড়ের খোঁজ-ও রাখে।

তাছাড়া সাহিত্যিক কোন শ্লীলতার নির্দেশ মানবেন ? তাঁর যুগের এবং সমাজের ? ছাপোষা কেরানীর মত ? সমাজ সংস্কারক অথবা রাষ্ট্রবিপ্লবীর যেটুকু অধিকার আছে তাও তাঁর নেই ? রাজশেখর বাবুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর চিঠির বক্তব্য সেদিন মানতে পারিনি, এত বছর পরেও মানা গেলনা।

সমকালীন বাংলা উপন্যাসে মননবিমুখতা

একথা সকলেই মেনে থাকেন, যা চোখে পড়ে বা কানে শোনা যায় তারি শুধু হুবহু প্রতিফলন কিংবা অনুলিখন ভালো রিপোর্টারের কাজ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক হতে গেলে আরও অনেকগুলি গুণ থাকা দরকার। সাহিত্যের কারবার মানুষের মন নিয়ে, এবং মনের অনেকটাই বাইরের ব্যবহারে প্রকাশ পায় না, অনুমান করে নিতে হয়। যাও-বা প্রকাশ পায় তারো অনেকখানি নজর এড়ায়, যদি-না দেখিয়ে মানুষটি অনুশীলিত চোখের অধিকারী হন। এই দৃশ্যের আড়ালে অদৃশ্যকে অনুমান করার, প্রতিটি মানবীয় ঘটনা বা আচরণের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ লক্ষ্য করার সামর্থ্য সাহিত্যিকের অন্যতম লক্ষণ। অপর পক্ষে, যদিচ বিশেষ ঘটনা এবং অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেই সাহিত্য-কল্পনা প্রকাশ পায়, তবু বিশেষের মধ্যে সামান্যকে আবিষ্কার না করা পর্যন্ত সে-ঘটনা বা অভিজ্ঞতা সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠতে পারে না। যা বিশেষ তা সামান্যতার আলোকে অর্থসঙ্গতি অর্জন করে। তৃতীয়ত, সাহিত্যের যেটি মাধ্যম সেই ভাষার সামর্থ্য শুধু অভিধানিক অর্থের মধ্যে নিঃশেষিত নয়। সাহিত্য যে শিল্পকর্ম সেটি প্রধানত প্রকাশ পায় যখন নিপুণ প্রয়োগের ফলে ভাষাতে ব্যঞ্জনার সঞ্চার ঘটে। অর্থাৎ সাহিত্যিক একাধারে মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং শব্দশিল্পী।

সাহিত্যের এই ত্রিবিধ লক্ষণই মননক্রিয়ার পরিচায়ক। প্রেরণা নামে রহস্যময় শক্তির অধিকারী না হলে হয়ত সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শুধু প্রেরণার জোরেই বোধহয় কেউ সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন না। সাহিত্য-সম্ভোগের মত সাহিত্যসৃষ্টিও অনুশীলন সাপেক্ষ। যে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে একটি অভিজ্ঞতা অথবা ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করে সেটি সচেতন নাও হতে পারে; কিন্তু সেই প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য তার পূর্বে অভিজ্ঞতা, ভাবনা এবং ভাষা বিষয়ে চর্চা অপরিহার্য। এমনকি সাহিত্যের যেটি সবচাইতে বিশুদ্ধতম শিল্পরূপ সেই লিরিক কবিতার ক্ষেত্রেও মননক্রিয়ার অংশ বড় কম নয়। লিরিক কবিকেও পূর্বসূরীদের কবিকর্ম থেকে পাঠ নিতে হয়, রচনা-শৈলী শিখতে হয়, স্বতঃস্ফূর্তির প্রয়োজনেই দীর্ঘ সাধনার দ্বারা প্রকাশরীতিতে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়। ঠিক কথাটি, ঠিক ছবিটি, ঠিক ছন্দটি

আপনা থেকেই ধরা দেয় না। লিরিক শিল্পীও তাই স্রেফ প্রেরণার উপরে নির্ভর না করে নিজের লেখা নিজেই সচেতন প্রযত্নের সঙ্গে মার্জনা করেন।

কথাটা বোঝবার জন্য মালার্মের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিস্তর উদাহরণ রেখে গেছেন। "দুঃসময়" কবিতাটির আদি রূপের সঙ্গে পরিবর্তিত রূপের তুলনা করলেই লিরিক কবিতায় মননের অংশ কতখানি তা স্পষ্ট হবে।[১] কবি প্রেরণার বশে প্রথমে যে কবিতাটি লিখেছিলেন তার ভাষা ছিল অনেকটা এলানো, এবং তার রস ছিল কিছুটা ফিকে। তাঁর আরো বহু কবিতার যা প্রয়োজন ছিল অথচ সব ক্ষেত্রে যা জোটে নি, সৌভাগ্যবশত এই কবিতাটি তা পেয়েছিল: সেটি হল কবির নিজের হাতে সুনিপুণ এবং নিষ্ঠুর পরিশোধন। মূলে প্রথম পংক্তির শেষ দুটি শব্দ ছিল "মন্দ পদে"। কেটে করলেন "মন্দ চরণে"। তারপর "শ্রান্ত মন্থরে" এবং সর্বশেষে তাও বদলে "মন্দ মন্থরে"। সম্ভবত এই পরিবর্তনের ফলেই কবিতাটিকে ঢেলে সাজাতে হল। গীত-গোবিন্দ-ঘেঁসা অংশগুলি কবি নির্মম ভাবে ছেঁটে ফেললেন। নববসন্ত, পঞ্চমরাগ, পঞ্চশায়ক, স্খলদঞ্চলা যুবতী, আকুল কোকিল, কিন্নরীকুল, ফুলচন্দন, নবদম্পতির কম্পিত বাহুবন্ধন ইত্যাদি সব অবান্তর হয়ে ঝরে পড়ল। পরিবর্তে প্রধান হয়ে উঠল সুচির-শর্বরী, স্তব্ধ আসনে বিশ্ব-জগতের প্রহরগোনার ছবি, ঊর্ধ্বাকাশে অঙ্গুলিমেলা তারার দল, ঊষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা মহানভ-অঙ্গন। ফলে রসে এল গাঢ়তা, কেন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা ধৃত হল উপযোগী চিত্রকল্পে, কল্পনার কাঠামোয় এল দৃঢ়তা এবং সৌষম্য। শেষে কবিতাটির নাম পর্যন্ত পালটে হল "স্বর্গ-[illegible]" থেকে "দুঃসময়"।

ফলত বিজ্ঞান এবং দর্শনের মত সাহিত্যও মননক্রিয়া ছাড়া অকল্পনীয়। এবং আমার বিশ্বাস সাহিত্যের যে রূপটিতে মননক্রিয়ার স্থান সবচাইতে সুপ্রতিষ্ঠিত সেটি হল উপন্যাস। ইয়োরোপে উপন্যাসের জন্মকালে তার অসামান্য সম্ভাবনা ধরা পড়ে নি। ডিফো কিম্বা রিচার্ডসন জাতীয় লেখকরা ছিলেন আসলে কাহিনীকার। কিন্তু ক্রমেই সামর্থ্যসম্পদ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। লিরিক কবির কল্পনা নিজের অভিজ্ঞতার আরশীতে মানবীয় অনুভবের বিচিত্র রূপকে প্রতিফলিত করে; নাট্যকার এবং

১। প্রবন্ধের শেষে প্রথম টীকা

কাহিনীকার মুখ্যত ঘটনাপ্রবাহের বাহ্যরূপের মধ্যে অন্তর জগতের ইঙ্গিত দেবার প্রয়াসী। ঔপন্যাসিক অন্তর এবং বাহির, ব্যক্তি এবং সমাজ, নিজের কাল এবং সর্বকাল, গূঢ়তম অনুভূতি এবং জটিলতম চিন্তাপ্রবাহ—সব কিছুকেই তাঁর শিল্পরূপের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। অপরোক্ষ অনুভূতির সঙ্গে পরোক্ষ বিশ্লেষণ, কাহিনীর ধারাবাহিকতার সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসা এবং তত্ত্ববিচার—তাঁর কাছে কিছুই অপাংক্তেয় নয়। ফলে উপন্যাসের মধ্যে মানব অস্তিত্বের যতখানি ব্যাপক এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্বেষণ ও উদ্ঘাটন সম্ভব, অন্য যে-কোন শিল্পরূপেরই তা অনায়ত্ত। এবং এই সম্ভাবনাই উপন্যাসে মননশীলতার প্রাধান্যের মূল হেতু।

আঠারো শতকের শেষদিক থেকে উপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য পশ্চিমদেশে স্বীকৃতি পেতে সুরু করে। বিজ্ঞান না-হয়েও উপন্যাস সর্বগ্রাসী; দর্শন না-হয়েও উপন্যাস তত্ত্বকেন্দ্রিক। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে কাহিনী এবং চরিত্র ছাড়া উপন্যাস হয় না। কিন্তু শুধু কাহিনী ফেঁদে এবং চরিত্র সৃষ্টি করে ক্ষমতাবান ঔপন্যাসিক তৃপ্তি পান না। মানব অস্তিত্বের বিচিত্র দিক এবং নানা নিত্য সমস্যা নিয়ে তিনি ভাবতে এবং ভাবাতে চান। সাহিত্যের যে বিশেষ রূপটির তিনি সাধক তার মধ্যে এই ভাবনার সুযোগ অফুরন্ত। মহাকাব্যের যুগে কবিদেরও এ সুযোগ ছিল; মহাভারত এবং ডিভাইন কমেডি তার সার্থক প্রমাণ। আধুনিক কালে উপন্যাস এই সুযোগ এবং দায়িত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছে। যতদূর মনে করতে পারি ইংরেজী ভাষায় এ সুযোগের প্রথম সদ্ব্যবহার করেন স্টর্ণ তাঁর "ট্রিষ্ট্রাম শ্যাণ্ডী" উপন্যাসে, জার্মান ভাষায় গোয়েটে তাঁর "হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্টারে", ফরাসী ভাষায় প্রথম দিদেরো এবং তারপর কঁস্তাঁ, রুশ সাহিত্যে গোগোল তাঁর "ডেড্‌ সোল্‌স্‌"-এ। এঁদের হাতে উপন্যাস শুধু আর ফেনানো ফাঁপানো বড়গল্প হয়ে রইল না; বহুবাচনিক অস্তিত্বের বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন ঔপন্যাসিকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হয়ে উঠল। এঁরা যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন গত একশো দেড়শো বছর তারি অনুসরণ করে উপন্যাস আধুনিক সাহিত্যের সবচাইতে সমৃদ্ধ শাখা হয়ে উঠেছে। টুর্গেনিফ্, ডস্টয়েভ্‌স্কি এবং টলস্টয়, স্তাঁদাল, বাল্‌জাক্ এবং ফ্লোবেয়ার,—এঁদের বৈদগ্ধ্য, কলানৈপুণ্য এবং নাচিকেত প্রশ্নশীলতার জারকরসে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, নীতিবিচার, ইতিহাস, শিল্পশাস্ত্র, সব কিছুই উপন্যাসে ব্যবহারযোগ্যতা অর্জন করল। এঁদের সুযোগ্য উত্তরসূরী হলেন মার্সেল প্রুস্ত্,

টমাস মান, ক্রানৎজ, কাফ্‌কা, জেমস্‌ জয়েস, ভর্জিনিয়া উলফ্‌, উইলিয়ম ফক্‌নার, নিকস কাজানৎজাকিস, বরিস পাস্টারনাক, আল্‌বেয়ার কামু, জাঁ-পল সার্ত্র প্রভৃতি। এঁরা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে একদিকে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের অন্তঃস্তল পর্যন্ত অনুসন্ধান করেছেন, অন্যদিকে সর্বমানবীয় সত্তার কল্পনাকে নতুন নতুন দিক থেকে পুনর্বিচার করেছেন। এ কাজের জন্য এঁদের বিস্তর দেখতে হয়েছে, পড়তে হয়েছে, জানতে হয়েছে, ভাবতে হয়েছে। যাঁরা অবসর বিনোদনের জন্য মোলায়েম সুখপাঠ্য কাহিনীর খোঁজ করেন, এঁদের রচনা তাঁদের উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নি! এঁদের উপন্যাসের যথার্থ উপভোগের জন্য পাঠকের নিজের যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন। গোয়েটে বলেছিলেন নাটক কিংবা রঙ্গালয় শিশুর জন্য নয়। সে কথার-ই প্রতিধ্বনি করে বলা চলে, চিন্তাশীল পাঠকই সার্থকউপন্যাসের যথার্থ ভোক্তা। যাঁরা অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে অপারগ অথবা যাঁদের কল্পনা তত্ত্বজিজ্ঞাসায় সাড়া দেয় না, তাঁদের জন্য রইল গল্প, কাহিনী, রূপকথা কিম্বা রোম্যান্স।

॥ দুই ॥

চিন্তাশীলতা যে ঔপন্যাসিক কল্পনার মোটেই প্রতিবন্ধক নয়, বরং তার পোষক এবং বর্ধক, বাংলা ভাষার যিনি প্রথম যথার্থ গদ্যশিল্পী সেই বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাটি খুব ভালভাবেই জানতেন। তিনি শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র অথবা সমাজতত্ত্ব বিষয়ে নানা মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন নি; তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তিনি এসব বিষয়ে ভাবনা ও আলোচনাকে কাহিনীর অঙ্গীভূত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তার চাইতেও বড় কথা, তাঁর প্রধান কয়েকটি উপন্যাস স্পষ্টত তত্ত্বকেন্দ্রিক। বিশদ গল্পবলার শিল্পে বঙ্কিম মোটেই অপটু ছিলেন না; তার প্রমাণ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, ইন্দিরা এবং রাজসিংহ। কিন্তু যেখানে তিনি ঔপন্যাসিক সেখানে তাঁর কল্পনা শুধু ঘটনাবিন্যাস করেই পরিতৃপ্ত হয় নি, কাহিনীর সূত্রে মানবীয় অস্তিত্বের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নেরও প্রচেষ্টা করেছে। দুর্গেশনন্দিনীতে এ প্রচেষ্টার ক্ষীণ আভাস আছে। কপালকুণ্ডলাতে এটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর। কিন্তু এটিই কাহিনীর শক্তিকেন্দ্র হয়ে উঠেছে বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম এই উপন্যাস কটিতে। এদের মধ্যে বঙ্কিম যুগপৎ কাহিনীকার,

মনস্তাত্বিক এবং দার্শনিক। তিনি শুধু চরিত্র এবং ঘটনার উদ্ভাবন করেন নি; অস্তিত্বের নানা জটিল সমস্যা ও সংঘাতের বিচার বিশ্লেষণ করে গভীর একাগ্রতার সঙ্গে একটি জীবনাদর্শন গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।

স্বীকার না করে উপায় নেই যে বঙ্কিমের এই জীবন দর্শনের অনেকটাই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ঠেকে না। তা সত্বেও তাঁকে আমি মহৎ ঔপন্যাসিক বলে মানি। তার কারণ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে দার্শনিক সিদ্ধান্তের চাইতে কল্পনাবিধৃত মনস্বিতা অনেক প্রবল। অর্থাৎ তাঁর নৈতিক প্রত্যয় যা-ই হোক না কেন, তাঁর কাহিনীর কেন্দ্রে জিজ্ঞাসার উপস্থিতি উপন্যাসকে বহুক্ষেত্রে মত-প্রচারের স্থূলতা থেকে রক্ষা করেছে। এদিক থেকে আনন্দমঠ এবং দেবীচৌধুরাণী উপন্যাস হিসেবে কিছুটা দুর্বল, কারণ এখানে তত্ত্ব অনেক সময় কাহিনীর কেন্দ্র থেকে সরে এসে কাহিনীর উপরে বোঝা হবার উপক্রম করেছে। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কাহিনী-দেহে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা এখানে রক্তস্রোতের মত প্রবহমান। দার্শনিকতা এখানে প্রচারে পর্যবসিত না হয়ে উজ্জ্বল কৌতুকে বিচ্ছুরিত।

যা-ই হোক, বঙ্কিম তাঁর তিরিশ বছরব্যাপী সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়ে মননশীলতাকে ঔপন্যাসিক কল্পনার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরই অনুগামী বলা চলে। পরিণত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বঙ্কিমী জীবনদর্শন থেকে অনেকটা পৃথক, শেষ পর্যন্ত প্রায় তার বিপরীত। সমাজানুগত্য এবং শাস্ত্রীয় নির্দেশের চাইতে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশকে কবি ক্রমশ:ই বেশী মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু দর্শনের বৈপরীত্য সত্বেও মনস্বিতা-প্রধান উপন্যাসের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমেরই উত্তরসাধক। বৌঠাকুরাণীর হাট এবং রাজর্ষি বাদ দিলে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি দীর্ঘকাহিনীর কেন্দ্রে কোনো-না-কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা হয় প্রচ্ছন্ন, নয় প্রকটভাবে বর্তমান। এমনকি এ-দুটি রচনার মধ্যেও তত্ত্বজিজ্ঞাসা একেবারে অনুপস্থিত নয়। নষ্টনীড় থেকে শুরু করে চার অধ্যায় পর্যন্ত প্রতিটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মানবীয় অস্তিত্বের একটি না একটি মূল সমস্যার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখী করিয়েছেন। তাঁর স্বকীয় মননের দ্বারা মার্জিত হয়ে এই সব সমস্যা মানুষ সম্বন্ধে আমাদের অভ্যস্ত ধারণায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। তাঁর লেখা থেকে আমরা শুধু গল্পের সুখ উপভোগ করি নি; জীবনের নানা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে নতুন করে ভাববার যে তীব্র, দুর্লভ, বিদগ্ধ আনন্দ, তারও আস্বাদ লাভ করেছি।

আমরা মানে নিশ্চয়ই সব পাঠক নয়। অনুশীলিত পাঠকই এ আনন্দের অধিকারী। যাঁরা অনুশীলনে বঞ্চিত অথবা পরাঙ্মুখ তাঁরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসরাজিকে ভক্তি সহকারে আলমারিতে তুলে রেখে আপন আপন সামর্থ্যানুযায়ী অন্যত্র ভোগ্যবস্তু খুঁজে নিয়েছেন। আমার অনুমান, বিশ্বভারতীর প্রকাশনাবিভাগে খোঁজ করলে জানা যাবে যে গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ এবং চতুরঙ্গ-র পাঠক আজো নিতান্ত সীমাবদ্ধ।

দার্শনিকতার দ্বারা পরিশীলিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে কোন ত্রুটি নেই, তা নয়। তাঁদের ত্রুটি মুখ্যত দু-ধরণের : শিল্পগত এবং দর্শনগত। কখনো কখনো তত্ত্বজিজ্ঞাসা উপন্যাসের প্রবাহ থেকে বিযুক্ত হয়ে তত্ত্বপ্রচারের আকার নিয়েছে; যেমন আনন্দমঠ এবং দেবীচৌধুরাণীতে, কিংবা গোরা-র অনেক জায়গায়। ঔপন্যাসিক তাঁর তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে চরিত্র এবং ঘটনার রসায়নে জারিত করে নিতে পারলে তত্ত্ব বোঝা হয়ে ওঠে না। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ যেখানে তা পারেন নি, সেখানে সেটি তাঁদের শিল্পকর্মের ত্রুটি। অপরপক্ষে আদর্শগত নানা পার্থক্য সত্ত্বেও এঁদের উভয়ের দর্শনেই অস্তিত্বের একটি প্রধান দিক অনেকটা উপেক্ষিত হয়েছিল: সেটি হলো চৈতন্যের অন্তরালে গূঢ় প্রবৃত্তির ক্রিয়ার দিক! জৈবপ্রবৃত্তি হয়ত মানুষের সব অশান্তির মূল; কিন্তু তাদের উচ্ছেদ ঘটিয়ে যে শান্তি সে ত মৃত্যুর শান্তি। প্রবৃত্তির প্রাণময় তাগিদেই না চেতনা নব নব রূপে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনাকে উন্মেষিত করে। "গীতা"র দ্বারা প্রভাবান্বিত বঙ্কিম, এবং ব্রাহ্ম পিউরিট্যানিজম্-এর আবহাওয়ায় বর্ধিত রবীন্দ্রনাথ রুচি এবং নীতিবোধের কাছে প্যাশনকে অনেক সময়ে বলি দিয়েছেন। ফলে তাঁদের কল্পিত চরিত্রগুলি বহু ক্ষেত্রে টাইপে পর্যবসিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এই ত্রুটির জন্যই অসামান্য শিল্পক্ষমতা এবং মননশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কি বঙ্কিমচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উপন্যাসে স্তাঁদাল, ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয় অথবা প্রুস্তের তুল্য সিদ্ধি অর্জন করতে পারেন নি।

॥ তিন ॥

তা না পারুন, তবু একথা অনস্বীকার্য যে উক্ত দুই লেখক বাংলা উপন্যাসের সামনে তার যথার্থ সাধনার পথ খুলে দিয়ে যান। কিন্তু পথ থাকলেই যে

পথিক জুটবে এমন কোনো অবশ্যম্ভাবিতা নেই। এ পথে চলার জন্য যে সব গুণ দরকার—কাহিনী বোনার সামর্থ্য, ব্যবহারের আড়ালে মনের গূঢ়তম ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি, সামান্যের আলোকে বিশেষকে বিচার করার দার্শনিকতা এবং ভাষার ব্যঞ্জনা-সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিরলস শিল্প-সাধনা—তাদের একত্র সমন্বয় সুলভ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা দেশের যিনি সব চাইতে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক সেই শরৎচন্দ্রের প্রথম গুণটি পুরোমাত্রায় ছিল। তাঁর তুল্য গল্প-বানিয়ে বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয়জন আছেন বলে জানিনা। দ্বিতীয় গুণও তিনি কিছুটা অর্জন করেছিলেন (যদিচ খুব জটিল চরিত্র উদ্‌ঘাটন করার সামর্থ্য তাঁর ছিল বলে মনে হয় না)। কিন্তু ভাষাপ্রয়োগের বৈদগ্ধ্য এবং দার্শনিক মনস্বিতার গুণে তিনি বিশেষ সমৃদ্ধ ছিলেন না। অবশ্য বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে তিনি তাঁর কোন কোন উপন্যাসে তত্ত্বালোচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু মননের যে পাচিকাশক্তির জোরে তত্ত্ব উপন্যাসের মেদবৃদ্ধি না ঘটিয়ে কাহিনীতে দার্ঢ্য এবং অর্থসমৃদ্ধি আনে শরৎচন্দ্র তা বর্জন করতে পারেন নি। এই দৈন্য শেষপ্রশ্ন, চরিত্রহীন, পথের দাবি এবং বিপ্রদাসের মত উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর অধিকাংশ ভাল লেখাই আসলে গল্প। কিন্তু যখনই তিনি উচ্চাভিলাসী হয়ে উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছেন অমনি তাঁর অপটু কল্পনার ভাবুকতা ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ অভিযোগের একমাত্র ব্যতিক্রম গৃহদাহ। এখানে মনস্তাত্ত্বিকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি কাহিনীতে গূঢ় দার্শনিক ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে! আমার বিশ্বাস, শুধু এই একখানি বইয়ের জন্য কাহিনীকার শরৎচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক হিসাবে গণ্য করা চলে।[২]

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যে সময়ে ঘটে তখন বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বড় রূপান্তর সূচিত হচ্ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় সংখ্যায় ছিল খুব অল্প। এ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমাজের অধিকাংশ মানুষের বিশেষ মানসিক সান্নিধ্য ছিল না। বঙ্কিম সমাজকে ব্যক্তির চাইতে বড় মনে করলেও তাঁর সাহিত্যের ভোক্তা ছিলেন মুষ্টিমেয় সংস্কৃতিবান পাঠক। বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক অথবা উপন্যাস সাধারণ পাঠকের মনে বড় একটা

২। প্রবন্ধের শেষে দ্বিতীয় টীকা

অনুরণন জাগায় নি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। যথেষ্ট সংখ্যক সুযোগ্য শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার মান নিম্নগামী হল বটে, কিন্তু শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হল। তার চাইতেও বড় কথা, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সাধারণের যোগাযোগ ঘটতে লাগল। এই পরিবর্তন সাহিত্যে দু ভাবে প্রভাব ফেলল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য বাঙালী লেখকরা সাহিত্যকে জীবিকা নির্বাহের উপায় রূপে কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁদের পাঠক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প। যেহেতু লিখে তাঁরা রুজি রোজগার করতেন না, যেহেতু বাজারের চাহিদা নিয়ে তাঁদের কোনো ভাবনা ছিল না। তাঁরা সৃষ্টির প্রেরণায় অথবা ভাব প্রকাশের তাগিদে কলম ধরেছিলেন। লেখাকেই একমাত্র বৃত্তি হিসেবে অবলম্বন করে যে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা চলে, এ সম্ভাবনা দেখা দিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে। এই নতুন পরিস্থিতির দূত হিসেবে আবির্ভূত হল "ভারতবর্ষ" পত্রিকা। এদিক থেকে শরৎচন্দ্রকে বলা যায় আধুনিক বাংলার প্রথম পেশাদার লেখক। তিনিই প্রথম সাহিত্যিক যিনি পাঠকের পৃষ্ঠপোষকতার উপরে নির্ভর করে লেখাকে জীবিকার একমাত্র উপায় বলে গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয়ত, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ক্রমে জনসাধারণকে নিয়ে এবং জনসাধারণের জন্য লেখা সাহিত্যের আদর্শ হয়ে উঠল। এ আদর্শের এক প্রধান উৎস হল ভারতবর্ষে গান্ধিজীর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন; অন্য উৎস হল রুশ দেশে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে সমাজবিপ্লব এবং তারপর বিশের দশকে কমিণ্টার্ণের উদ্যোগে দেশে দেশে কম্যুনিস্ট ভাবধারার প্রসার।

জনসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের এই যোগাযোগের যেটুকু সুফল সেটুকু খুবই স্পষ্ট। প্রথমত, এর ফলে বিশেষ করে উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এল। শুধু এক বিশেষ ধরণের, বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনযাত্রার মধ্যে মানবীয় অস্তিত্বের সূত্র না খুঁজে নানা স্তরের, নানা অবস্থার মানুষদের সম্বন্ধে লেখকদের মনে কৌতূহল জাগার ফলে ঔপন্যাসিক কল্পনা উপাদানের দিক থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার উপন্যাসের সঙ্গে গত চল্লিশ বৎসরের উপন্যাসের তুলনা করলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। দ্বিতীয়ত, এর ফলে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার ব্যবধান কিছুটা কমে এল; কথোপকথনে আড়ষ্টতা কমে

কাহিনীতে গতি বাড়ল। বিশুদ্ধ-শিল্পে বিশ্বাসী প্রমথ চৌধুরী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 'সবুজ পত্রে'র মাধ্যমে সাহিত্যে সাধুভাষার চাইতে কথ্যভাষার উপযোগিতা প্রমাণ করার জন্য একাগ্র প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিশ ও ত্রিশের দশকে বস্তুবাদী এবং সমাজসচেতন লেখকদের রচনায় তাঁর সেই দাবি ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করল। তৃতীয়ত, সাহিত্যকর্মে বিত্তবানদের একচেটিয়া অধিকার আর বজায় রইল না; সমাজের নিচের কোঠা থেকেও দু'একজন সাহিত্যিক দেখা দিতে লাগলেন। ঐতিহ্যাশ্রয়িতা এবং রক্ষণশীলতার জায়গায় নতুন অভিজ্ঞতা এবং নতুন প্রকাশভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপদের আশঙ্কাও অস্পষ্ট রইল না। উনিশ শতকে বাংলাদেশে আধুনিক যুগ সূচীত হওয়ার পর থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালী লেখকরা সাধারণ পাঠকের পৃষ্ঠ-পোষণার আশা করে লেখেন নি। তাঁরা লেখার অন্তর্নিহিত সম্পদের মধ্যেই তাঁদের সাধনার সার্থকতা খুঁজতেন। ফলে একদিকে তাঁরা শিল্পকর্মে নৈপুণ্য অর্জনের জন্য অক্লান্ত সাধনা করতেন; অন্যদিকে তাঁরা ব্যাপৃত ছিলেন অনুভূতির সূক্ষ্মতাসাধনে, জ্ঞানের প্রবর্ধনে, অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের অনুশীলনে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পৃষ্ঠপোষণার ফলে লিখে জীবিকা নির্বাহের সম্ভাবনা যখন উপস্থিত হল, তখন অনেক ক্ষমতাবান লেখকের মনে শিল্প-বিবেকের চাইতে গণমনোরঞ্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হয়ে উঠল। কিন্তু এদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়লেও শিক্ষার বনিয়াদ বিশেষ মজবুত করে গড়া হয় নি। ফলে এই বর্ধমান পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অনুশীলিত রুচি অর্জন করেছিলেন। অর্থঘন ভাষা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, জটিল কিন্তু সুবিন্যস্ত ভাবনা—এসব সম্ভোগ করার সামর্থ্য এঁদের অনেকের মনেই গড়ে ওঠে নি। ফলে এঁদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে লেখকের কল্পনাকে সূক্ষ্ম থেকে ক্রমেই স্থূলের দিকে ঘেঁসতে হয়েছে, গূঢ় ব্যঞ্জনার অনুশীলন ছেড়ে চোখ ঝলসানো বাক্‌চাতুরিকে আশ্রয় করতে হয়েছে, জটিল সমস্যাকে এড়িয়ে সরল ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিতে হয়েছে। তাছাড়া লেখাকেই জীবিকার মুখ্য উপায় করার ফলে লেখকদের প্রচুর লিখতে হয়েছে। সৃষ্টির জন্য যে অবসর এবং কর্মবিরতি একান্ত প্রয়োজন—যে অবসরে একদিকে অভিজ্ঞতারাশী ধীরে ধীরে পরিশ্রুত হয়ে মনের মধ্যে দানা বাঁধে, এবং অন্যদিকে যে কর্মবিরতির কালে

শিল্পী নিজের ভাবনাকে সমৃদ্ধ এবং ব্যঞ্জিত প্রকাশরীতিকে পরিশীলিত করে তোলেন—সেই অবসর এবং কর্মবিরতিকে সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর করে আনতে হয়েছে। ফলে লেখা যত পরিমাণে বেড়েছে, লেখার মান ততই নিচের দিকে নেমে গেছে।[৩]

দ্বিতীয়ত, সর্বসাধারণকে নিয়ে এবং সর্বসাধারণের জন্য লেখার আদর্শ গ্রহণ করলেও অধিকাংশ বাঙালী লেখক আজো জন্ম, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার সূত্রে সমাজের একটি বিশেষ স্তরের অধিবাসী। বর্ণ উপবর্ণের দিক থেকে এঁরা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য কিম্বা কায়স্থ; এঁদের অধিকাংশের জন্ম জমিদার অথবা চাকুরে পরিবারে; এঁরা শহরবাসী এবং কম-বেশী ইংরেজী শিক্ষিত। একদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ণব্যবস্থা এবং অন্যদিকে সমাজ-জীবনে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং গতিশীলতার অভাব নিম্নস্তরের মানুষদের আজও সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশে অক্ষম করে রেখেছে। এখন শিল্পসাধনায় প্রতিভার স্থান যত বড়ই হোক, গদ্যসাহিত্যের বিকাশ অনেকটাই মনস্বিতার চর্চার উপরে নির্ভর করে। একথা উপন্যাস সম্পর্কেও কমবেশী সত্য। কিন্তু এদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রধানত শহরবাসী উচ্চবর্ণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে ঘটনাচক্রে এবং আদর্শের প্রভাবে কথাসাহিত্যিকরা নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষের কথা লিখতে চাইলেও তাঁদের অধিকাংশই রয়ে গেছেন শহুরে উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। গ্রামবাসী চাষী, শহরতলীর মজুর, অশিক্ষিত নিম্নতম বর্ণের স্ত্রীপুরুষ, বেশ্যা, চোর, ভিখারী ইত্যাদি মানুষদের নিয়ে যখন তাঁরা লিখতে বসলেন, তখন তাঁদের সৃষ্টিতে তাই সত্যের সুর বাজল না। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে তাঁরা বস্তুতন্ত্রী; কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁদের কল্পনায় রোমান্সের চড়া রঙ মাখাতে হলো।

এ চেষ্টার দুটো কুফল ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লেখক যখন তাঁর নিজের স্তরের মানুষদের কথা লিখতে গেছেন, তখন তাঁর কল্পিত চরিত্রকে তিনি দেখেছেন ভিতর দিক থেকে, তার প্রত্যেকটি আচরণের আড়ালে গোপন ভাবনা-কামনার জটিলগ্রন্থি তিনি অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সামর্থ্যে উদ্ঘাটিত করতে পেরেছেন। কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের বাইরের কথা লিখতে গিয়ে তিনি তাদের মনের হদিস পান নি। তিনি বাইরের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে বাধ্য হয়েছেন; ব্যক্তির প্রাতিস্বিক সত্তার চাইতে তার বাহ্য ক্রিয়াকলাপ

৩। প্রবন্ধের শেষে তৃতীয় টীকা

এবং সামাজিক সম্বন্ধ-বিন্যাসই তাঁর কল্পনায় বেশী জায়গা জুড়েছে। ফলে এ জাতীয় উপন্যাসে একদিকে কষ্টকল্পনা এবং ভাবালুতা প্রবল, অন্যদিকে এদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চাইতে ঘটনা-প্রবাহ বা কাহিনী বেশী মুখ্য। তাছাড়া যেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের লেখক নিজের স্তরের মানুষদের সম্বন্ধে লিখতে বসে অন্তরঙ্গতার সামর্থ্যে ব্যক্তির অনন্যতা এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সূক্ষ্ম অথচ অলঙ্ঘনীয় পার্থক্যের উপরে জোর দিয়েছেন, অন্য স্তরের মানুষদের সম্বন্ধে কল্পনা করতে গিয়ে পরিচয়ের স্বল্পতার দোষে তাঁকে গোষ্ঠীগত গড়পড়তার ছবি এঁকেই তৃপ্ত হতে হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রী পুরুষরা বিশেষ ব্যক্তি; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তারা স্তর-বিশেষের প্রতিনিধি বা কল্পিত টাইপ। দ্বিতীয়ত, আদর্শগত কারণে এঁরা ব্যক্তির চাইতে সমষ্টিকে বড় বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু ভাবজগতের বাইরে সমষ্টির কোন অস্তিত্ব নেই, সেই কারণে এঁদের কল্পনা ক্রমেই অস্তিত্বের উদ্ঘাটনের প্রতি উদাসীন হয়ে পূর্বনির্দিষ্ট প্রত্যয়ের ব্যাখ্যানের কাজে ব্যাপৃত হল। এঁরা নামে নিজেদের রিয়্যালিস্ট বলে ঘোষণা করলেও লেখার মধ্যে দেখা দিলেন ঘোর প্রোপ্যাগ্যাণ্ডিস্ট রূপে। জীবন সম্বন্ধে যে নাচিকেত জিজ্ঞাসা ঔপন্যাসিকের কল্পনাকে জাগ্রত রাখে, মতবাদের মন্ত্রে তা ক্রমেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। মননশীলতা এবং মতবাদাশ্রয়িতার মধ্যে অহি-নকুলের সম্পর্ক। একটি হল উদ্ভাবনার উৎস, আর অন্যটি হল মানসিক জাড্যের আশ্রয়। উপন্যাসে মতবাদ যত প্রবল হয়ে উঠেছে, যথার্থ সত্যনিষ্ঠা ভাবুকতা, এবং কল্পনার বৈচিত্র্য ততই ক্ষীয়মান হয়ে এসেছে।[৪]

॥ চার ॥

যদিচ উপরোক্ত সমস্ত বিপদের আভাস শরৎচন্দ্র এবং তাঁর অনুকারকদের উপন্যাসে উপস্থিত, তবুও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ঔপন্যাসিক কল্পনার এই অবক্ষয় খুব একটা প্রকট হয়ে ওঠে নি। বস্তুত বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে তিরিশের দশক এবং চল্লিশের প্রথমার্ধকে বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধতম কাল বলা চলে। নতুন সাহিত্যিকেরা তখন সবে মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডির বাইরে দৃষ্টিপাত সুরু করেছেন; তাঁদের কল্পনায় নতুন দেশ

৪। প্রবন্ধের শেষে চতুর্থ টীকা

আবিষ্কারের উল্লাস গতি সঞ্চার করছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে থেকেই অসামান্য প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যকর্মে ব্যাপৃত থাকায় ফলে নতুন সাহিত্যিকদের মান খুব নীচুতে নামতে পারে নি। শিক্ষার প্রসার এবং মনের অধোগতি সুরু হওয়া সত্ত্বেও পাঠকদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশের রুচি বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, এবং পশ্চিমের মহৎ সাহিত্যিকদের রচনা পাঠের দ্বারা অনুশীলিত। সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের সম্ভাবনা তখনো খুব বেশী লেখকের সামনে দেখা দেয় নি। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি সার্বজনীন তামাশার হুল্লোড়ে লুটোবার মত উৎসাহীর সংখ্যা তখনো সীমাবদ্ধ ছিল। মতবাদের কড়া নেশা তখনো বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে নি (যদিও সে সর্বনাশের ব্যাপক সূচনা তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই চোখে পড়ে)। ফলে তখনো অনেক ঔপন্যাসিক শিল্পকর্মে নিপুণতা অর্জনকে মূল্য দিতেন। শিথিল, অসংলগ্ন অথবা অমার্জিত রচনা লিখতে এবং প্রকাশ করতে তাঁদের সঙ্কোচ হত। মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ পাঠকের তারিফ জুটলেই তাঁরা খুশী হতেন। তাঁদের মনের জিজ্ঞাসার শিখা অস্তিত্বের অন্ধকারে কম হোক বেশী হোক আলো ছড়াত।

এই দশকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের ঐতিহ্যে অন্নদাশঙ্কর রায় সত্যাসত্যের মত কৌতুক-প্রোজ্জ্বল অথচ সুগভীর তত্ত্বকেন্দ্রিক এপিক উপন্যাস রচনা করেছেন। অভিজ্ঞতার সরল সততার সঙ্গে অসামান্য শিল্পবোধের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে প্রতিশ্রুতিময় নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন। ব্যঞ্জিত ভাষা উপরে যথেষ্ট দখল না থাকা সত্ত্বেও বিচিত্র ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করে এবং স্বল্পজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত স্তর, সম্প্রদায় এবং অঞ্চলের জীবনযাত্রার সত্যনিষ্ঠ কাহিনী লিখে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের বিষয়সীমা সম্প্রসারিত করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটির পর একটি উপন্যাসে বাহ্য ব্যবহার এবং সম্পর্কের আড়ালে ব্যক্তিমনের জটিল, সমস্যা-সঙ্কুল, স্ববিরোধী ক্রিয়াকলাপের ব্যঞ্জনাময় ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বাংলা উপন্যাসের অনেকটা বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিয়েছেন ; বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের যদি তালিকা রচিত হয় তবে তার মধ্যে কৃষ্ণকান্তের উইল, যোগাযোগ, চতুরঙ্গ এবং গৃহদাহ যেমন অবশ্যই স্থান পাবে, তেমনি স্থান পাবে সত্যাসত্য, পথের পাঁচালী এবং আরণ্যক, কবি,

জননী, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, এবং অহিংসা। এঁদের তুলনায় এ যুগের যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ঔপন্যাসিক—যেমন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সরোজ রায়চৌধুরী, অথবা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—তাঁরাও ভাষাপ্রয়োগে সবিশেষ যত্নশীল, বাহ্য ঘটনার অন্তরালে বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত, অস্তিত্বের নানা সমস্যা এবং পরস্পরবিরোধী প্রবণতা সম্পর্কে কৌতূহলী, অর্থাৎ উপন্যাসের বিশিষ্ট সাধনা বিষয়ে মোটামুটি সচেতন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে মারাত্মক বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে তার বহু চিহ্ন আজ চোখে পড়ে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তা যে বাস্তব আকার গ্রহণ করে নি, তার জন্য তিরিশের দশকের এই সব শক্তিশালী এবং বিবেকবান ঔপন্যাসিকের কাছে রুচিবান বাঙালী পাঠক-পাঠিকার ঋণ অপরিসীম।

॥ পাঁচ ॥

কিন্তু সাময়িক ভাবে প্রতিহত হলেও পূর্বোক্ত আশঙ্কা যে মোটেই অমূলক ছিল না, গত কুড়ি বছরের মধ্যে সেটি মারাত্মক রূপে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিকৃষ্ট উপন্যাস আগেও লেখা হত; কিন্তু সমগ্রভাবে ঔপন্যাসিক মানের দ্রুত অধোগতি ইতিপূর্বে চোখে পড়ে নি। শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব এখনো মাঝে মাঝে ঘটছে; কিন্তু নিম্নগামী আবর্তের টান থেকে নিজের শিল্পবিবেককে রক্ষা করা আজ যত কঠিন, ইতিপূর্বে বোধহয় আর কখনো তেমন ঠেকে নি।

গত বিশ বছরে নিরক্ষরের অনুপাত কিছুটা কমেছে এবং স্বল্প-শিক্ষিত পাঠকপাঠিকার সংখ্যা লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পাঠকদের বেশীর ভাগই ক্লাসিকস্-এর সঙ্গে পরিচয়হীন। এঁরা যে শুধু সংস্কৃত সাহিত্য অথবা উৎকৃষ্ট ইয়োরোপীয় সাহিত্যে পাঠ গ্রহণ করেননি এমন নয়; রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনাবলীও হয় এঁদের অপঠিত, নয় প্রায় অবোধগম্য। ফলে এঁদের রুচি নিতান্ত গ্রাম্য। অপরদিকে এঁদের জীবন-যাত্রা দিশাহীন, ঊর্ধ্বশ্বাস, বিবর্ণ, ভিড়াক্রান্ত। এঁরা জীবনকে বুঝতে চান না, জীবনকে ভুলতে চান। শিল্প এবং সাহিত্যের সম্ভোগ থেকে আত্মসমৃদ্ধির উপাদান সংগ্রহে এঁরা অপারগ।

বাস্তববোধ এবং ব্যক্তিগত দায়িত্বচেতনার হাত থেকে নিষ্কৃতির প্রয়োজনে এঁরা মাদকের সন্ধানী। সেই মাদক এঁদের যুগিয়ে চলেছে হিন্দী এবং মার্কিনী ফিল্ম, তথাকথিত আধুনিক সঙ্গীত, ধ্বংসাত্মক উগ্র রাজনীতি, কুৎসিত সিনেমা পত্রিকা, দুর্গাপূজা এবং দোল থেকে সুরু করে রবীন্দ্রজন্মতিথি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত নানাবিধ তামসিক হৈহুল্লোড়, এবং সম্প্রতিকালে বাংলা দেশে উপন্যাস নামে প্রচলিত ফেনানো-ফাঁপানো গোলাপী গালগল্প।

পরিবেশের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই অধোগতির হাত থেকে বাংলা উপন্যাসকে যাঁরা হয়ত রক্ষা করতে পারতেন, তিরিশের দশকের সেই প্রতিভাবান লেখকদের অনেকেই আজ মৃত, অবসন্ন অথবা স্বধর্মচ্যুত। মৃত্যুর কিছু পূর্ব থেকেই বিভূতিভূষণের কল্পনায় জরার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। একদিকে তাঁর চেতনা হয়ে উঠেছিল জীবনবিমুখ, অপরদিকে তাঁর সারল্য পর্যবসিত হতে চলেছিল আবেগ-গদগদ পুনরাবৃত্তিতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকটি উপন্যাসে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার পর একদিকে দলীয় মতবাদের প্রভাবে এবং অন্যদিকে অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে সাধ্যাতিরিক্ত পরিমাণ উপন্যাস লেখার চেষ্টায় নিজেকে ফুরিয়ে ফেলেন। তাঁর শেষের দিকে লেখাগুলি পড়ে বিশ্বাস করা কঠিন যে এই লেখকই 'জননী' অথবা "দিবারাত্রির কাব্যে"র মত আশ্চর্য কাহিনী লিখে ঔপন্যাসিক জীবন সুরু করেছিলেন। তারাশঙ্করের রচনায় বিষয়গত বৈচিত্র্য শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রথমদিকের রচনাগুলিও ব্যঞ্জিত ভাষা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি অথবা মননশীলতার গুণে বিশেষ সম্পন্ন ছিল না। পরবর্তীকালে এই অভাব আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের মত তিনিও যতই কাহিনীর মধ্যে তত্ত্বালোচনার আমদানী করে তাকে উপন্যাসের আভিজাত্য দেবার প্রয়াস পেয়েছেন, ততই তাঁর লেখা হাস্যকর ভাবে মেদভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। অপরপক্ষে যে নাচিকেত প্রশ্নশীলতা এবং সুমার্জিত কৌতুকরসের সমন্বয় অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথম যুগের রচনায় দীপ্তি, গভীরতা এবং বৈচিত্র্যের সম্পদ দান করেছিল, ক্রমে তারা বিযুক্ত এবং ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এসেছে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা ভাষায় আর কোনো লেখকের কথা ভাবা শক্ত দেহের বার্ধক্য যাঁর মনস্বিতার হ্রাস না ঘটিয়ে তাকে আরো সমৃদ্ধ এবং সক্রিয় করে তুলেছে।[৫] তিরিশের দশকের যে ঔপন্যাসিকদের নাম

৫। প্রবন্ধের শেষে পঞ্চম টীকা

উল্লেখ করেছি, তাঁদের প্রতিভা অনস্বীকার্য। কিন্তু শাস্ত্রমতে বানপ্রস্থের কাল আসবার পূর্বেই তাঁদের প্রতিভার জরাপ্রাপ্তি ঘটেছে। অপরপক্ষে চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেসব লেখক দেখা দেন তাঁদের একজনও এঁদের সঙ্গে তুলনীয় প্রতিভার অধিকারী নন। এঁদের অধিকাংশই আসলে পূর্বসূরীদের অনুকারক; এঁদের লেখায় আবিষ্কারক বা পথিকৃতের চরিত্রলক্ষণ কচিৎ চোখে পড়ে। অনুকরণ করতে গিয়ে এঁদের লেখায় অগ্রজদের দোষগুলিই প্রবল হয়ে উঠেছে, কিন্তু গুণগুলি সঞ্চারিত হয় নি।

তবু এ ব্যাপারটাও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয় যে এঁদের মধ্যে যাঁরা কিঞ্চিৎ ক্ষমতাবান তাঁদের পক্ষে আজ নিজেদের সাধনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা বজায় রাখা আগের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন। এঁদের প্রায় সকলেই লেখাকে জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে এদিকে এঁদের প্রচুর পরিমাণে লিখতে হচ্ছে। অপরপক্ষে পাঠকদের চাহিদাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে নিজের বিবেক অনুযায়ী লিখে যাওয়া এঁদের পক্ষে প্রায় অকল্পনীয়। নিভৃতে ধীরে ধীরে নিজের শক্তিকে পুষ্ট এবং পরিশীলিত করার অবসর থেকে এঁরা বঞ্চিত; এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে এঁরা ক্রমেই নিজেদের লেখার মানকে নামিয়ে আনছেন। অধিকাংশ পাঠকপাঠিকা যেখানে জীবনবিমুখ, মননে অক্ষম, নিজেদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বিষয়ে অজ্ঞ, সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের উপভোগে অনভ্যস্ত, কোনো গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে অনিচ্ছুক, সেখানে অসামান্য চরিত্রবলের অধিকারী না হলে কোনো লেখকের পক্ষে নিজের সাধনায় দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত থাকা একরকম অসম্ভব। বিশেষত সে লেখক যখন লেখাকেই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অথবা প্রধান উপায় রূপে বেছে নিয়েছেন। ফলে বাংলা দেশে বর্তমানে যেসব ঔপন্যাসিক কিছু কিছু ক্ষমতার অধিকারী, একদিকে যথেষ্ট চরিত্রবলের অভাবে এবং অন্যদিকে মূঢ় পাঠকরুচির প্রবল চাপে তাঁদের লেখায় ক্রমেই স্থূলতা, মাদকতা, কষ্টকল্পনা এবং অতিশয়োক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে।

অসংস্কৃত পাঠকসম্প্রদায়ের প্রতাপে শুধু অল্পবিস্তর ক্ষমতাসম্পন্ন লেখকরাই যে নিজেদের শিল্পধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছেন তা নয়। এর ফলে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমন এক জাতের লেখক ব্যাপক প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সুরু করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র কলম ধরার পর থেকে যে জাতীয় লেখকদের বাঙালী পাঠকসমাজ ইতিপূর্বে কখনো সাহিত্যিক বলেই স্বীকার করতেন না।

শিল্পনৈপুণ্য, মানুষের মন সম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি, জীবনের নানা গভীর সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন, দার্শনিকতা, পূর্বসূরীদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয়—এসব বালাই থেকে এঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত। বিশ্বাস্য অথবা অবিশ্বাস্য যে কোন ধরনে চরিত্র এবং ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়ে পাঠকদের সাময়িকভাবে আবেগের আতিশয্যে আচ্ছন্ন করে রাখা এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে মোলায়েম মাদকের জন্য আধুনিক বাঙালী পাঠকের আকণ্ঠ পিপাসা, এঁরা তার সেরা কারবারী। পূর্বেও বাংলা দেশে এ জাতীয় লেখকের অভাব ছিল না। কিন্তু একদিকে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় গড়ে ওঠার ফলে, এবং অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের মানকে উঁচুতে তুলে ধরার ফলে, এই জাতীয় শূন্যগর্ভ শব্দব্যবসায়ীরা সাহিত্যরুচির উপরে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেন নি। অধিকাংশ শিক্ষিত পাঠক এঁদের লেখা পড়তেন না; কেউ কেউ পড়লেও লুকিয়ে পড়তেন এবং সেজন্য নিজের কাছে লজ্জা বোধ করতেন। এই ব্যক্তিরাও নিজেদের সাহিত্যিক রূপে কল্পনা করার স্পর্ধা রাখতেন না। কিন্তু সম্প্রতিকালে বাঙালী পাঠকদের মধ্যে ইংরেজির চর্চা প্রায় লোপ পেতে বসেছে; ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রকৃত সম্ভোক্তার সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে; পাঠকসম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মান প্রায় ভুলতে বসেছেন। ফলে পূর্বোক্ত অপকৃষ্ট শ্রেণীর লেখকরা এখন সাহিত্যের বাজারে মাতব্বর রূপে দেখা দিতে পেরেছেন। ক্রাইম, নাটকীয় উচ্ছ্বাস, এবং অগভীর যৌনতার মিশ্রণ ঘটিয়ে বিকলাঙ্গ ভাষায় এবং অসংলগ্ন ঘটনা ও অসম্ভব চরিত্র-সমাবেশে এঁরা উপন্যাস নামে যে পদার্থ প্রস্তুত করছেন বাজারে তা আসা মাত্র বিকিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশকরা এঁদের বই ছেপে নিজেদের অবস্থা ফেরাচ্ছেন; পত্রিকা সম্পাদকরা এঁদের উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বার করার জন্য ধর্না দিচ্ছেন; গ্রন্থাগারিকরা এঁদের প্রতিটি বইয়ের অনেকগুলি কপি কিনেও সদস্যদের চাহিদা মেটাতে পারছেন না। এঁদের লেখা পড়ে পাঠকদের স্থূল রুচি স্থূলতর হচ্ছে; এবং যে লেখকদের কিছু-বা শক্তি এবং শিল্পবিবেক বর্তমান ছিল, তাঁদের মধ্যেও অনেকে দ্বিতীয় গুণটিকে বিসর্জন দিয়ে প্রথম গুণটিকে এমনভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন যাতে এঁদের পথ ধরে তাঁরাও কিছুটা গুছিয়ে নিতে পারেন। ফলে বাংলা উপন্যাসে ব্যাপক সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

॥ ছয় ॥

তবে কি ধরে নেব যে দেশে পাঠকের সংখ্যা যত বাড়বে এবং ঔপন্যাসিকরা জীবিকার জন্য সাধারণ পাঠকপাঠিকার পৃষ্ঠপোষণার উপরে যত বেশী নির্ভরশীল হবেন, ততই বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার হয়ে উঠবে? আপাতত তা মনে হলেও এ সিদ্ধান্ত আমার কাছে অবশ্যগ্রাহ্য ঠেকে না। যদি দেশে সুশিক্ষার ব্যবস্থা থাকে তবে পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধি কেন রুচিকে নিম্নগামী করবে? আমার ধারণা যে একদিকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ এবং অন্যদিকে সাহিত্য-সমালোচকরা উদ্যোগী হলে এই অধোগতির হাত থেকে সাহিত্যকে রক্ষা করা সম্ভব। শিক্ষার অন্যতম কাজ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে তরুণ মনের আত্মীয়তা ঘটানো; এই সূত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে রুচি এবং বিচারশক্তি গড়ে উঠবে। তাদের মার্জিত রুচির সহৃদয় সমর্থন ক্ষমতাবান লেখককে অনেক বৈষয়িক সমস্যা এবং প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করবে। অপরপক্ষে ভাল সমালোচক পাঠকদের রসবোধের বিকাশে সাহায্য করেন, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতাকে সক্রিয় এবং মার্জিত করে তোলেন, জনপ্রিয়তার চওড়া সড়কের বাইরে সাহিত্যের যে আরো অনেক জানার মত পথঘাট আছে তার হদিস বাত্‌লে দেন, অতিপরিচয়ের ফলে কে মহৎ রচনা বিস্ময়সঞ্চারের ক্ষমতা হারিয়েছে তার কোন-না-কোন গোপন ঐশ্বর্যের উপরে আপন বৈদগ্ধ্যের আলো ফেলে পাঠককে নতুন করে সে রচনা বিষয়ে কৌতূহলী করে তোলেন। এতে পাঠকের লাভ, তার সম্ভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, তার সম্ভোগের অভিজ্ঞতা গভীরতর, সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। তার পক্ষে আর জেগে ঘুমনো সম্ভব হয়ে ওঠে না। এতে লেখকের লাভ, যে রসিকজনদের উদ্দেশ্যে তাঁর রচনা, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর হয়। পাঠকের পৃষ্ঠপোষণার লোভে তাঁকে নিজের লেখায় ভেজাল দিতে হয় না। পাঠকের প্রত্যাশা উঁচুতে বাঁধা থাকায় লেখকের কল্পনা নিচের দিকে নামবার অবকাশ পায় না। অর্থাৎ ভাল সমালোচক সাহিত্যের বাজারকে গ্রেশামী নিয়মের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচানোয় অনেকখানি সাহায্য করে থাকেন।

বলাবাহুল্য সৎ শিক্ষকের মতই সৎ সমালোচক হতে পারা নিতান্ত সহজ কথা নয়। বিচার করার আগে বিচারকের যোগ্যতা অর্জন করা চাই। অন্যের রুচি গড়ায় যিনি সাহায্য করবেন, তাঁর নিজের রুচি সুপরিণত না হলে চলবে কেন? যে সব গুণে লেখা সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠে, তাদের যথাযথ

চেনা এবং তাঁদের আবেদনে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা অনেকখানি অনুশীলন-সাপেক্ষ। যে প্রয়োগকৌশলের ফলে ভাষা আভিধানিক অর্থের সীমাকে ছাড়িয়ে প্রতীয়মান অর্থের ইঙ্গিত করে, তার খুঁটিনাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে ভাল সমালোচক হওয়া অসম্ভব। শুধু সাহিত্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং নির্মাণরীতি বিষয়ে জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়। সাহিত্যের যা আত্মা, আলঙ্কারিকেরা যার নাম দিয়েছেন রস, তার মধ্যে প্রবেশ করার জন্য জীবন সম্বন্ধে গভীর এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে সে সব অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে নেবার মত দার্শনিক বুদ্ধির। অর্থাৎ সাহিত্য-সমালোচক একাধারে ভাষাবিদ্, আলঙ্কারিক, জীবনের অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া ব্যক্তি এবং দার্শনিক। এ ছাড়াও তাঁর অন্তত আর একটি গুণ থাকা আবশ্যক। সেটি হল, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাকে ভাষার মারফত অন্যের মনে পেঁাছে দেওয়ার সামর্থ্য। সমালোচককে শুধু সুপাঠক হলেই চলবে না, তাঁকে সুলেখকও হতে হবে। বলা বাহুল্য, এসব গুণ অর্জন করার জন্য সবচাইতে প্রথমেই যে জিনিসটি দরকার সেটি হল, নানাদেশের নানাভাষার যা কিছু নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ রচনা—পশ্চিমী সমালোচকেরা যাকে বলেন ক্লাসিক—তার অভিনিবিষ্ট অধ্যয়ন। সৎ সমালোচক অন্যের মুখে ঝাল খান না, নিজে সব কিছু চেখে দেখেন। এবং ভাল সমালোচনা পড়ার ফলে পাঠকের মনেও মূলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে।

সুতরাং সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যের এবং বিশেষ করে বাংলা উপন্যাসের বর্তমান সঙ্কট-মোচন ব্যাপারে শিক্ষক এবং সমালোচকদের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে সবচাইতে বড় দায়িত্ব ঔপন্যাসিকদের নিজেদের। ঔপন্যাসিকের নিজের যদি ক্ষমতা, নিষ্ঠা এবং সাধ... না থাকে তবে সবচাইতে আদর্শ পরিবেশ সত্ত্বেও সৎ উপন্যাস সৃজিত হবে না। সমকালীন পশ্চিমে নিকৃষ্ট উপন্যাসের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়; তা নিয়ে সেখানেও অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবু এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সেখানে আজো যথেষ্ট উৎকৃষ্ট উপন্যাস লেখা হচ্ছে এবং তাদের সমাদরের অভাব ঘটছে না। সেখানে সাধারণ শিক্ষার মান সাময়িকভাবে কিছুটা নীচু হয়ে আসলেও অনেকগুলি সুপ্রাচীন এবং উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতির ফলে এক শ্রেণীর পাঠক নিয়মিতভাবে গড়ে ওঠার ব্যবস্থা আছে, যাঁদের মন ক্লাসিক্স্-পাঠের দ্বারা পুষ্ট এবং যাঁরা সমকালীন সৎসাহিত্যের

সম্ভোগে সমর্থ। তাছাড়া সেখানে বিদগ্ধ সমালোচকের অভাব নেই। তবে সবচাইতে যেটা বড় কথা, পশ্চিমে এমন অনেক ঔপন্যাসিক আছেন এবং এখনো দেখা দিচ্ছেন যাঁরা কোনো রকমের ভয় অথবা প্রলোভনের কাছে তাঁদের সাহিত্য বিবেককে বলি দিতে গররাজী, যাঁরা বাজারের চাহিদার সঙ্গে কোনো রফা না করে নিজের সাধনায় মগ্ন, যাঁরা "বেস্ট সেলার" হওয়ার চাইতে অল্প কয়েকজন সুধী পাঠকের তারিফকে অনেক বেশী মূল্য দিয়ে থাকেন। বাংলা দেশে পরিশীলিত পাঠক এবং রসিক সমালোচকের বিশেষ প্রয়োজন আছে; কিন্তু বাংলা উপন্যাসের সঙ্কট-মোচনের জন্য সব চাইতে যাঁকে বেশী প্রয়োজন তিনি হচ্ছেন ক্ষমতাবান ও নিষ্ঠাবান ঔপন্যাসিক।

---

(১) "সঞ্চয়িতা", পৃঃ ২৯৪। আদি এবং পরিবর্তিত পাঠ দুই-ই পাশাপাশি দেওয়া আছে।

(২) এ সম্পর্কে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট পত্রিকায় (১৯৫২, বাইশে জুন) শরৎচন্দ্র সংক্রান্ত প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

(৩) এই সমস্যা অবশ্য বাংলা দেশ বা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই সমস্যার সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষ করে পশ্চিমী সভ্যতার সংকটের পটভূমিতে কিছুটা বিচার বিশ্লেষণ আছে আমার "মৌমাছিতন্ত্র" গ্রন্থের "গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি" প্রবন্ধে।

(৪) সংকট ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছে, মতবাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্য মননবিরোধী শক্তি। ভারতবর্ষের পটভূমিতে এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। যথা, টাইম্‌স্ লিটরারী সাপ্লিমেণ্টে (১৯৫৭, অগষ্ট) 'A literary revolution in India'; কোয়েষ্ট পত্রিকায় (১৯৫৮ অক্টোবর ডিসেম্বর) 'Decline of the Indian Intellectuals; এবং সভিয়েট সার্ভে পত্রিকায় (১৯৫৯, এপ্রিল জুন) 'Eastwind Westwind'.

(৫) এদিক থেকে বুদ্ধদেব বসু ব্যতিক্রম। তরুণ বয়স থেকে তিনি লিখে আসছেন কিন্তু তাঁর সম্প্রতিকালের সাহিত্যকর্ম বিস্ময়কর। কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে, অনুবাদে গত কয়েকবছর ধরে তাঁর দান অসামান্য। তবু উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁকে উল্লেখ্য মনে হয়নি; তাঁর সার্থক কীর্তি কবিতায়, প্রবন্ধে, এবং সম্প্রতি কাব্যনাট্যে।